বর্তমানের সূচী

(প্রথম খণ্ড—প্রথম সংখ্যা)

বৈশাখ—১৩৫৪

১। রবীন্দ্রনাথের দু'খানি চিঠি
(৺বিপিনবিহারী গুপ্ত ও স্বর্গীয়া কাদম্বিনী দেবীকে লিখিত) ১

২। কপালকুণ্ডলার ভূমিকা
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার ... ২

৩। শিল্পীর ক্ষোভ (গল্প)
বনফুল ... ১১

৪। খণ্ডিত বাংলা ও অখণ্ড ভারত
শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪

৫। গান্ধীজির লক্ষ্য
লীলাময় রায় ... ১৯

৬। মহারাজ রায়ের অট্টালিকা (উপন্যাস)
মনোজ বসু ২২

৭। স্বাধীনতার সাগর-সঙ্গমে
শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ৩০

৮। সীমা (অনূদিত উপন্যাস) ....
লিঅন ফএখ্‌ট্‌ভানগার
অনুবাদকঃ ভবানী মুখোপাধ্যায় ৩৯

৯। বর্তমান (কবিতা)
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার ... ৪৬

১০। রবি-প্রণাম (কবিতা)
শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ৪৬

১১। পঞ্চারতি (কবিতা)
শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ... ৪৭

১২। কৃষ্ণা কালো মেয়ে (কবিতা)
শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত ৪৯

বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে পত্র লেখবার সময় দয়া ক'রে 'বর্তমানের' নামোল্লেখ করবেন।

ন ব ব র্ষে

জে না রে লে র নি বে দ ন

*** সদ্য প্রকাশিত ***

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
বরযাত্রী (৪ সং) ২৷৷০ বসন্তে (২সং) ৩৲
বর্ষায় (৩সং) ৩৲ শারদীয়া (২সং) ৩৲
হৈমন্তী ৩৲ চৈতালী ৩৲ দৈনন্দিন ২৷৷০
নীলাঙ্গুরীয় (৪সং) ৩৲ আগামী প্রভাত ৩৲
বিশেষ রজনী ২৲ ক্ষণ-অন্তঃপুরিকা ২৲
স্বর্গাদপি গরীয়সী প্রতি খণ্ড ৪৲

শ্রীমতী বাণী রায়ের
প্রেম ৩৲ পুনরাবৃত্তি ২৲

নবগোপাল দাস, আই-সি-এস্-এর
নিঃসহ যৌবন ৩৲ তারা দুজন ২৷৷০
অনবগুণ্ঠিতা (২ সং) ৩৲
সাগর দোলায় ঢেউ ৩৲

রামপদ মুখোপাধ্যায়ের
মহানগরী ৪৲ দুঃস্বপ্ন ২৲

নন্দগোপাল সেনগুপ্তের
সমাজ ও যৌনসমস্যা ২৲
পায়ে চলার পথ ৩৲
অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ ২৷৷০

ভাস্করের রচনা
মজলিস ১৷৷০ শুভশ্রী ১৷৷০
কথিকা ১৷৷০ লেখা ৩৲

অমলেন্দু দাসগুপ্তের
ডেটিনিউ ২৲

কমল দাসগুপ্তের
পরিচিতা ৩৲

মোহিতলাল মজুমদারের
জয়তু নেতাজী ৩৲

প্রমথনাথ বিশীর
রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর ৩৲
কোপবতী (২ সং) ৩৲

ডাঃ সুশীলকুমার দের
ক্ষণ-দীপিকা ২৲

ডাঃ সুবোধ সেনগুপ্তের
আমাদের ইংরেজী শেখা ১৷৷০

কাজী আবদুল ওদুদের
কবিগুরু গ্যেটে ১ম খণ্ড ৫৲
২য় খণ্ড ৪৲

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
ব্যক্তিগত ২৲

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ
অবধূত প্রণীত
ঈশোপনিষৎ ২৲

ডাঃ যজ্ঞেশ্বর ঘোষের
গীতা ও হিন্দুধর্ম্ম ৪৲

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর
কালো ঘোড়া ৩৲ বন্ধনী (২য় সং) ২৲
ক্ষুধা ২৷৷০ শৃঙ্খল (৩ সং) ২৷৷০ মনের গহনে
(২সং) ২৲ বসন্ত রজনী (২ সং) ১৷৷০,
ঘরের ঠিকানা (২ সং) ২৷৷০ শতাব্দীর
অভিশাপ (৩ সং) ২৷৷০ হালদার সাহেব ২৲

শ্রীমতী রেণু মিত্রের
রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ২৲
প্রাথমিক শিক্ষা ২৷৷০

পরিমল গোস্বামীর
মহামন্বন্তর ৩৲ ঘুঘু (২ সং) ২৲
দুষ্মন্তের বিচার (২ সং) ১৷৷০
ট্রামের সেই লোকটি (২ সং) ২৲
ব্ল্যাক মার্কেট ২৲

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
সেকেণ্ড হ্যাণ্ড ২৲ সঞ্চারী ১৲

আমিনুল হকের
টাইগার হিল ৩৲

শ্রীমতী আশালতা সিংহের
সমী ও দীপ্তি ১৲ সমর্পণ ১৷৷০
ভুলের ফসল ২৲ অন্তর্যামী ১৷৷০

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
মরীচিকা ১৲ মরুশিখা ১৷৷০
কাব্য পরিমিতি ১৲

প্রমথনাথ বিশীর
গালি ও গল্প ১৷৷০ গল্পের মতো ১৷৷০
মৌচাকে ঢিল (২ সং) ২৷৷০

অজিতকৃষ্ণ বসু (অ-কৃ-ব)
জীবন সাহারা ১৷৷০

রবীন্দ্রোত্তর শ্রেষ্ঠ কবি-সমালোচক

শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের

বাংলা কবিতার ছন্দ ৪৲ বাংলার নবযুগ ৪৲ আধুনিক বাংলা সাহিত্য (৩ সং) ৫৲
বিস্মরণী (৩ সং) ৪৲ স্মর-গরল ৪৲ কাব্য-মঞ্জুষা ৩৲

সু বী র শি শু গ্র ন্থ মা লা

মোহিতলাল মজুমদারের
রূপকথা (২ সং) ১৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ছেলেদের আরণ্যক ৩৲

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শিবাজী মহারাজ ১৲

নন্দগোপাল সেনগুপ্তের
বসন্তের রাণী ৷৷০

জে না রে ল প্রি ণ্টা র্স য়্যা ণ্ড পা ব লি শা র্স লিঃ
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

লেখ-সূচী

১৩। মণিমালা (কবিতা
অধ্যাপক বিভূতি চৌধুরী···· ৫৩

১৪। বাংলার লীগ শাসনের ক'বছর
শ্রীকিরণশঙ্কর রায় ···· ৫৪

১৫। জ্যাক ও জিপ (গল্প)
শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী ৬৭

১৬। ভারতীয় শিল্পের নবযুগ
অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৪

১৭। উত্তমাশা অন্তরীপ (অনূদিত গল্প)
ডক্টর হিরণ্ময় ঘোষাল ··· ৭৯

১৮। বড়ো সাহিত্য ও গণসাহিত্য
অধ্যাপক প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৮২

১৯। উলুখড় (গল্প)
নবেন্দু ঘোষ ··· ৮৮

২০। এশিয়ার প্রথম আন্তর্জাতিক মৈত্রী সম্মেলন
ডক্টর কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত ১০২

২১। করোটির কূটকাম (অনূদিত গল্প)
বিশু মুখোপাধ্যায় ···· ১১৪

২২। ভারতের পল্লী-পরিকল্পনা
ভূপতি চৌধুরী ···· ১২১

২৩। বাংলার মাছ
শ্রীকাশীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়···· ১২৯

২৪। প্রবাসী বাঙ্গালীর সমস্যা
শ্রীঅবনীনাথ রায় ···· ১৩১

২৫। পঞ্চগ্রাম
শ্রীগৌরীহর মিত্র ···· ১৩৪

২৬। পত্রলেখা ···· ···· ১৩৬

২৭। সম্পাদকীয় ···· ···· ১৩৭

প্রীতি-উপহারের শ্রেষ্ঠ বই

নূতন উপন্যাস

সরোজ রায়চৌধুরীর—**মহাকাল** ৩॥০ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের—**সূর্য-সারথি** ৩৲ নবেন্দু ঘোষের—**কালোরক্ত** ২৷৷০
শৈল চক্রবর্তীর —**বাঘের বিয়ে হল** ১৷৷০ মনোজ বসুর—**ওগো বধূ সুন্দরী** ২৷৷০ অলকা মুখোপাধ্যায়ের—**তোমারই** ২৲
কার্টুন ২৲ **কৌতুক**—১৷৷০ **একদা নিশীথ কালে** ২৷০ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের **পঞ্চভূত**—১৷৷০

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
রাষ্ট্র-সংগ্রামের এক অধ্যায় ২৲
পঞ্চাশের মন্বন্তর (৪র্থ সং) ২৲
চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের
কংগ্রেস সংগঠনে বাংলা ১৷০
প্রমথনাথ বিশীর
বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য ২৲
বিনয় ঘোষের
শ্রীবঙ্গের নানা প্রসঙ্গ ২৲
অধ্যাপক অজিত ঘোষের
বাংলা নাটকের ইতিহাস ৫৲
গোপাল ভৌমিক সম্পাদিত
১৩৫১র সেরা কবিতা ২৲

আজাদ-হিন্দ গ্রন্থমালা
নেতাজী সুভাষচন্দ্রের
দিল্লী চলো
নীহাররঞ্জন গুপ্তের
মুক্তি পতাকা তলে ২৷০
জ্যোতিপ্রসাদ বসুর
নেতাজী ও আজাদহিন্দ ফৌজ ২৷০
শান্তিলাল রায়ের
আরাকান ফ্রণ্টে ২৲
মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর
বিপ্লবীর আহ্বান ১৷০
নৃপেন্দ্র সিংহের
ভারত ছাড় ২৷০

অতুলচন্দ্র গুপ্তের
সমাজ ও বিবাহ ১৷০
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের
সমাজ ও সাহিত্য ২৷০
সুবোধ ঘোষের—**রক্তবল্লী** ২৲
মহেন্দ্র চন্দ্র রায়ের—**ম্যাক্সিম গোর্কী** ৩৷০
দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বিশ্বসংগ্রামের গতি ২৲
বিখ্যাত সাহিত্যিকবৃন্দ-বিরচিত
গল্প লেখার গল্প ২৷০
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নির্ব্বাসিতের আত্মকথা ২৲
ঊনপঞ্চাশী ২৲

বিখ্যাত নাটক

মনোজ বসুর
নূতন প্রভাত ১৷৷০ **প্লাবন** ১৷০
তারাশঙ্করের—**দীপান্তর** ১৷০
বনফুলের—**মন্ত্রমুগ্ধ** ২৷৷০
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের—**লাল পাঞ্জা** ১৷০
বীরেন্দ্র ভদ্র রূপায়িত—**সীতারাম** ২৲
প্রমথনাথ বিশীর—পরিহাস বিজল্পিতম ১৷০ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের —**বন্দ্মার বিয়ে** ১৷০ দেবনারায়ণ গুপ্ত নাটকায়িত **রাজপথ** ২
দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের—**দীপশিখা** ৷৷০ পাঁচজন বিখ্যাত নাট্যকার বিরচিত—**বিচিত্রিতা** ১৷

বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে পত্র লেখবার সময় দয়া করে 'বর্ত্তমানে'র নামোল্লেখ করবেন।

"ম্যালোফেব্রিন"

ম্যালেরিয়ার মহৌষধ

সর্ব্বপ্রকার জ্বরে নিয়মিত ব্যবহার করিলে আর পুনরাক্রমণের ভয় থাকে না।

বিশেষতঃ পুরাতন জ্বরে বিশেষ ফলপ্রদ

প্রস্তুতকারক :—

এমসিকো রেমিডিস্ লিমিটেড্

৮৬ বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট্ (রুম নং ৫৫)

কলিকাতা।

কুমার ব্যানার্জি এণ্ড কোং

সত্বাধিকারী—শ্রীবিশ্বপতি ব্যানার্জি

১নং ব্রজগোবিন্দ সাহা লেন, নিমতলা, কলিকাতা

টিম্বার মার্চ্চেণ্টস্ ও জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্স

সেগুন, শাল, জারুল, লৌহকাষ্ঠ প্রভৃতি পাইকারী ও খুচরা পাওয়া যায়।

ফেবারিট মোটর ষ্টোর্স

৩৮, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

স্বত্বাধিকারী—শ্রীযুক্ত বেচারাম মণ্ডল

মোটরগাড়ীর সব রকম সাজসরঞ্জাম, মোটর গাড়ীর তেল, গ্রিজ্ ইত্যাদি সব রকম প্রয়োজনীয় জিনিষ বাজারের চেয়ে সুলভে পাওয়া যায়

-চিত্র-ছবি-

কবিগুরু - রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইস্পাতের সাহায্যে দালান

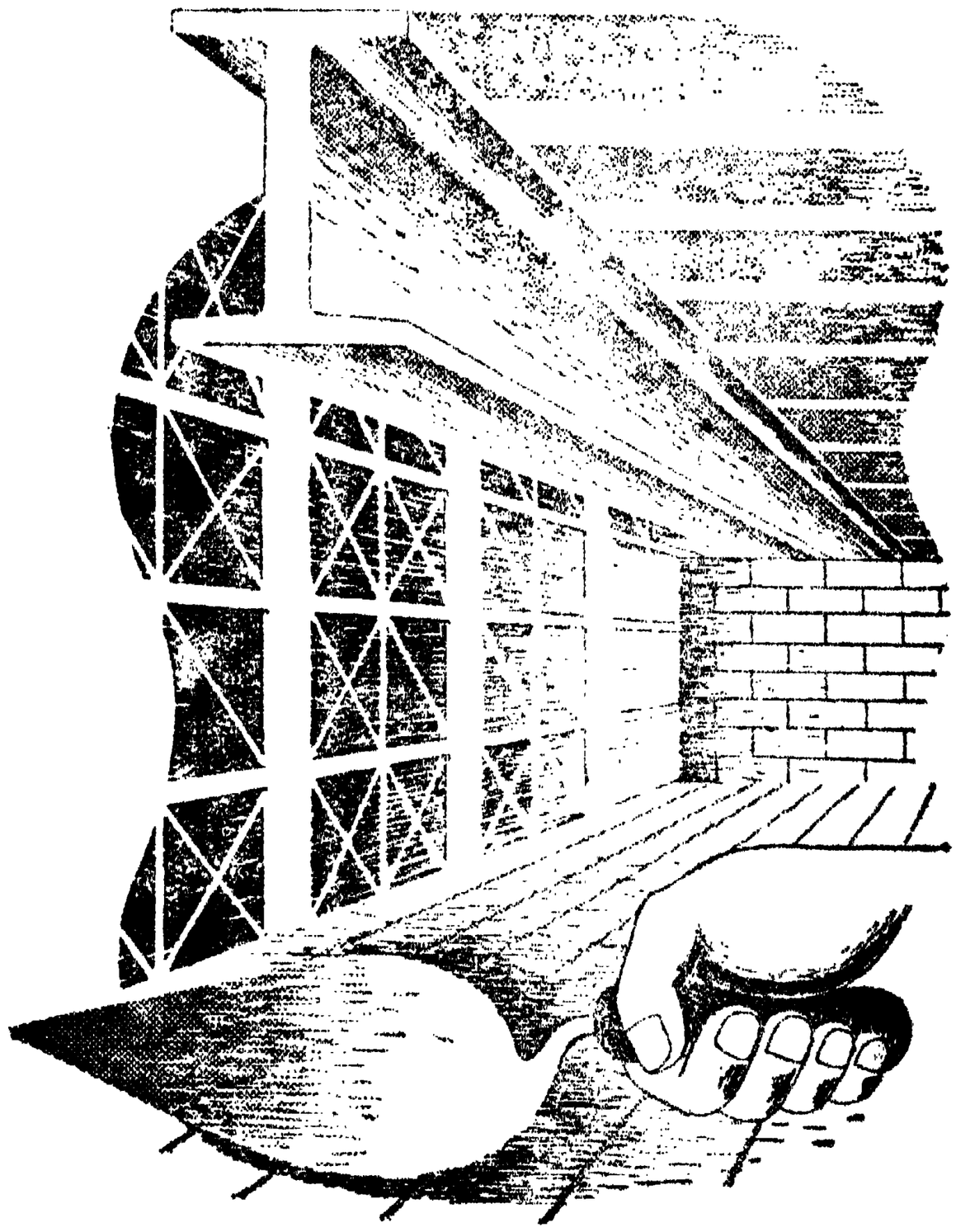

TATA STEEL

দি টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ

হেড সেলস্ অফিস ঃ ১০২এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নবপ্রকাশিত কয়েকখানি বই

শ্রীফাল্গুনি মুখোপাধ্যায় :

স্বাধীনতা হীনতায় ৪৲

শ্রীসুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় :

বন্দেমাতরম্ ৩৷৷০

(ছায়াচিত্রে রূপায়িত)

শ্রীতারাপদ রাহা :

রহস্যময়ী ২৷৷০

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় :

যুগের যাত্রী ২৷৷০

শ্রীপ্রবোধ সরকার :

জীবন সৈকত ২৸০

(চিত্ররূপ—C. I. D)

প্রকাশক : সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং

১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্তের

—: শেষের গান :—

(কাব্য-কাহিনী)

মূল্য—১৷০

অভিমত :—

"চমৎকার কবিতা। সত্যিকারের কবিতা।। অতি সুন্দর। ভাষাও অনবদ্য—পড়িয়া খুব ভাল লাগিল। রবীন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথ ছাড়া কোন কবির এ বিষয়ে এত সুন্দর কবিতা পড়ি নাই।"

—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

প্রাপ্তিস্থান—বর্তমান লিমিটেড্

৩৩এ, মদন মিত্র লেন

ও

গ্রন্থকারের নিকট,

৪৫/১ বি, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মার্কারী ইলেকট্রিক্যাল

ওয়ার্কস্

৬ নং পার্শিবাগান লেন

কলিকাতা—৯

ফোন বড়বাজার—১৭৬০

প্রোপ্রাইটার্স :—কে, বি, ইণ্ডিয়া লিঃ

বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে পত্র লেখবার সময় দয়া ক'রে 'বর্তমানে'র নামোল্লেখ করবেন।

১৩৫৪

বর্তমান

প্রথম বর্ষ ● প্রথম সংখ্যা
বৈশাখ ● ১৩৫৪

দু'খানি চিঠি

(১)

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন —

আমার যশকে যে আপনারা লাভ বলে গণ্য করেন এইটেই আমার পরম লাভ। নইলে আর কোনো কারণে যশ জিনিষটাকে বিশেষ সৌভাগ্য বলে জ্ঞান করতে পারিনে। মাথার উপর থেকে বেশ কষে ঘরের চালটা উড়িয়ে দিয়ে গেল এখন সহস্র লোকের চক্ষুঃতারকার নীচে বাস করতে হবে — এতে শান্তি কোথায়? যাই হোক, অন্তত খুব পথ দিয়ে দেশের লোকের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশের অবারিত অধিকার লাভ করা গেল — যখন কাছে ছিলুম তখন হয়ত এত কাছে ছিলুম না, কিন্তু এই সমস্ত গোলে হরিবোলের মধ্যে অনেকটাই

ফাঁকা আওয়াজ—এতে তৃপ্তি নেই। বয়স যখন অল্প ছিল তখন হয়তো এতে নেশা ধরে যেত কিন্তু এখন সত্যের খোরাক না হলে দিন চলে না।

এখন কেবল ভয় হচ্ছে জীবনের সন্ধ্যাপ্রদীপটাকে জ্বালিয়ে তোলবার মত একটু আড়াল পাব না বুঝি—চারদিক থেকে কেবল হাওয়া দিচ্চে।

দেশের লোকের ভয় হয়েছিল আমার একটা নূতন পরিবর্ত্তন হয়েচে—কিন্তু দেশের লোক হয়ত জানেনা এ পরিবর্ত্তন আমার জন্মকালেই হয়েচে—বস্তুত আমি যদি য়ুরোপের স্পর্শে অচেতন থাকতুম, যদি দেখতুম এখানকার হাওয়ায় আমার কুঞ্জবনে কোন মুকুলই ধরচেনা, কোথাও কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্চেনা তাহলেই বুঝতুম আমার পরিবর্ত্তন হয়েচে। আমার গান হচ্চে—

আমি সব নিতে চাই, সব নিতে চাইরে—
আপনাকে ভাই মেলব যে বাইরে।

মানবজীবন নিয়ে এই যে পৃথিবীতে এসেচি এ পৃথিবীকে আমি খাটো করে নিজেকে ফাঁকি দিতে পারবনা—পশ্চিমদিকের উপর আড়ি করলেই যে পূর্ব্বদিকটাকে বেশি করে পাওয়া যায়, এ কথা আমি বিশ্বাস করিনে—বরঞ্চ ঠিক এর উল্টো।

C/o মেসার্স টমাস কুক এ্যাণ্ড সন
লাডগেট সার্কাস, লণ্ডন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯শে জুন, ১৯১৩।

[পত্রখানি অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয়কে লিখিত
এবং তাঁহার পুত্র শ্রীবিমলকুমার গুপ্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

(২)

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। প্রত্যেক বীজ আপনার বিকাশের খাদ্য আপনার মধ্যেই ধরে রাখে—সেই খাদ্যটুকুর মধ্যেই তার ভাবীকালের প্রাণসঞ্চয়। উপযুক্ত ক্ষেত্র পেলেই সে অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। আমাদের আত্মার অমৃত অন্ন আত্মারই গভীর কেন্দ্রে নিহিত—আত্মসমাহিত শান্তির মধ্যে তাকে পাওয়া যায়। এখন তুমি যে শান্তির মধ্যে মগ্ন হবার অবকাশ পেয়েচ সেই শান্তির গভীরতাতেই

তুমি আপনার বাণী আপনি পাবে। মঙ্গলকর্ম্মের মধ্যেও এই শান্তি পাওয়া যায়, কিন্তু কর্ম্মকে সম্পূর্ণ অহংমুক্ত করা বড় কঠিন। কর্ম্মশালার জানালা দরজা যত বড়ই হোক্ তবু তার মধ্যে বদ্ধতা থেকে যা এইজন্যে কর্ম্মশালার বাইরে খোলা বাগানের দরকার হয়, যাঁরা কর্ম্মসন্ন্যাসী কর্ম্মের চক্রবাত্যায় আত্ম বাণীকে হারিয়ে ফেলবার আশঙ্কা তাঁদের যথেষ্ট আছে—এইজন্যে তাঁদের পক্ষেও কর্ম্মের চারিদিকে ব অবকাশকে প্রসারিত রাখা খুবই আবশ্যক—নইলে ভালো কর্ম্মও নেশা হয়ে উঠে অহংকে উগ্র ও আত্মাকে আবিষ্ট করে দেয়। কর্ম্মের সংসার থেকে তুমি ছুটি পেয়েচ এখন তুমি আদেশের জন্যে বাইরের দিকে তাকিয়ো না, অন্তরতম নিজের কাছে এসো—তার কাছ থেকে এখন সাড়া পাবে। যে গুরু নিজেকে ভোলান না বলেই অন্যকে ভোলান না সে রকম গুরু নিতান্তই দুর্লভ, অথচ যদি তাঁদের দর্শন মেলে তাঁদের মত সুলভ কেউ না। যার দরকার আছে তাকে না দিয়ে তাঁরা থাকতেই পারেন না নইলে তাঁরা অকৃতার্থ হন,—ভরা মেঘ মরুভূমিতেও জল বর্ষণ না করে থাকতে পারে না সেইরকম গুরুই কতবার পৃথিবীতে এসেচেন, আর তাঁদের যা দেবার তা দিয়ে চলে গেছেন—না দিয়ে যাবার জো ছিলনা। ভেবে দেখ, ভারতে এমন দিন ছিল যখন লিপি ছিলনা, গ্রন্থ আকারে ভাবপ্রকাশ করবার উপায় ছিলনা তবু যাঁরা পেয়েছিলেন তাঁরা না দিয়ে যেতে পারেন নি। আমিতো তাঁদেরই এক একটি বাণীর মধ্যে গুরুর স্পর্শ পাই। আর কিছুনা, সেই বাণী শান্ত হয়ে শুনতে হয়—নিজের আত্মার বাণীর সঙ্গে তার সুর মিল করে তবে তাকে পাওয়া যায়। মন যখন শান্ত তখন একটিমাত্র শব্দই যথেষ্ট "সত্যং"— বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে,—শান্তং শিবম অদ্বৈতং—কোথাও কিছু আর ফাঁক থাকেনা—কেননা কোলাহলমুক্ত হলে এই ধ্বনি আপনার মধ্যেই শোনা যায়। আনন্দরূপমমৃতং—অনন্ত দেশকাল আনন্দের অমৃতে নিবিড়, নিজের নিভৃত আত্মার মধ্যেই তার চরম সাক্ষ্য। সে সাক্ষ্য না পেলে বাইরের কথার কোনো মূল্য নেই। আমরা যখন গুরুকে মানি তখন গুরুকেই মানি সত্যকে না,—সত্যকে তখনি যথার্থ মানি যখন আত্মার কাছে তাকে পাই।

তোমাকে লেখা আমার যে চিঠিগুলি প্রবাসীতে বেরিয়েচে তা পড়ে অনেকে আনন্দ পেয়েচেন। এই সম্বন্ধে আমি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ খুব সুন্দর পত্র পেয়েচি— সেটা আমার পক্ষে বড়ো সান্ত্বনার। নিজের ভিতরকার ঠিক কথাটি লেখা একেবারেই সহজ নয়,—তুমি আমাকে লিখিয়েচ বলেই লিখেচি—কোমর বেঁধে সাধারণকে উপদেশ দেবার জন্যে যদি লিখ্‌তুম তা হলে বানানো কথা হত—অন্তরের সহজ কথা বল্‌তে পারতুম না। ইতি—২০ মাঘ ১৩৩৪

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[শ্রীমতী কাদম্বিনী দেবীকে লিখিত]

সাদৌ শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন না, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তথাপি শুধু কাহিনী বা ঘটনার প্রয়োজনই নয়, এই কাপালিক-চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের সেই মূল ভাবকল্পনারও পুষ্টি-সাধন করিয়াছে—কপালকুণ্ডলাচরিত্রের উপরে তাহার গৌণ প্রভাব নানাদিক দিয়া সেই চরিত্রকে স্ফুটতর করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে একটা নিষ্ঠুর নির্ম্মমতার মূর্ত্তিরূপেই চিত্রিত করিয়াছেন বটে; তথাপি, প্রথমদিকে তাহার সেই নির্ম্মমতার মধ্যেও এমন একটা আত্মস্থতা ও দৃঢ়তার আভাস আছে, যে বিতৃষ্ণাসত্ত্বেও আমরা কেমন যেন একটু আকৃষ্ট হই, ভয়ের মধ্যেও একটু শ্রদ্ধা অনুভব করি—শক্তিমানের প্রতি দুর্ব্বল যেমন করে। কিন্তু পরে তাহার সেটুকু মহিমাও আর রহিল না, অতিশয় সাধারণ স্বার্থপর মানুষের মতই তাহার মধ্যে একটা দুর্ব্বল, অসহায়, লোলুপ মূর্ত্তি দেখা দিল—হৃত-সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য সে অতি হীন উপায় অবলম্বন করিতেছে। ইহাতে মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র ঐরূপ ব্যক্তির ঐরূপ সাধনার ঐরূপ পরিণামই যথার্থ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু খাঁটি তান্ত্রিক সাধকের চরিত্র ঐরূপ নহে, সে চরিত্র আমাদের চক্ষে যতই ভ্রান্ত বা দুর্নীতি-কলুষিত হউক, তাহার একটা স্বতন্ত্র বিশ্বাস ও তত্ত্ব-নিষ্ঠা আছে—প্রকৃত সাধক যে, সে ঐরূপ দুর্ব্বল, মোহগ্রস্ত হয় না। ঐ কাপালিক শেষে যে অবস্থায়, যে উপায়ে, যাহা করিতে চাহিতেছে, তাহাতে সে আমাদের কৃপার পাত্র হইয়াছে। তান্ত্রিকের সাধনা সর্ব্বসংস্কারমুক্তির সাধনা—দেহ-মনের যতকিছু বন্ধন, যতকিছু অভিমান, যাহাকিছু আত্মাকে দুর্ব্বল করে, তাহাই উচ্ছেদ করিবার জন্য তান্ত্রিক ঐরূপ নির্ম্মমতার সাধনা করে। কেবল জ্ঞানের দ্বারা, উচ্চ তত্ত্বচিন্তার দ্বারা, ভাব-সাধনার দ্বারা স্বভাব-সংশোধন করা বড়ই দুরূহ; কারণ, সেই সকল চেষ্টার মূলে স্বভাবের ক্রিয়াই থাকিবে; ভিতরে ভিতরে সেই স্বভাবই মানুষকে ভুলাইয়া, অলক্ষ্যে সূক্ষ্মভাবে প্রবঞ্চনা করিয়া, তাহার সাধনা ব্যর্থ করিয়া দেয়; তাই স্বভাবকেও নিহত করিতে হইবে। এই জন্যই যোগপন্থা ও অঘোরপন্থা—বৈদান্তিক সাধনা ও তান্ত্রিক সাধনায় এত প্রভেদ। বঙ্কিমচন্দ্রের এই কাপালিক কেবল সেই নির্ম্মমতার একটা ভীষণ মূর্ত্তি মাত্র। তাহার ভবানীভক্তিও একটা অন্ধভক্তি বলিয়াই মনে হয়। তথাপি তাহার এই সাধন-মন্ত্রের দ্বারা, সে তাহার পালিতা কন্যার সারা চৈতন্য আবিষ্ট করিয়াছে; সে যাহাকে একটা অসম্পূর্ণ জ্ঞান, এবং কতকগুলা অনুষ্ঠানের দ্বারা লাভ করিতে চায়—এখনও করে নাই, ঐ কন্যা তাহার নারীসুলভ অজ্ঞান-অনুভূতিতেই তাহাকে প্রাণে লাভ করিয়াছে, তন্ময় হইয়া গিয়াছে; সেই শক্তিকে—সেই দেবী-ভবানীকে সে বিশ্বময় দেখিতেছে, তাহার নিজের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা ইচ্ছাশক্তি নাই। কাপালিকের সাধনার মূলে যে সত্য ছিল, তাহা কাপালিকের চরিত্রে নয়—ঐ অপর চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে; এইজন্য কাপালিক চরিত্রের যাহা কিছু নীচতা ও দুর্ব্বলতা তাহাই যেন কপালকুণ্ডলা সংশোধন করিয়া লইয়াছে। কপালকুণ্ডলাও নির্ম্মম বা মমতাহীন; কাপালিক যাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে নাই, সে তাহাতে অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। কিন্তু সেই নির্ম্মমতার বলেই সে অপূর্ব্ব করুণাময়ী, কাপালিকের প্রতিও তাহার করুণার অন্ত নাই। কাপালিক তাহাকে অজ্ঞান অবোধ মনে করে, এমন কি তাহার সাধনার বিঘ্ন ঘটাইয়াছে বলিয়া তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে; কিন্তু সেও জানে না, যে-শক্তির সে আরাধনা করে সেই শক্তির সহিত তাহার ঐ কন্যা একাত্ম হইয়া গিয়াছে। কপালকুণ্ডলা-চরিত্রের সহিত কাপালিক-চরিত্রের যোগে, উপন্যাসের ভাববস্তুর যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সবিস্তার আলোচনা করিলাম।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, কপালকুণ্ডলা কাব্য হইলেও ইহার একপ্রকার নাটকীয় প্রকৃতিও লক্ষণীয়। ইহাও সত্য যে, ইহার ঘটনাধারা একটা নিদারুণ ব্যর্থতায় সমাপ্ত হইয়াছে। অতএব ইহাকে বিলাতী কাব্যশাস্ত্রের মতে ট্র্যাজেডি বলা যাইতে পারে। কিন্তু ভাল করিয়া ভিতরে দৃষ্টি করিলে ইহাকে ঠিক সেই আদর্শের ট্র্যাজেডি

বলা যায় না। কারণ, ইহাতে—ভিতরে ও বাহিরে মানুষের জীবনগত কোন বৃহৎ সংঘর্ষ নাই, এই কাহিনীতে মানুষের জীবন বা চরিত্র বিশেষ মর্য্যাদালাভ ও করে নাই—একটা দুর্দ্ধর্ষ দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় শক্তির সম্মুখে মানুষ মুহূর্ত্তকালও দাঁড়াইতে পারে নাই। যাহাকে 'human interest' বলে তাহাও ইহাতে অল্প। ইহাকে প্রেমের ট্র্যাজেডিও বলা যায় না, কারণ, মতিবিবির প্রেমে সেইরূপ ট্র্যাজেডির আভাস থাকিলেও শেষ পর্য্যন্ত তাহা শোচনীয় না হইয়া অকিঞ্চিৎকর হইয়াছে এবং নবকুমারের প্রেমও পৌরুষের অভাবে নিতান্তই কৃপার যোগ্য হইয়াছে। অতএব কপালকুণ্ডলা সেই বিলাতী অ'দশের খাঁটি ট্র্যাজেডি নয়।

তথাপি ইহাতে একটা ভিন্নতর ট্র্যাজেডির ইঙ্গিত আছে। ব্যক্তিবিশেষের জীবন বা চরিত্রঘটিত যে নিদারুণ পরিণাম, তাহাই মহিমান্বিত হয় নাই বটে,—ইহা 'ওথেলো' 'ম্যাকবেথ' 'এ্যান্টনির' ট্র্যাজেডি নয়; কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়ার তাঁহার 'হ্যামলেট' এবং বিশেষ করিয়া 'লীয়ারে' যে ট্র্যাজেডি-রসের সৃষ্টি করিয়াছেন- সমগ্র মানব জীবন বা সৃষ্টির মূলে যে একটা নির্ম্মম বা অন্ধশক্তির লীলা, ও তাহারই কারণে মানুষের নিষ্ফল সংগ্রামের যে নিরাশ্বাস তাহাতে ঘনাইয়া উঠে—অথবা, ইংরেজ ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডির (Thomas Hardy) উপন্যাসগুলিতে যে ধরণের ট্র্যাজেডি আমাদিগকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়—'কপালকুণ্ডলা'র সহিত তাহার কিছু সাদৃশ্য আছে। তথাপি কপালকুণ্ডলা ঠিক সেই জাতীয় ট্র্যাজেডি নয়। কারণ বঙ্কিমচন্দ্র ইহাতে যে শক্তিকে জয়যুক্ত করিয়াছেন তাহার মহিমা এমনই যে, মানুষ তাহার তুলনায় আপন ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতা স্বীকার করে—অভিভূত হইলেও হতাশ্বাস (demoralised) হয় না, পরাজিত হইলেও সে পরাজয়ে নিরাশ্বাস জাগিয়া থাকে না। উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদের শেষ দৃশ্য স্মরণ করিলেই ইহা নিঃসংশয় হইয়া উঠিবে। সেখানে সেই শক্তিরই প্রতীকরূপিনী মানবী-কপালকুণ্ডলা মানব নবকুমারের প্রেম যে ভাবে প্রত্যাখ্যান করিল, এবং তাহার ফলে সেই হতভাগ্য পুরুষের জীবন-নাট্যে যে যবনিকা পড়িল, তাহা চিন্তা করিয়া পাঠকের হৃদয় যেমন মথিত হয়, তেমনই, সেই ভাবাকুলতার মধ্যেও একটি অনির্ব্বচনীয় বৈরাগ্য বা শান্তরসের উদ্রেক হয়- ঠিক এই রস য়ুরোপীয় ট্র্যাজেডির রস নয়। আবার নবকুমার এই উপন্যাসের নায়ক হইলেও, নায়িকা কপালকুণ্ডলাই তাহার অসাধারণ চরিত্র মহিমায় উপন্যাসের আর সকল চরিত্রের মত, ঐ নায়ককেও এমন ম্লান করিয়া দিয়াছে যে, এই উপন্যাসের ট্র্যাজেডি মুখ্যতঃ তাহারই জীবনের ট্র্যাজেডি। কিন্তু তাহার সে আত্ম বিসর্জ্জন, আমাদের চক্ষে যেমনই হৌক তাহার নিজের পক্ষে একটা পরম সিদ্ধিলাভ—'a consummation devoutly to be wished'; অতএব দুঃখ করিবার কিছু নাই।

এই সকল কারণে, কপালকুণ্ডলা ট্র্যাজেডি হইলেও একটা নূতন রসের ট্র্যাজেডি—ইহার প্রেরণাই স্বতন্ত্র। আমি পুনরায় সংক্ষেপে তাহা বলিতেছি। খাঁটি য়ুরোপীয় ট্র্যাজেডির উপযুক্ত নায়ক-নায়িকা ইহাতে নাই, একমাত্র কপালকুণ্ডলার চরিত্রই ট্র্যাজেডির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিবার উপযুক্ত বটে; কিন্তু সে চরিত্র সাধারণ মানব-চরিত্র নয়, তাই সে তাহার নিয়তিকে অনায়াসে, বিনা সংগ্রামে পরাস্ত করিয়াছে—তাহার পক্ষে কোন ট্র্যাজেডিই সম্ভব নয়। অপরগুলির মধ্যে কোথাও কঠিন প্রবৃত্তিবিরোধ বা দুর্জ্জয় প্রবৃত্তি-বেগ নাই; মতিবিবির মধ্যে যাহা ছিল তাহা অর্দ্ধপথেই প্রায় নিরস্ত হইয়াছে, কপালকুণ্ডলার সহিত পুনরায় সাক্ষাতের পরে সে দ্বিধাগ্রস্ত ও নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। যেন সেই এক শক্তিই আর সকলকে আচ্ছন্ন ও অভিভূত করিয়া ফেলে। সমুদ্রতীরের সেই মরু-ক্ষেত্র হইতে যে ঝড় প্রবাহিত হইয়াছে তাহার গতিরোধ করে এমন সাধ্য কাহারও নাই; সেই ঝড় অবাধে ও দ্রুতগতিতে সকল তুচ্ছ বাধা

অপসারিত করিয়া আপন ধ্বংসকার্য্য সমাধা করিয়াছে —শেষে ভাঙনধরা নদীর কূলে, অপর এক শ্মশানে সে তাহার প্রাপ্য বলি আদায় করিয়া লইয়াছে। সেই বলিও নবকুমার নয়—কপালকুণ্ডলা, অর্থাৎ তাহার বলি সে নিজেই। নবকুমার সামান্য মানুষ মাত্র—বড় ক্ষুদ্র; তাই অন্তিমকালে সে সেই মহাশক্তিরূপিনীর নিকটে উন্মাদের মত প্রেম ভিক্ষা করিল, পাইল কেবল করুণা, সুমহতী ক্ষমা। অতএব এই ট্র্যাজেডিতে মানুষের প্রতি কৃপা আছে, সেই কৃপার মধ্যেই করুণ-রস আছে। কিন্তু মানুষ যে কত ক্ষুদ্র—তাহার সমাজ, তাহার সংসার, তাহার সুখদুঃখ, সম্পদ-বিপদ, তাহার ন্যায়-অন্যায়, তাহার সদসৎ, তাহার চরিত্র-নীতির অভিমান, এবং প্রেমনামক তাহার সেই পিপাসার যতকিছু বিকার—সকলই যে কিরূপ মূঢ়তা, দুর্ব্বলতা ও স্বার্থপরতার নিদর্শন, এই কাব্যে তাহাই নির্ম্মমভাবে প্রকটিত হইয়াছে। সেই ঝড়ের ঝাপটে যে নীড় ধ্বংস হইয়া গেল, তাহাও আকারে বা আয়তনে বড় নয়। কবির দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ। ইংরাজীতে যাহাকে Sublime বলে তাহারই রুদ্রকান্ত রূপের ধ্যানে কবি তন্ময়—সেই Epic Sublimityই এ কাব্যের প্রধান রস। তাই, ইহাতে মানুষের বিদ্রোহী আত্মার মহিমা-ঘোষণা নাই; তাহাকেও অতিক্রম করিয়া একটা বিরাট—বিশালের স্তুতি এই কাব্যের মূল প্রেরণা হইয়াছে। এ যেন অর্জ্জুনের বিশ্বরূপদর্শনের মতই—একটা ক্ষুদ্রতর পট-ভূমিকায়—আর এক প্রকার শক্তিরূপ-দর্শন। এ তুলনার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, ঐ তুলনা দ্বারা একটা বস্তু সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে, তাহা এই যে,—এই কাব্যেও সেই এক ভারতীয় ভাবদৃষ্টির প্রেরণা রহিয়াছে; সে যে কি দৃষ্টি তাহা বুঝাইবার পক্ষে ঐ এক তুলনাই যথেষ্ট। অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা—নাটক-রোমান্স-উপন্যাস-ট্র্যাজেডী —যে গুণযুক্ত হউক, তাহা যে একটি সম্পূর্ণ মৌলিক সৃষ্টি তাহাতে সন্দেহ নাই।*

*লেখক সম্পাদিত (যন্ত্রস্থ) 'কপালকুণ্ডলার ভূমিকা' হইতে।

"আমরা অর্থনীতি বা ধর্মনীতিতে যে দলেরই লোক হই, আমাদের সেই দলাদলি যে সাহিত্যকে বিশেষ ছাঁদে গড়ে তুলবেই, এমন কোনো কথা নেই। রসের দিক থেকে মানুষের ভাল মন্দ লাগা কোনো মতকে মানতে বাধ্য নয়। আমার মনটা হয়তো সোশ্যালিষ্ট। আমার কর্ম্মক্ষেত্রে তা ভিতর থেকে প্রকাশ পেতেও পারে, কিন্তু 'উর্বশী' কবিতাকে সে স্পর্শও করে না। শালের কাঠ এবং শালের মঞ্জরীর প্রকাশ স্বতন্ত্র। মার্ক্‌সিজমের ছোঁয়াচ যদি কারও কবিতায় লাগে, অর্থাৎ কাব্যের জাতরেখে লাগে, তা হলে আপত্তির কথা নেই, কিন্তু যদি নাই লাগে তাহ'লে কি জাত তুলে গাল দেওয়া শোভা পায়? কেমিষ্ট্রির ল্যাবরেটরি যদি ভালোয় ভালোয় জুড়তে পারো রান্নাঘরে, তবে সায়ান্সের জয়জয়কার করব, কিন্তু নাই যদি পারো তাহলে হারজিতের তর্ক তুলবো না, ভোজনটার ব্যাঘাত না হ'লেই হোলো।"—রবীন্দ্রনাথ

মণ্টু মদন ঘোষালের নাতি, বয়স পাঁচ বছর। শিল্পী মদন ঘোষাল তখন উত্তেজনার তুঙ্গে আরোহণ করে' বসে আছেন।

বললেন -"মাধব গোমস্তাকে ডেকে দিন তো একবার।"

একটু পরেই মাধব গোমস্তা এল।

"মাধব, দেখ তো জনার্দ্দন গোস্বামী নামে কি আমাদের প্রজা আছে কোনও? আমার তো যতদূর মনে পড়ছে ও নামের কেউ নেই।"

"দেখি।"

মাধব চলে গেল।

পরবর্ত্তী দৃশ্যের অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করতে লাগলেন মদন। কেবলই তাঁর মনে হতে লাগলো নাটকটা বেশ জমেছে, শেষ পর্য্যন্ত কি হয়…।

মাধব ফিরে এসে বললে—'আজ্ঞে হ্যাঁ। জনার্দ্দন গোস্বামী নামে আছে একজন প্রজা দুর্গাপুর মহালে।"

"আছে? ভাল করে' দেখেছ তুমি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—তার পঞ্চাশ টাকা খাজনাও বাকী আছে।"

উত্তপ্ত কণ্ঠে ধমক দিয়ে উঠলেন মদন:

"খাজনা বাকী আছে কি না তা তো দেখতে বলি নি তোমায়, ও নামের কোনও লোক আছে কি না।"

"আছে।"

'ভাল করে' দেখেছ তো?"

"দেখেছি।"

"আচ্ছা যাও তবে।"

ক্ষুব্ধ হয়ে বসে রইলেন মদন ঘোষাল। আজকাল আর নাটক জমে না। ঠিক সমে কিছুতেই যেন তালটি পড়ে না আজকাল। সবই কেমন যেন পানসে গোছের।

"ভয় পাইও না, কারণ মনুষ্য জাতির ইতিহাসে দেখা যায়, যত কিছু শক্তি ও প্রতিভার বিকাশ হইয়াছে, সবই সাধারণ লোকের মধ্যে। আর ইতিহাসে একবার যাহা ঘটিয়াছে তাহা পুনরায় ঘটিবে। কিছুতেই ভয় পাইবে না। তোমরা অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য করিবে। যে মুহূর্তে তোমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইবে, সেই মুহূর্তে তুমি শক্তিহীন। ভয়ই জগতের সমুদয় দুঃখের মুখ্য কারণ, ভয়ই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কুসংস্কার।'

* * *

"তোমার কি হবে এ ভয় কখনও ক'রোনা, কারও উপর নির্ভর ক'রোনা। যখন তুমি অপরের সাহায্যের আশা ভরসা ছেড়ে দাও, কেবল সেই মুহূর্তেই তুমি মুক্ত—বিবেকানন্দ

খণ্ডিত বাংলা ও অখণ্ড ভারত

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা দেশকে দুইটি প্রদেশে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব উঠিবার পর উহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি অনেক প্রকার বিবৃতি দিয়াছেন; অনেকগুলি পুস্তিকাও ও সম্বন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছেন তাঁহারা মনে করেন যে, এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে আমাদের জাতীয়তাবাদের গোড়াই কাটিয়া যাইবে। হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় ধর্ম্মাবলম্বীদের লইয়াই যখন ভারতীয় নেশন গঠিত, তখন প্রদেশভেদের জন্য বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করার সোজা অর্থ এই যে, হিন্দু ও মুসলমান দুইটি পৃথক নেশন; এবং এক রাষ্ট্রের ভিতর তাহাদের পক্ষে শান্তিতে বাস করা অসম্ভব। অতএব একজাতীয়তাবাদ যদি রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে আপাততঃ আমাদিগকে যতই অসুবিধা ভোগ করিতে হউক না কেন, ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া তাহা আমাদের নীরবে সহ্য করাই উচিত। সাম্প্রদায়িকতার অত্যাচার একটা সাময়িক ব্যাপার মাত্র। একদিন না একদিন আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের মন সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার অন্ধকার হইতে মুক্ত হইয়া জাতীয়তার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে; এবং তখন আমরা উভয়ে জাতীয়তার ধ্বজা তুলিয়া মহানন্দে গলা ধরাধরি করিয়া দিগ্বিজয় করিতে অগ্রসর হইব।

এই বিরোধী দলের মধ্যে যাঁহারা সমাজতন্ত্রবাদী তাঁহারা বলেন—বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ রাজনৈতিক ক্ষমতালুব্ধ ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ। নিপীড়িত কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর ধর্ম্মবিলাসের অবসর নাই। অন্নবস্ত্রের সংস্থানের চেষ্টাতেই তাহাদের দিন কাটিয়া যায়। এ বিষয়ে হিন্দু ও মুসলমান কৃষক ও শ্রমিকের একই অবস্থা। ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই অশিক্ষিত কৃষক ও শ্রমিকদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধে লাগাইয়া দিয়া নিজেদের কার্য্য-সিদ্ধির চেষ্টা করে। অতএব সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া রাষ্ট্রপরিচালনের অধিকার কৃষক ও শ্রমিককুলের হাতে তুলিয়া দাও, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ লোপ পাইবে এবং দেশে চিরশান্তি বিরাজ করিবে। বাংলাদেশকে বিভক্ত করিয়া সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের চিকিৎসা করিতে যাওয়া আনাড়ীর লক্ষণ। যাঁহারা সুচিকিৎসক তাঁহারা রোগের মূল কারণ দূর করিবার চেষ্টা করিবেন।

যাঁহারা বঙ্গবিভাগের পক্ষপাতী তাঁহারা এ সমস্ত যুক্তির উত্তরে বলেন—তোমাদের সমাজতন্ত্রবাদ জয়যুক্ত হউক; তোমাদের জাতীয়তাবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হউক—এ সব তো খুব আনন্দের কথা! কিন্তু ভবিষ্যতের আশায় উদ্বুদ্ধ হইয়া বর্ত্তমানকে অগ্রাহ্য করিতে গেলে ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকার সম্ভাবনাই যে নষ্ট হইয়া যায়! সমাজ-তন্ত্রসম্মত রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার কল্পনা যতই সুখদায়ক হউক না কেন, আজ যাঁহারা বাংলাদেশে রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার পাইয়াছেন, তাঁহারা যে সুযুক্তি শুনিয়া স্বার্থত্যাগে প্রবৃত্ত হইবেন সে সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। অধর্ম্মীদের

মনে পরধর্ম্ম-বিদ্বেষ প্রবল করিয়াই তাঁহারা মন্ত্রীর গদি অধিকার করিয়াছেন; এবং যতদিন তাঁহাদের স্বার্থবুদ্ধি প্রবল থাকিবে, ততদিন যে তাঁহারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে বাধা দিতে থাকিবেন, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। দীর্ঘকালব্যাপী প্রচারের ফলে আজ বাংলাদেশের কৃষক ও শ্রমিকের মনে শ্রেণীগত আর্থিক স্বার্থবুদ্ধি অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। নেতৃবৃন্দের মতের বিরুদ্ধে তাহাদিগকে কোনও কার্য্যসূচী গ্রহণ করাইতে গেলে দাঙ্গাহাঙ্গামা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা। কাজেই আপাততঃ বাংলাদেশের অর্দ্ধাংশকে যদি মুসলমান নেতৃবৃন্দের কবল হইতে মুক্ত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে সারা বাংল দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ বরং সুগম হইয়া পড়িবে। ভারতবর্ষ তো এখনই বহু প্রদেশে বিভক্ত। ইহাতে যদি সারা ভারতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কোনরূপ বাধা সৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে আর একটী নূতন প্রদেশের সৃষ্টি হইলেই বা মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইবে কেন? অধিকন্তু জগতে আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইলেই যে মানসিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না। মানুষের সমাজ গঠনে অর্থনীতির প্রভাব যতই প্রবল হউক না কেন, আর্থিক সাম্যই মানবজীবনের শেষ কথা নয়। সুতরাং অর্থসাম্য প্রতিষ্ঠিত হইলেও মানুষের মন হইতে সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইবে কি না, তাহা পরীক্ষা সাপেক্ষ। অনিশ্চিতের আশায় বর্ত্তমানকে অগ্রাহ্য করা মোটেই বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। আপাততঃ বঙ্গ বিভাগ করিয়া দুঃখের মাত্রা হ্রাস করা যাক। সঙ্গে সঙ্গে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতে থাকুক। ইহার ফলে যদি মুসলিম লীগের মন হইতে ধর্ম্মান্ধতা ও অপরের উপর পাকিস্থান চাপাইয়া দিবার প্রবৃত্তি লোপ পায় তখন আবার ভাঙ্গা বাংলা জোড়া লাগাইয়া সমাজতন্ত্রবাদের জয়গান করিলেই চলিবে। আপাততঃ আত্মরক্ষাই পরম ধর্ম্ম।

১। কথার উত্তরে পূর্ব্বপক্ষ বলেন—ইহারই নাম defeatist mentality—পরাজিতের মনোভাব। হিন্দু ও মুসলমান যে একই মায়ের দুই সন্তান, একই রূপসীর দুটি নয়ন তারা, এ তথ্য তো অনেক মনীষী অপূর্ব্ব ভাষায় ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। ভারতের জাতীয়তাবাদ সেই সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এ দেশে ব্রিটিশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি সুখে শান্তিতে বাস করিত। ইংরেজের ভেদনীতি মুসলমানকে হিন্দু হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। আজ যদি আমরা লীগপন্থীদিগের অত্যাচারে অসহিষ্ণু হইয়া বাংলা বা পাঞ্জাবকে একাধিক খণ্ডে বিভক্ত করিতে চাই, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে আমরা হিন্দু ও মুসলমানকে পৃথক করিয়া রাখিবার পক্ষপাতী। ইহার পর আর ভারতবর্ষে একটি যুক্ত-রাষ্ট্র গঠনের কথা নিরর্থক। যাহারা এক নেশন নয়, একটী যুক্ত-রাষ্ট্রের ভিতর যদি তাহারা বাস করিতে না চায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে দোষ দেওয়া কি যুক্তিসঙ্গত? মুসলমানেরা পাকিস্থান গড়িতে চাহিলে কোন্ যুক্তি দিয়া তাহাদিগকে ঠেকাইবে? এতদিন ভারতের জাতীয়তাবাদী দল এক নেশনের কথা বলিয়া আসিয়াছে। আজ যদি কতকগুলি গুণ্ডা প্রকৃতির লোকের ছুরিছোরার ভয়ে তাহারা অন্য কথা বলিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলেই তো জাতীয়তাবাদের পরাজয় স্বীকার করা হইল!

উত্তর পক্ষ বলেন—এই জাতীয়তাবাদের কথা বহুদিন হইতেই শুনিতে পাওয়া যাইতেছে বটে; কিন্তু ইহার স্বরূপ এ পর্য্যন্ত কেহ ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ইংরেজ যে এ দেশ শাসন করিতে আসিয়া নানাভাবে ভেদ নীতি চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইতিহাসে তাহার প্রচুর প্রমাণ বিদ্যমান। কিন্তু মুসলমানদের সম্বন্ধে তাঁহারা যেরূপ সাফল্যলাভ করিয়াছেন, সেরূপ সাফল্য যে আর কোনও ক্ষেত্রে লাভ করিতে পারেন নাই, তাহারও তো কারণ আছে! ইংরেজ আসিবার পূর্ব্বে এ দেশে Nationalism

উঠেন—এ সব যে সৃষ্টিছাড়া কথা। এ দেশে কি নেশন বলিয়া কিছুই নাই? সারা দেশটাকে কি তোমরা টুকরা টুকরা করিয়া একেবারে জাহান্নমে পাঠাইতে চাও?

উত্তর পক্ষ বলেন—অত চীৎকারের প্রয়োজন নাই, এবং সারা ভারতবর্ষ যদি এক নেশন না-ও হয় তাহা হইলে যে আমাদিগকে জাহান্নমে যাইতে হইবে তাহা মনে করিবারও কারণ নাই। এই দেশে এক কেন, বহু নেশনের বীজ উপ্ত হইয়া উঠিতেছে। নেশন শব্দটা ইউরোপে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, এখানে যদি সেই অর্থে ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, বিহার, উড়িষ্যা, হিন্দুস্থান, রাজস্থান, গুজরাত, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশগুলি এক একটি নেশনের বাসস্থান। বাংলায় ও পাঞ্জাবে একাধিক নেশনের বাস বলিলেও দোষ হয় না। কোন কোন প্রদেশের মুসলমানেরা যদি আপনাদিগকে পৃথক নেশন বলিয়া মনে করেন তাহা হইলেও তাহাতে আপত্তি করিবার কারণ নাই। তবে অপরের উপর অত্যাচার করিবার কাহারও অধিকার নাই—মুসলমানদেরও নাই। বিদেশীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা ও অন্যবিধ শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশগুলি মিলিয়া এক যুক্ত-রাষ্ট্র গঠন করিতে হইবে ভারতবর্ষে নেশনের সংখ্যা যতই হউক না, ইহার ভৌগোলিক একত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই ভারতীয় যুক্ত-রাষ্ট্রের অধীন থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসীরা যদি আপনাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন নেশন বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে তাহাতে আপত্তি করিবার অধিকার কাহারও নাই। বাংলার হিন্দু ও মুসলমান যদি আপনাদিগকে পৃথক্ নেশন মনে করিয়া বাংলায় দুইটি পৃথক প্রদেশ গঠন করেন, তো তাহাতে আওনাদ করিবার কোন কারণ নাই। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যদি আমরা মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি লইয়া এক বা একাধিক প্রদেশ গঠন করি, এবং অধিবাসীদিগকে হিন্দু হইতে পৃথক এক বা একাধিক নেশন বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে তাহারা যখন ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন পাকিস্থান গঠন করিতে চায়, তখন আমরা আপত্তি করি কেন? ইহার প্রধান কারণ—আত্মরক্ষার প্রয়োজন। বিদেশাগত তুর্ক বা আরবীর যে সমস্ত বংশধর এ দেশে বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে এখনও বিদেশীর সাহায্যে ভারতবর্ষকে আবার জয় করিয়া এখানে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুলতান মামুদের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত মুসলমান শাসকবর্গ যে ছলে বলে কৌশলে হিন্দুর অস্তিত্ব লোপ করিয়াছেন, ইতিহাসে তাহার বহু প্রমাণ আছে। আজ আর সে চেষ্টার পুনরাবৃত্তি করিবার সুবিধা তাহারা যাহাতে না পান, আত্মরক্ষার জন্য হিন্দুদিগকে সে ব্যবস্থা করিতেই হইবে। আজ এ ব্যবস্থা যদি মুসলমানেরা স্বেচ্ছায় মানিয়া লন, তো ভালই। আর তাহা না করিয়া যদি তাঁহারা ধর্ম্মপ্রচারের নামে হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে চান, তাহা হইলে মহাত্মাজীর অহিংসাময় যে হিন্দুদিগকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে, তাহা মনে হয় না।

গান্ধীজির লক্ষ্য

লীলাময় রায়

সব দেশেই একদল লোক কর্তৃত্ব করে, আরেক দল করে সমালোচনা। কর্তারা যদি সমালোচকদের সঙ্গে বনিয়ে চলে তো গোলমাল বাধে না। কিন্তু অনেক সময় উভয় দলের পিছনে থাকে বিপরীত স্বার্থ। স্বার্থের সঙ্গে স্বার্থের বনিবনা অত সহজ নয়। সেইজন্য সমালোচকরা ধীরে ধীরে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। উভয় পক্ষই বাহুবলের আশ্রয় নেয়। যে পক্ষ জেতে সে পক্ষ কর্তা হয়। বিদ্রোহীরা কর্তা হলে অপর পক্ষ করে সমালোচনা, এবং সুযোগ বুঝে পাল্টা বিদ্রোহ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদেশীরা উভয় পক্ষে বা এক পক্ষে যোগ দেয়। ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে ওঠে। ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ অঙ্কে বিদ্রোহের রূপ হয় বৈপ্লবিক। পাল্টা বিদ্রোহের রূপ হয় প্রতিবৈপ্লবিক। বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব বৈদেশিক হস্তক্ষেপের ফলে জটিল আকার ধরে। ক্রমশ পরিণত হয় গৃহযুদ্ধে, পরিশেষে আন্তর্জাতিক যুদ্ধে। আমাদেরই জীবনকালে এরকম ঘটতে দেখা গেল রুশদেশে। রুশদেশের প্রতিবিপ্লবীরা সব দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, সবদেশ বিপ্লবের ভয়ে প্রতিবিপ্লবীদের পক্ষ নিয়ে আরেক বার ঝাঁপিয়ে পড়বে। আন্তর্জাতিক যুদ্ধে প্রতিবিপ্লব ফ্রান্সের বেলা সফল হয়েছিল, রাশিয়ার বেলা যদি সফল হয় তো বিপ্লব শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হবে। বিপ্লব যাতে ব্যর্থ না হয় তার জন্যে একশো বছর আগে থেকে চিন্তা করে গেছেন মার্ক্‌স। ফরাসী বিপ্লব কেন ব্যর্থ হলো তা নিয়ে তাঁকে অনেক ভাবতে হয়েছিল। ভেবেচিন্তে তিনি এই বার করলেন যে বিপ্লবের পরে প্রতিবিপ্লব অবশ্যম্ভাবী, প্রতি-বিপ্লবের জন্যে প্রস্তুত হয়ে বিপ্লবে নামতে হয়, যারা প্রতি-বিপ্লবের জন্যে অপ্রস্তুত হ'যে বিপ্লবে নামে তারা আখেরে পরাজিত হয়। মার্ক্‌স্ তাঁর শিষ্যদেরকে মন্ত্র দেন দুই ভাবে প্রস্তুত হতে। তিনি স্বয়ং একখানি শাস্ত্র রচনা করলেন, সে শাস্ত্র বেদের মতো অভ্রান্ত। একদল ব্রাহ্মণও সৃষ্টি করলেন, এঁরা কমিউনিষ্ট। এঁদের যজমান হচ্ছে কারখানার মজদুর শ্রেণী। যজমানদের সংস্কার করা ও বেদ ব্রাহ্মণে বিশ্বাসবান করা হলো প্রথম কাজ। ইতিহাসের সঙ্কটক্ষণে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আত্মসাৎ করা হলো দ্বিতীয় কাজ। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলতে বোঝায় পুলিশ ও মিলিটারি। পুলিশ ও মিলিটারি হাতে এলে আর সব আপনি আসে। কারখানার সংখ্যা বাড়িয়ে মজদুরের সংখ্যা বহুগুণ বাড়ানো যায়। রুশদেশে এখন কোটি কোটি মজদুর, কোটি কোটি সৈনিক। এদের সংঘবদ্ধ করছে কমিউনিষ্ট পার্টি। কমিউনিষ্ট পার্টিকে ঠিক রেখেছে কার্ল মার্ক্‌সের শাস্ত্র, লেনিনের ভাষ্য, ষ্ট্যালিনের টীকা। সব অভ্রান্ত। দুনিয়ার সব দেশেই এখন এঁদের অনুচর আছে। সব দেশের কারখানার মজদুর এঁদের পক্ষপাতী। ভাবী যুদ্ধে যে সব দেশ রাশিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে সে সব দেশের মজদুর অশান্ত হবে। ভাবী যুদ্ধে রাশিয়াকে হারানো জার্মানী বা জাপানকে হারানোর মত সহজ হবে না। রুশ বিপ্লব ফরাসী বিপ্লবের মতো নাটকীয় ঘটনা নয়। এর পিছনে একশো বছর ধরে প্ল্যান করে প্রস্তুত হওয়া চলেছে। তা সত্ত্বেও যদি

মহারাজ রায়ের অট্টালিকা

মনোজ বসু

প্রথম অধ্যায়

শৈতৃক নাম নীলরতন। অব্যবহারে সে নাম সকলে ভুলে গেছে। বোধ করি নীলরতন নিজেও। কিন্তু মহারাজ রায়ের বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা কর—যে না সেই সঠিক নির্দেশ দিয়ে দেবে।

বাড়ি নয়, অট্টালিকা। সাকুল্যে তিনখানা ঘর—খোড়ো চাল, মাটির মেজে, ছেঁচা-বাঁশের বেড়া। কিন্তু নামকরণ হয়েছে মহারাজ রায়ের অট্টালিকা। খোড়ো ঘর ক'খানার জন্য নয় অবশ্য। সামনে একফালি ফাঁকা জমি—তাতে পাকা দালানের খিলান অবধি গাঁথা। দরজা-জানলা বসানো হয় নি—বসাবার জন্য ফাঁক রাখা আছে—ছুতার-মিস্ত্রি ডেকে মাপসই দরজা-জানলা গড়িয়ে বসালেই চলে। দোতলা বাড়ি তোলবার উপযোগী প্রশস্ত সুদৃঢ় ভিত। চল্লিশ বছর কেটে গেছে, অনেকবার অনেক আয়োজনে গাঁথনি ঐ খিলান অবধি উঠেছে। গাঁথনির খোলে আড়াই হাত আন্দাজ মাটি তুলে ভরাট করা—খোয়া পিটিয়ে সিমেণ্ট লেপে পাকা মেজে হবে। এখন প্রতি বর্ষাকালে কলাড জঙ্গলে ঢেকে যায় জায়গাটা, অগ্রহায়ণ মাসে জঙ্গল কেটে মাটি কুপিয়ে মহারাজ মুলো-পালঙের বীজ ছড়িয়ে দেন। ভাল মূলোর ফলন হয় তোলা-মাটির উপর।

লোকে হাসি মস্করা করে, বলে, কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল আর মহারাজের অট্টালিকায় ভিত এক তারিখে খোঁড়া শুরু হয়। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কবে সমাধা হয়ে গেছে, কিন্তু এ অট্টালিকা অত সোজা কাজ নয়—চল্লিশ বছরে খিলান অবধি হয়েছে, দোতলা হতে শ-দুই বছর তো লাগবেই।

কিন্তু মহারাজ দমেন নি। বাড়ি শেষ করবেনই। থেমে নেই তিনি। পাঁচ সাত বছর নিঃশব্দে আয়োজন চলে, তারপর একদিন দেখা যায় বাঁশ পুতে ভারা বেঁধে রাজমিস্ত্রিরা কাজে লেগেছে। কর্নিকে ইট কাটার শব্দ দূর থেকে শুনতে পাওয়া যায়। পাড়ার ছেলেমেয়েরা জুটে হাঁ করে দেখে। এর পর নতুন এক খেলা আরম্ভ হয়ে যায় ছেলেপুলের মধ্যে—দালান গাঁথার খেলা। সেই ভিত-পত্তনের আমলে যারা দালান গাঁথার খেলা খেলেছিল, তাদেরও চুল-দাড়ি পেকে যাবার মতো হয়েছে। তারা জিজ্ঞাসা করে, এবার কদ্দিন চালাবে মহারাজ দা?

ছাদ মেজে দেয়ালের পলস্তারা শেষ করে তবে মিস্ত্রিদের ছুটি। চিরকালটা ঐভাবে গেল, দুটো দিন স্থির হয়ে ঘর গৃহস্থালী করতে পারলাম না, গৃহ-প্রবেশের দিনটা তোমাদের দশজনকে ডেকেডুকে একটু আমোদ-স্ফূর্তি করব ঠিক করে রেখেছি।

তবু দিন পনের না যেতেই কর্নিকের আওয়াজ নীরব হল।

হল কি মহারাজ-দা?

ছোড়াটার ঘাড় ধরে নিয়ে জেলে ঢোকাল। কি করা যাবে? পুজি-পাটা নিয়ে ছুটতে হল কলকাতায়।

যে ছোকরার উল্লেখ করলেন সে আপন কেউ নয়—এই সহরের বাসিন্দা স্বর্গীয় হৃষিকেশ সরকারের ছেলে সত্যশিব। কলকাতায় পড়াশুনো করত, অসময়ে হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে চলে এল, ওয়ারেণ্ট ও পিছু পিছু তাড়া করে এল এদ্দূর অবধি। সত্যশিব তাঁকে কিছু বলে নি, ঘটনাটা কানে এলে কাউকে কিছু না জানিয়ে উপযাচক হয়ে তিনি ছুটেছিলেন। এ নিয়ে মহারাজকে অনেক গঞ্জনা সইতে হয়েছে সরযূর কাছে।

সরযূর উপস্থিতি কাছাকাছি কোথাও অনুমান করে মহারাজ প্রবোধ দিতে লাগলেন এক হিসাবে ভালই হল ভায়া। বর্ষা এসে গেছে, এখন একদিন কাজ হবে তো তিন দিন হবে না, মিছামিছি মিস্ত্রির মাইনে গণে যাওয়া। ভাদ্র মাস কেটে গেলে আবার লাগিয়ে দিচ্ছি। আর দেরি নয়, নির্ঘাৎ শেষ করব এবার।

বর্ষাটা বিষম প্রবল হল। সুরকি নয়—কাদার কাঁচা গাঁথনি। বৃষ্টির জলে ধুয়ে গিয়ে এক পাশের দেয়াল এক রাত্রে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। সম্প্রতি যা গাঁথা হয়েছে তাই শুধু নয়—সাবেক পুরাণো গাঁথনির ও অনেকটা ধ্বসে গেছে ঐ সঙ্গে। আবার গোড়া থেকে নতুন করে গেঁথে তুলতে হবে। মুশকিলের অন্ত নেই।

কি কুক্ষণে ভিত বসানো হয়েছিল, মুশকিল সেই থেকে একের পর এক চলছে। তখন আঠার উনিশ বছর বয়স, নীলরতন নাম বহাল আছে, স্নেহ করে সবাই নীলু বলে ডাকে। আজকে তিনি মহারাজ রায়, মাথায় স্বল্পাবশিষ্ট শনের মতো পাকা চুল, বলিরেখাঙ্কিত বীভৎস ভয়ানক মুখ, মুখের সমস্ত লালিত্য নিংড়ে শেষ করে ফেলেছে বয়স এবং সরকারি জেল। সস্নেহে নীলু বলে ডাকবার কেউ নেই এ জগতে, এখন তিনিই সকলের নাম ধরে ধরে ডাকেন, সবাই ছোট। এই সেদিন বয়সের হিসাব হচ্ছিল দত্ত-বাড়ির আড্ডায় বসে। এক কৈলাস কর্মকার মহারাজের চেয়ে বছর দুয়েকের বড়, কৈলাসকে বাদ দিলে মহারাজের বয়স স্ত্রী-পুরুষ সকলের চেয়ে বেশি এত বড় পাড়াটার মধ্যে।

সকালবেলা একটু আগেই সরযূর সঙ্গে খানিকটা বকাবকি হয়ে গেছে, অট্টালিকার ভিটেয় তিনি পেঁপের চারা পুঁতছিলেন বলে। মহারাজ হাঁ-হাঁ করে এসে পড়লেন, এটা কি হচ্ছে বলো তো? পেঁপে ফলতে এক বছর দু-বছর তো বটেই—তদ্দিনে ছাত উঠে যাবে, শান-বাঁধানো মেজে হবে এ জায়গায়।

সরযূ একনজর স্বামীর দিকে চেয়ে যেমন চারা পুঁতছিলেন, সাবধানে তেমনি পুঁতে চললেন।

মহারাজ বললেন, নিজের হাতে আর্জানো গাছ—কোটে ফেলবার সময় কষ্ট পাবে। ভাদ্র মাসের পর আমি কিন্তু দেরি করছিনে আর এবার।

সরযূ বললেন, ছাদে-মেজের কাজ নেই ভাঙা দেয়ালটা গেঁথে তোল দিকি এবছরের ভিতর। বোশেখে গৌরীর বিয়ে দেবোই, নারকেল-পাতায় ছেয়ে দিলে বেহারা-বাজনদার থাকতে পারবে এখানে। পেঁপে গাছ কেটে ফেলো, আমি তাতে রাগ করব না।

অর্থাৎ এই ধ্বসে-যাওয়া দেয়ালটুকুও সাত-আট মাসে গেঁথে তুলতে পারবেন না, সরযূর এই স্থির বিশ্বাস। বিষম অপমানিত বোধ করলেন মহারাজ। স্ত্রীর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, দালান কি আটকে থাকত? এমন দশটা দালান হয়ে যাবার কথা নয়? বলো, তুমিই বলো—

না—আটকে থাকবার কথা নয়। পাটের কারবার করে বাপ টাকাপয়সা রেখে গিয়েছিলেন, বত্রিশ বিঘে ধান-জমি বিক্রি করেও মোটা রকম হাতে এসেছিল। বাড়ি ছিল কালনার কাছাকাছি ছুতারহাটি নামক এক গ্রামে। বাপ চোখ বুজতে শরিকেরা উঠে পড়ে লাগল। একটা আম-চারার দখলি স্বত্ব নিয়ে মামলা-মোকর্দমায় খরচ হল একুনে সাড়ে বাইশ শ টাকা—ঐ আমগাছের আম চিরকাল ধরে বিক্রি করেও এ টাকার সিকির সিকি উঠে আসবার সম্ভাবনা নেই। আর সমস্ত হাঙ্গামা পোহাতে হত একলা মহামায়াকে। ছেলে আদা-ছোলা খেয়ে

কুস্তি লড়ে বেড়াত ওদিককার যত নাম-করা পালোয়ান তাদের সঙ্গে। লেখাপড়া কিছু করেছিল, কিন্তু বেশির ভাগ সময় শরীর চর্চা নিয়ে থাকত। এই ছেলে নিয়েই আরও আতঙ্ক হয়েছিল মহামায়ার। ধান-জমি সমস্ত বিক্রি করে দিলেন, ইদানীং এক চিটে ধানও পাচ্ছিলেন না। শরিকেরা ভাগ-চাষীদের বুঝিয়েছিল, বিধবা বেওয়া মানুষ আর অকর্মণ্য কাণ্ডজ্ঞানহীন ছেলে—কিচ্ছু এদের দেবার দরকার নেই। না দেবার প্রস্তাব সকলের কাছে মিষ্টি—চাষীরা সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়েছিল এ পরামর্শ। মহামায়া এ সম্পর্কেও নীলরতনের কাছে উচ্চবাচ্য করেন নি, বরঞ্চ তার কাছে ফলাও হয়ে কথাটা প্রকাশ না পায়, এ নিয়ে তাঁর সতর্কতার অন্ত ছিল না। জানতে পারলে হয়তো এক অঘটন ঘটিয়ে বসবে; সদর-আদালত অবধি যাবার সবুর সইবে না, ছুতারহাটির বাঁধের উপর একরকম বিচার-নিষ্পত্তি করে ফেলবে। তখন সদরে দৌড়তে হবে বিপক্ষ দলেরই।

ইতিমধ্যে দাদার চিঠি পেয়ে মহামায়া অকূল-সমুদ্রে কিনারা দেখতে পেলেন। কালীনাথ এই শহরের কালেক্টরি অফিসে চাকরি করতেন। তিনি লিখলেন, আপনজনেরা শত্রুতা করছে—মাটির মায়ায় অমন জায়গায় পড়ে থেকে লাভ কি বোন? সমস্ত বেচে দিয়ে চলে এসো। এখানে ঘরবাড়ি বানিয়ে দেব, শান্তিতে থাকবে। জিনিষপত্র খুব সস্তা এখানে। নিলামে সস্তায় গাঁতিপটি কিনে দেবো, তাই ভাঙিয়ে চুরিয়ে পায়ের উপর পা দিয়ে বসে তোমার একটা ছেলের জীবন কেটে যাবে।

যে দাম পেলেন তাতেই মহামায়া ধান-জমি বিক্রি করে দিলেন। বসতবাড়ি বিক্রি করতে মায়া হল। শরিকেরা হাসাহাসি করবে, সে-ও একটা কারণ বটে। ভায়ের কাছে গিয়ে কিছুদিন থাকবেন, এমনি ভাবে একদিন পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে ছেলের হাত ধরে গরুর গাড়িতে উঠে বসলেন। আসল উদ্দেশ্য কাউকে বললেন না। নীলরতনও জানে না, পৈতৃক বাস্তুভিটা ছেড়ে নদীখালে-ভরা ভাঁটির দেশ কায়েমি বসবাস করতে যাচ্ছে।

কালীনাথ বাজে কথা লেখেন নি। ছ-মাসের ভিতর বাকি কবের দরুণ লাটবন্দি এক ছিটে তালুক কিনে দিলেন। আরও দিতেন। কিন্তু পায়ের উপর পা রেখে জীবন কাটানো অদৃষ্টে নেই যে নীলরতনের। সাড়ে চার বিঘার উপর বসতবাড়ি—এ জমিও কালীনাথ সুকৌশলে খরিদ করে দিয়েছিলেন মাত্র শ আষ্টেক টাকায়। শহরের উপর এতটা জমি—কত সস্তাগণ্ডার বাজার ছিল হিসেব করে দেখ! চল্লিশ বছর আগে শহর অবশ্য ছিল শুধু নামেই—দুটো পাকা রাস্তা, সবসুদ্ধ গোটা বারো কেরোসিনের আলো জ্বলত রাস্তায়—শুক্লপক্ষে নয়, কৃষ্ণপক্ষে সন্ধ্যা থেকে তিনঘণ্টা মাত্র। আজকের এত বাড়ি গাড়ি পিচ-দেওয়া রাস্তা বিদ্যুতের আলোর সমারোহের ভিতর সে চেহারা কিছুতে তোমাদের আন্দাজে আসবে না। কিন্তু চেহারা যত সামান্যই হোক, আভিজাত্য ছিল—দু-দুটো লালমুখ খাঁটি সাহেব এহেন জায়গায়—কালেক্টর মার্টিন সাহেব আর পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হ্যামিল্টন সাহেব।

ভায়ের আশ্রয় ত্যাগ করে মহামায়া নিজের বাড়ি এসে উঠলেন। আপাতত কয়েকটা খোড়োঘর বেঁধে নিলেন। সেই ঘর কখানাই ছাউনি বদলে, খুঁটি বদলে, বেড়া বদলে চাল বদলে চল্লিশ বছর ধরে ভিটের উপর আজও খাড়া রয়েছে। পুকুর কাটা হল পিছনদিককার বাঁশঝাড় কেটে ফেলে। দুইরকম উদ্দেশ্য—পুকুরের জল খাওয়া ও পোনা ফেলে মাছ তৈরি করা যাবে। আর পুকুরের যে মাটি উঠল তাই দিয়ে ইট তৈরি হবে পাকা দালানের জন্য। মস্তবড় এক পাঁজা সাজানো হল, পাঁজা পুড়লো ভালই। কোন দিকে কোন রকম অসুবিধা ঘটেনি তখন পর্যন্ত। পাঁচ-ছটা তেঁতুলগাছ লেগেছিল পাঁজা পোড়াতে। হৃষিকেশ সরকারের জমিতে বহু পুরাণো প্রকাণ্ড এক গাছ ছিল—কালীনাথের মধ্যবর্তিতায় হৃষিকেশকে একরকম কায়দায় ফেলে সে গাছটাও কেটে আনা হল। সে এক ভিন্ন কাহিনী। পরবর্তী কালে

মহামায়ার অনেক সময় মনে হয়েছে, হৃষিকেশ কি সেই রাগের শোধ নিয়েছে এমন করে? পাঁজার ইটে ঘর তৈরি কিছুতে সমাধা করতে দিল না।

শুভক্ষণ দেখে ভিত খোঁড়া হল, কালীনাথ পাঁজি দেখে দিনস্থির করে দিলেন। পূজা অর্চনা হল, পট্টবস্ত্র পরে হাসতে হাসতে মহামায়া পঞ্চরত্ন পুঁতে দিলেন ভিতের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। এরফান খাঁ মিস্ত্রি ইট বসাল। সে এরফান বুড়ো থুথ্‌ড়ো হয়ে করে কবরের তলে গিয়েছে।

খান চারেক ইট মাত্র গাঁথা হয়েছিল সেবার। ভিতের জন্য কাটা নালা বর্ষার জলে ডুবে থাকত, কোলাব্যাং ডাকত গ্যাঙর-গ্যাঙর করে, আকন্দ আর উলুঘাসে আচ্ছন্ন হয়ে থাকত নালার চারি পাশ। এরফান মাঝে মাঝে এসে তাগিদ দিত ইদিকে কাজ চালালে হত মা-ঠাকরুণ। সবই গোছানো গাছানো।

মহামায়ার মুখ বিষণ্ণ হয়ে উঠত বলতেন, হবে বই কি মিস্ত্রিরি। নীলু আমার ভাল হয়ে উঠুক।

সুরকি ভাঙিয়ে গাদা দেওয়া ছিল, বছরের পর বছর বৃষ্টিতে ধুয়ে কাদার গোলা এসে মিশে জঙ্গল উঠে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কোনখানে ছিল জায়গাটাই এখন খুঁজে পাওয়া দায়, আর খুঁজে পেলেও ঐ সুরকিতে এখন কাজ হবে না কিছু। চুণও জমা আছে—দীর্ঘকাল পড়ে থেকে মাটির বর্ণ হয়ে গেছে। পশ্চিম পোতার ঘরের দাওয়ায় এক তক্তাপোশ পাতা আছে মানুষজন উঠা-বসা করে—তারই নিচে সেই চুণ। কাপড়-চোপড় ক্ষারে সিদ্ধ করবার সময় পাড়ার বউ-ঝিরা ঐ চুণ মুঠো মুঠো নিয়ে ক্ষারের সঙ্গে মিশিয়ে দিত। এখন আর কেউ নিতে আসে না। কেবল রং নয়—চুণও মাটির সমান হয়ে গেছে। ও-চুণে একদম রাগ নেই।

ভিত বসানোর দিন দশেক পরে সন্ধ্যার কিছু আগে একদিন নীলরতনকে প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় ধরাধরি করে নিয়ে এল। কর্ণিক ফেলে এরফান খাঁ উঠে এল, আর যারা জোগাড় দিচ্ছিল সকলে এল। আরও খানিক পরে কর্ণিক হাতে নিয়ে নিঃশব্দে এরফান বিদায় হয়ে গেল, এ বাড়িতে আর তাকে কর্ণিক ধরতে হয়নি।

অনেক ঝাপসা স্মৃতি। একদা এই জীবনে ঘটেছিল বলে সন্দেহ হয় মহারাজের নিজেরও।

কে বিশ্বাস করবে বলো—টাক ছিল না তাঁর মাথায়, কপালের উপর কুশ্রী ঐ কালো দাগটা ছিল না, আঁটো-সাঁটো মজবুত গড়নের চেহারা ছিল আর বয়স ছিল আঠার-উনিশ।

বাংলা দেশকে কেটে নাকি দু-টুকরো করছে। 'হিতবাদী' কাগজের মারফতে খবরটা পৌছল। চুলোয় যাক। করছে, তা কি করা যাবে বলো? ওদের রাজ্য—শাসনের সুবিধার জন্য দুটো কেন দশটা ভাগে খণ্ডবিখণ্ড করুকগে না। যার পাঁঠা সে যদি লেজে কাটে। খবরের কাগজেই পড়ল খবরটা, তারপর যথারীতি সকলে নাইতে খেতে ঘুমুতে গেল। উকিলদের লাইব্রেরি-ঘরে আলোচনা গভীরতর পথে চলে, ঐ যে বলেছে শাসনের সুবিধার জন্য—ওটা ধাপ্পা, ভিতরে গূঢ় মতলব আছে। বাংলা দেশেই প্রথম ওরা চেপে বসে, সাম্রাজ্য সারা ভারতে ছড়িয়ে যায় এখান থেকে। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে বাঙালি ক্রমশ জোট বাঁধছে। ক্ষীণদেহ তীক্ষ্ণধী এই মানুষগুলো আজকে যা ভাবছে, আগামী কাল তাই হবে সমস্ত ভারতবর্ষের ভাবনা। প্রবীণ ভারতের নিয়ামক হল সেকালের অনার্যভূমি নিতান্ত অর্বাচীন এই বাংলাদেশ।' এর প্রাণশক্তি বিচূর্ণ করবার জন্য জনবুল বঙ্গভঙ্গের এই ষড়যন্ত্র করেছে। দুটো টুকরা দুটি ভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে জুড়ে দেবে, অখণ্ড বঙ্গ-সংস্কৃতি দুর্বল হয়ে অন্য প্রাদেশিক সংস্কৃতির সঙ্গে মিলেমিশে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ক্রমশ।

এমনি সব আলোচনা হত উকিল-মোক্তারদের লাইব্রেরিতে। আরও খবরাখবর আসে—তাজ্জব খবর। দেশের মানুষ চুপচাপ মেনে নেয়নি এ ব্যবস্থা। প্রতিবাদ

নিমাই বড় বড় চোখ মেলে সরযূর দিকে তাকিয়ে থাকে। কথার মর্ম বুঝতে পারছে না এমনি ভাব।

সরযূ বলে, বাবা ক্ষেপে আছেন। ধরলে তোমায় আস্ত রাখবেন না।

নিশ্চিন্ত ঔদাস্যে নিমাই বলল, ধরতে পারলে তো! তুমি চেঁচিও না। এখুনি আমি চলে যাচ্ছি। শোন—

কাছে এসে সে সরযূর একখানা হাত টেনে নিল। বলে, তোমার হাতে রাখি পরাতে এসেছি দিদি। আমাদের বাড়ী কেউ তো আসবে না।

বড্ড আস্পর্ধা হয়েছে তোমার—উঁ?

কিন্তু সরযূর রাগে নিমাই ভয় খায় না, টিপিটিপি হাসে, ধীরে ধীরে হাতে রাখি পরিয়ে দেয়। সরযূ সভয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে কেউ দেখে না ফেলে।

তারপর আদেশের সুরে বলল, বোস, ভাত বেড়ে দিচ্ছি। খাসনি তো কিছু সকাল থেকে?

নিমাই অবাক হয়ে বলে, খাব আবার কি। আজকে অরন্ধন। এই দেখ, কিন্তু তোমার খেয়াল যাবে না দিদি।

সরযূ মনে মনে অপ্রতিভ হল। সত্যিই তো, একেবারে খেয়াল নেই। থাকবে কি করে? বাপ ষোড়শোপচারে আহারপর্ব্ব সমাধা করে উপরের ঘরে নাসাগর্জন করছেন,—বিকালেও ছুটোছুটি আছে, তার জন্য বলসঞ্চয় করে নিচ্ছেন। এ সংসারে কি মনে থাকে আর দশজনে কি করছে আজকের দিনে? সকল মানুষ থেকে আলাদা যে ওরা।

সরযূ স্নেহকণ্ঠে বলল, না খেয়ে রোদে রোদে ঘুরিসনে আর। বোস। বাবা আজ দেরি করে এসেছেন, ঘুম থেকে উঠবার দেরি আছে। সবরি কলা আছে, খেয়ে নে গোটাকতক। আর ডাব কেটে খা। খেয়ে জিরিয়ে নে একটুখানি।

নিমাই বলে, ওরে বাসরে। কত কাজ থবর রাখ?

কাজকর্ম তো চুকে গেছে, আবার কি?

মস্ত সভা হবে যে বিকালে কাছারিখোলায়। খবর রাখা না? কলাগাছ কেটে নিয়ে যেতে হবে চৌধুরিবাগান থেকে, গেট হবে। আমার উপর ভার।

সরযূ বলে, সভা হবে না।

নিমাই সবিস্ময়ে তাকাল। হবে না? কেন?

নতুন আইন হয়েছে বাবা বলছিলেন। সেই আইনে সভা বন্ধ। বন্দেমাতরম্ বলাও এখন বেআইনি। ঢোল পিটিয়ে সহরময় শুনিয়ে দিয়ে গেছে। তুই শুনিস নি?

আর আমি বসতে পারব না দিদি। ছেড়ে দাও—

নিমাই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটল উদ্যোক্তাদের খবর জানাতে। গিয়ে দেখল, পরামর্শ হচ্ছে তাঁদের মধ্যে, সকলেরই কানে গিয়েছে। সভা হবে না সাব্যস্ত হল কিন্তু মিছিল বেরুবে। বন্দেমাতরম্ বলতে দেবে না—অচল সংখ্যাতীত প্রস্তরখণ্ডের মত দৃঢ়-নিষ্ঠ জনতা নিঃশব্দে এগোবে। বিলাতি জিনিষপত্র যে পারে সংগ্রহ করে নেবে, সভাক্ষেত্রে বটতলায় থাকবে বিরাট অগ্নিকুণ্ড। সকলে দলে দলে গিয়ে বিলাতী জিনিষ আগুনে ফেলবে, আগুনে পোড়ানো হবে আমাদের কাপুরুষতা। একটি কথাও উচ্চারণ না করে আমাদের সবচেয়ে অমোঘ মন্ত্র বিলাতি শোষকদের উপর নিক্ষেপ করব এমনি ভাবে।

মিছিল যাচ্ছে। শহরের সবচেয়ে চওড়া রাস্তাটা নর-মুণ্ডে ভরে গেছে। সবাই শহরের লোক নয়—অনেকদিন থেকে ঢাক পেটানো হচ্ছে এই সভার ব্যাপার নিয়ে, বাইরে থেকেও অনেক লোক আসছে এই সভা দেখতে। গরুর গাড়ি করে গ্রামের মেয়ে-ছেলে অবধি আসছে। সভা হবেনা শুনে আশা ভঙ্গ হয়েছে, রাগও হয়েছে কর্তৃপক্ষের উপর—রাশে রাশে চলেছে বিলাতী জিনিষ, পুড়িয়ে খানিকটা শোধ নেবে। এক চাষীর পরণে ছিল বিলাতী কাপড়, গামছা পরে সে কাপড়খানা খুলে হাতে নিয়েছে আগুনে দেবে বলে। খুব বড় এক নিশান মিছিলের আগে—লাল শালুর উপর তুলোর বড় বড় অক্ষরে লেখা—বন্দেমাতরম্। ছোট বড় আরও অনেক নিশান মানুষের মাথা ছাড়িয়ে প্রজাপতির মত বাতাসে পত পত করে

উড়ছে। কাগজে বন্দেমাতরম্ লিখে অনেকে বুকের জামায় এঁটে দিয়েছে।

তিন দিক থেকে তিনটে রাস্তা বাজারখোলায় পৌঁচেছে। রাস্তার দু-পাশে পগার। পগারের ওধারে লাল ভেরেণ্ডা ও জিওলের কচা পুতে গেতের বেড়া আছে। তিনটে পথের মুখ। আটকে আছে পুলিশ। হ্যামিল্টন সাহেব নিজে উপস্থিত আছেন। বজ্রগর্জন ওঠে, হল্ট।

হৃষিকেশ এগিয়ে গেলেন হ্যামিল্টনের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে।

এ সমস্ত কি? নিরর্থক জনতাকে উত্তেজিত করা হচ্ছে। সভা হলে সেই সময় গ্রেপ্তার কোরো আর দেখতে পাচ্ছ, বন্দেমাতরমও কেউ বলছে না।

হ্যামিল্টন বললেন, বুকের উপর নিখে এসেছে ঐ যে।

বুকের ভিতরেও লেখা আছে সাহেব, সেটা চোখে দেখতে পাচ্ছ না বন্দেমাতরম্ নিশ্চিহ্ন হবে না, যত আইনই করো।

পুবের দিককার পথে বিষম গণ্ডগোল এমনি সময় প্রবল বন্দেমাতরম্ ধ্বনি। পতাকা কাড়তে গিয়েছে কতকগুলো পুলিশ। কিছুতে দেবে না—প্রাণ থাকতে দেবে না। কাড়াকাড়ি করতে ধাক্কা দিয়ে সামনের একজনকে ফেলে দিয়েছে পগারের মধ্যে। পতাকা তার হাত থেকে লুফে নিয়েছে আর একজন। সঙ্গে সঙ্গে বিশৃঙ্খল হল জনতা—তিন পথের সর্বত্র গর্জন উঠছে বন্দেমাতরম্। পুলিশ সামলাতে পারছে না, জনসমুদ্র আছড়ে পড়ছে বেষ্টনীর উপর, বাজারখোলায় সভাক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছবেই।

লাঠি পড়ছে নীলরতনের গায়ে মাথায়। লাঠির পর লাঠি। পতাকা সে দৃঢ় হাতে ধরে আছে। টানাটানি করছে পতাকার দণ্ড ধরে। তখন দু-হাতে সে বুকে চেপে ধরল। টলতে টলতে একটু এগিয়ে আমগাছের গুঁড়িতে ঠেশ দিয়ে সে দাঁড়াল। হৃষিকেশ ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকছেন, আমার হাতে ছেড়ে দে ভাই বিশ্বাস করে। আমি অপমান হতে দেবো না পতাকার। চোখ বুজে স্থির হয়ে আছে নীলরতন, কানেই শুনছে না হয় তো। আবার লাঠি। গড়িয়ে পড়ল সে মাটিতে। হৃষিকেশ ছুটে এসে পতাকা ধরলেন, শ্লথ মুষ্টি থেকে নিয়ে নিলেন নিজের হাতে।

লোকের শব্দ পাওয়া যায় সরযূ উপরের জানালা দিয়ে উঁকি দেয়। দেখে সে অবাক। নীলরতনকে তাদের রোয়াকে এনে তুলেছে। কিছুতে রক্ত বন্ধ হচ্ছে না, ধারা বয়ে যাচ্ছে রোয়াকের উপর দিয়ে রক্ত দেখে তার মাথা ঘুরে উঠল। অত লোকের মধ্যে নিচে অবধি যাবার সামর্থ্য নেই। জানালায় ঘন ঘন পথের দিকে তাকাচ্ছে, বাপ এসে পড়বার আগে এরা বিদায় হয়ে গেলে বাঁচে। নইলে রাগের মাথায় তিনি কি বলে বসবেন, উঠানের উপর এক কাণ্ড বেধে যাবে।

ইতিমধ্যে স্থানীয় ডাক্তারও একজন এসে গেছে। সরযূর শাড়ি ঝুলছিল ঘাড়ের উপর—মুখের কথাটাও কেউ জিজ্ঞাসা করল না। এক ছোকরা ফড়-ফড় করে শাড়িটা ছিঁড়ে ফেলল। ছেঁড়া শাড়ি দিয়ে পাগড়ির মতো নীলরতনের মাথায় প্রকাণ্ড ব্যাণ্ডেজ বেঁধেছে। রক্ত বন্ধ হল অবশেষে।

যে ভয় হচ্ছিল—দেবচরণ এসে পড়লেন। ক্ষণকাল থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন, চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না।

এখানে এনে তুলেছ কেন?

হৃষিকেশ বললেন, এক্ষুনি নিয়ে যাচ্ছি। বাড়ির কাছাকাছি পেরে গেলাম। ভয় নেই রক্তের দাগও রেখে যাবো না আপনার বাড়িতে। ছেলেরা ধুয়ে মুছে দিয়ে যাবে।

বাপকে দেখে সরযূ চুপচাপ সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, আমার নতুন শাড়িটা ছিঁড়ে মাথায় জড়িয়ে দিয়েছে বাবা।

হৃষিকেশ করজোড়ে সামনে এলেন।

ত সত্যি। অনেক বিব্রত করা হয়েচে এতক্ষণ ধরে কিন্তু ছেলেটার অবস্থা দেখুন। দারোগা হোন, যা হোন—দেশের মানুষ তো। এটুকু মাপ করে নিন আপনারা।

ক্রমশঃ

স্বাধীনতার সাগর-সঙ্গমে

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

এতদিন সমস্যার বিষয় ছিল ইংরেজকে দেশ থেকে তাড়িয়ে স্বাধীনতা পতিষ্ঠা করা যাবে কি করে। আজ আর তা সমস্যা নয়। ইংরেজ বলেচে চলে যাবে। কবে যাবে তাও বলেচে। তার রাজ-প্রতিনিধি এ-দেশে পা দিয়েই জানিয়েচেন ধুলো পায়েই তিনি বিদেয় নেবেন। তিনি ভারতবর্ষে ইংরেজের শেষ রাজ-প্রতিনিধি। তারা চলে গেলে আমাদের কি অবস্থা দাঁড়াবে? রবীন্দ্রনাথ দেহরক্ষার কিছুদিন পূর্ব্বে লিখেছিলেন, ভাগ্যচক্রের বিবর্তনে একদিন ইংরেজকে এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবেই। কিন্তু সেদিন ইংরেজ যদি এদেশকে একেবারে তখনকার এই লক্ষীছাড়া অনাসৃষ্টির মাঝে ফেলে রেখে যায়, তাহলে তা তার পক্ষে অপরিসীম লজ্জার বিষয় হয়ে থাকবে। এ কথা তিনি বলেছিলেন ইংরেজের তখনকার রীতি গতি দেখে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে। যে লক্ষীছাড়া দুর্দশা দেখে তিনি ব্যথা পেয়েছিলেন, বিরক্ত হয়েছিলেন, ইংরেজের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছিলেন, আজ তার নগ্ন কদর্য্যতা আরো দুঃসহ হয়ে উঠেচে। আজ চলে যাবার সংকল্প প্রকাশ করবার সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও অনাবশ্যক জোরের সঙ্গে সে বলচে, আগামী পনেরো মাসের মাঝে যদি তোমরা তোমাদের ঝগড়া-ঝাটি মিটিয়ে ফেলতে না পারো, তাহলে আমরা যার হাতে খুসি ক্ষমতা হস্তান্তর করে সাগরে পাড়ি জমাবো। রবীন্দ্রনাথ এই আশঙ্কাই করেছিলেন। তিনি মনে করতেন এমন কথা ইংরেজ যদি বলে, বুঝতে হবে সত্যি সত্যিই সে ছোট হয়ে গেছে। যে দ্বন্দ্ব সে নিজে সৃষ্টি করেচে তার নিজেরই স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে সে দ্বন্দ্বের ফয়সালা করবার দায়িত্বও তার। যদি তাই করে সে যেতে পারে, তাহলে তার চলে যাওয়া তার গৌরব ঘোষণা করবে। আর কর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে নিজের গরজে রাজপাট গুটিয়ে সে যদি জাহাজ ভাসায়, তাহলে তা হবে তার অগৌরবের বিষয়।

কথা-বার্ত্তা শুনে এখনো মনে হচ্ছে আমাদের একেবারে ডুবিয়ে দিয়ে চলে যাবার ইচ্ছে ইংরেজের নেই। তার স্বদেশের রাষ্ট্র-নায়করা যে-কোন কারণেই হোক্ আজ মনে করচেন স্বাধীন ভারত যদি ঐক্যবদ্ধ এবং সমৃদ্ধ থাকে, তাহলে সাম্রাজ্য ত্যাগ করবার ক্ষতি তাদের পূর্ণ হবে। আমরা, ভারতবাসীরা, ইংরেজের দেওয়া অনেক আঘাত খেয়েও আজও সহজভাবেই ভাবতে পারছি স্বাধীন হবার পর ইংরেজের সংস্রব রাখা অথবা প্রীতির সম্বন্ধ রাখা আমাদের পক্ষে ক্ষতির কারণ হবে না।

ইংরেজ যে নতুন দৃষ্টির অধিকারী হয়ে ভারতবর্ষ থেকে সাম্রাজ্যজাল গুটিয়ে নিচ্ছে, সেই দৃষ্টি যতটা আন্-বৃটিশ, ততটাই ভারতীয়। বিজিত মানুষের জন্মগত অধিকার হরণ ব্রিটিশ কখনো নিন্দনীয় মনে করেনি। ভারতবর্ষ তা চিরদিনই নিন্দনীয় মনে করেচে। দিগ্বিজয় বলতে ভারতবর্ষ কোনদিনই কারো জন্মগত অধিকার হরণ বোঝেনি। ব্রিটিশ বিদেশে অভিযান চালিয়েচে শোষণ

করবার প্রবৃত্তি নিয়ে, কিন্তু ভারতবর্ষ অভিযান করেচে তার সম্পদ বিলিয়ে দেবার জন্যে। সে সম্পদ শুধু অধ্যাত্ম-বাদ নয়, তার জ্ঞান, তার বিজ্ঞান, তার শিল্প, তার অনুপম কালচার। এই সব নিয়েই ভারতবর্ষ বিদেশে গিয়েচে এবং সেই সব দেশের মানুষকে বন্ধুজ্ঞানে বুক দিতে চেয়েচে। আজ যদি ইংরেজ সত্যি সত্যিই বুঝে থাকে শাসন ও শোষণের প্রবৃত্তিকে দমন করতে না পারলে তার কল্যাণ নেই, আর তাই বুঝে ভারতবর্ষকে পরবশতা থেকে মুক্তি দিয়ে সে যদি স্বাধীন ভারতের মৈত্রী কামনা করে, তাহলে স্বাধীন ভারত কেন তা প্রত্যাখ্যান করবে? মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনই ত ভারতের মিশন।

এই কথাটা প্রতি ভারতবাসীকেই সত্য বলে জানতে হবে এবং মানতেও হবে যে পৌনে দুইশত বছর ইংরেজের অধীনে থেকে নানা প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ভারতবর্ষ তার আত্মাকে হারায়নি। হারানো স্বাধীনতা সে আজ ফিরে পাচ্ছে বলে তাকে যে এখন হামাগুড়ি দিতে চলতে হবে অথবা পদে পদে আছাড় খেতে হবে, এমন কথা মনে করবার কোন কারণ নেই। স্বাধীন ভারত সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারবে, এবং স্থির পদবিক্ষেপে চলতেও পারবে।

(২)

ভারতবর্ষের ভবিষ্যত সম্বন্ধে যারা একদম হতাশ নন, তাঁরাও কিন্তু বাংলা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়েচেন। তাঁরা বলেন যে বাংলা এতদিন ভারতের নেতৃত্ব করেচে, সেই বাংলায় আজ তেমন কোন নেতা নেই। তাঁরা বলেন বাংলায় এত বেশী বাদবিতর্ক, এত অধিক দলাদলি যে, বাংলা ঠিক পথের সন্ধানও পাবে না, ঠিক পথ দেখিয়ে দিলেও একসাথে চলতে পারবে না। যাঁরা এসব কথা বলেন, তাঁদের মাঝে অ-বাঙালীও আছেন বাঙালীও আছেন। তাঁদের কথা শুনে মনে হয় বাংলাকে তাঁরা ভারতের অনূঢ়া কন্যার মতোই গলগ্রহ মনে করেন। কিন্তু তাঁরা একটিবারও ভেবে দেখেন না, যে নেতৃত্ব বাংলা দিয়ে রেখেচে, তাকে অতিক্রম করে নেতৃত্ব দেবার মতো নেতা নিখিল ভারতে আজও দেখা দেননি। এমনকি মহাত্মাজীও বাংলার সেই নেতৃত্বকে অতিক্রম করতে পারেন নি। যে নেতৃত্ব পরমহংসদেব দিয়েচেন, যে নেতৃত্ব বিবেকানন্দ দিয়েচেন, রামমোহন দিয়েচেন, কেশবসেন দিয়েচেন, যে নেতৃত্ব শ্রীঅরবিন্দ দিয়েচেন, রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু দিয়েচেন, রাসবিহারী সুভাষচন্দ্র দিয়েচেন, নিখিল ভারতকে স্বাধীন হবার পরও তাই নিয়ে কাজ করতে হবে। ভারতকে বড় করবার অন্য পথ নেই বাদ-বিতর্ক বাংলায় বেশী হবেই। কেননা বাংলাই ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িকের দেশ। বিচার না করে কোন কিছুই সে গ্রহণ করে না। কিন্তু তাই বলে সে মিঃ জিন্নার মতো 'হিমরুও নৈয়ায়িক' নয়। বিচারের দ্বারা সে সত্যে উপনীত হতে চায় এবং সত্যের সন্ধান পেলে ন্যায়ের পুথি ফেলে দিয়ে সে সত্য-সিন্ধুতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দৃষ্টান্ত শ্রীচৈতন্যদেব। বাঙালীর বিচার নেতি নেতি করে মায়াবাদে উপনীত হয় না, রক্তমাংসের মানুষে ভগবানের প্রকাশ দেখে। বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে প্রতিপক্ষকে সে অগ্রাহ্য করে না। সে একটা সিনথেসিস খোঁজে। শাক্ত ও বৈষ্ণবের মাঝে সে একই শক্তির বিকাশ দেখে। তাই সে কালীপুজোও করে, আবার শালগ্রামশিলাকেও গৃহ-বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠা দেয়। বাঙালী ঋষি মাতৃভূমিকে মা বলে বন্দনা করবার জন্য আনন্দমঠ রচনার উদ্দেশ্যে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী সন্তানের হাতে অস্ত্র তুলে দেন, আবার সর্ব্বত্যাগী শস্ত্রপাণি বাঙালী বিপ্লবী সেই মায়েরই বন্দনা করবার জন্য অহিংস সংগ্রামের পুরোভাগে দাঁড়ায়। কোনটাই বাঙালী ভুল করে করে না। তার ভিতরে যে সিনথেসিস সন্ধানের প্রবৃত্তি রয়েচে, তারই প্রেরণায় করে। এই প্রবৃত্তির অধিকারী সে হয়েচে তার জল-মাটির, তার প্রাকৃতিক পরিবেশের এবং তার বিচিত্র ইতিহাসের নানা বিস্ময়কর বিবর্ত্তনের, তার বিপুল অভিজ্ঞতার লব্ধ কালচারের প্রসাদে।

অতি নিকট ভবিষ্যতে তাকে অতি অসহায়ের মতো পথে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। আর না হয় কমলা, তেল সংগ্রহের জন্য নখরকে তীক্ষ্ণ করে তাকে দিকে দিকে থাবা বাড়াতে হবে। চল্লিশ কোটি লোকের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং ইউরোপীয় মানদণ্ডে বাড়াতে হলে যে বিপুল অর্থের আবশ্যক তার যোগান দিতে হলে জাতীয় আয় আমেরিকার চারগুণ হওয়া দরকার। সে আয় করতে হলে সারা পৃথিবী শোষণ করবার মত শক্তির অধিকারী হতে হয়। কিন্তু বাঙালী জানে খড়ো ঘরে তার স্বাস্থ্য রক্ষা হবে, তাঁতের কাপড়ে তার লজ্জা নিবারণ হবে, সহজ লভ্য আসবাবে তৈজসে তার প্রয়োজন পূর্ণ হবে। কি হবে তার প্রাসাদোপম বাড়ী তৈরি করে, যে বাড়ীর মতো বাড়ী সকলে তৈরী করতে পারবে না? কি হবে তার সেই সুখাদ্যের দিকে লোভ প্রকাশ করে যা সকলের পাতে পরিবেশন করা যাবে না? বহুকে গৃহহীন করে একটি প্রাসাদ রচনা করা যায় না, বহুকে নগ্ন না রেখে দশ কয়েক লোকের বসন-বৈচিত্র্যের ব্যবস্থা করা যায় না। বাঙালী এই বহুর কথাই বড় করে দেখেচে।

(৫)

শিক্ষা ও সংস্কৃতিকেও বাঙালী সার্বজনীন করবার চেষ্টা করেচে গানের ভিতর দিয়ে, যাত্রার ভিতর দিয়ে, কীর্ত্তনের ভিতর দিয়ে, কথকতার ভিতর দিয়ে এবং আরো নানা রকম বাহন তৈরি করে তারই ভিতর দিয়ে। আজ দেখা যাচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ধর্ম্মঘট করেচেন। গবর্ণমেণ্ট বলচেন, তাঁদের অভাব দূর করবার মতো অর্থব্যয় করবার সঙ্গতি গবর্ণমেণ্টের নেই। মনে রাখা দরকার যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রচেষ্টায় শতকরা দশটি লোকও বর্ণজ্ঞানসম্পন্ন হয়নি। দেশের সকল লোককে বর্ণজ্ঞানসম্পন্ন করতে হলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা আরো দশ বারো গুণ বৃদ্ধি করতে হবে। শিক্ষকের সংখ্যাও সেই পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। গবর্ণমেণ্ট এখনকার শিক্ষকদের অভাব পূর্ণ করতে পারচেন না। সমস্ত লোককে বর্ণজ্ঞানসম্পন্ন করতে হলে যত শিক্ষকের যত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দরকার হবে, তার ব্যয়ভার বহন করবেন কেমন করে? বলা হবে, দেশ স্বাধীন হলে দেশের লোকের আয় বাড়বে এবং দেশের লোকের আয় বাড়লে রাষ্ট্রেরও আয় বাড়বে। দেশের লোকের আয় বাড়াতে হলে ইউরোপ যে-পথে চলে দেউলে হয়েচে, সেই পথেই এগুতে হবে। তার পরিণতি ত দেখাই যাচ্ছে কাজেই শিক্ষার যে ব্যবস্থা বাঙালী করেছিল, ভারতবর্ষ যদি তাই না করতে পারে, অর্থাৎ রাষ্ট্রকে সাধারণ শিক্ষার দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে সমাজের ওপর তার ভার অর্পণ করতে না পারে, তাহলে দেশের সকল লোকের শিক্ষার ব্যবস্থা সে কিছুতেই করতে পারবে না। মনে রাখতে হবে চল্লিশ কোটী লোকের শিক্ষা দেবার দায়িত্ব এক চীন ছাড়া পৃথিবীর কোন দেশকেই করতে হয় না। তাই চীনে আর ভারতবর্ষে শিক্ষা প্রসারের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করতেই হবে। দেশব্যাপী নিরক্ষরতা দূর করা যায় ভালো কথা। কিন্তু অক্ষরজ্ঞানকেই শিক্ষার মাপকাঠি বলে মনে করে হতাশ হয়ে পড়লে চলবে না। জ্ঞানকে যখন পুঁথির পাতায় ফলিয়ে তোলবার চেষ্টা করা হয় তখনই অক্ষর-জ্ঞান অপরিহার্য্য হয়। কিন্তু আসলে জ্ঞান তো চোখে দেখবার জিনিষ নয়। তা হচ্ছে মনের বুদ্ধির, অনুভূতির, অভিজ্ঞতার জিনিষ। অক্ষরের সাহায্যে না নিয়েও তা মন থেকে মনান্তরে সঞ্চারিত করা যায়। পুঁথির পাতায়, লাইব্রেরীর শেলফে, স্কুল-কলেজের ক্লাশে, লেকচার থিয়েটারে যখনি জ্ঞানকেন্দ্র স্থির করে দেওয়া হয়, তখুনি তাকে সকলের অনধিগম্য করে তোলা হয়, তখুনি তাকে শ্রেণী-বিশেষের অধিগম্য করে রাখা হয়। সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনের কথা ভুলে বিশেষ একটি শ্রেণীর শিক্ষার এবং বিশিষ্ট শিক্ষার জন্য রাষ্ট্র যদি অর্থব্যয় করে, তাহলে রাষ্ট্র যে শুধু অন্যায় করে তাই নয়, রাষ্ট্র নিজেরও ক্ষতি করে। লোকশিক্ষার যে ব্যবস্থা বাংলা করেছিল, বিশিষ্ট শিক্ষার সে ব্যবস্থা করেনি। শিক্ষার্থী অর্থ ঢেলে দেবে, আর শিক্ষার পুঁটুলি বেঁধে ঘরে ফিরবে, এমন ব্যবস্থা বাঙালী

করেনি। বিশিষ্ট শিক্ষার্থীদের জন্য সে সাধনার পীঠ তৈরী করেছিল পল্লীর চতুষ্পাঠীতে। সেখানে কাঞ্চনমূল্য দিয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হোত না, মূল্যস্বরূপ দিতে হোত নিষ্ঠা, নিবেদন করতে হোতো জ্ঞান তৃষ্ণা, প্রস্তুত হতে হোতো জীবন-ব্যাপী জ্ঞান অনুশীলনের জন্য। বিরাট জনগণ এ শিক্ষার জন্য আসত না। কিন্তু অতি স্বল্প যারা আসত তারা জনসমুদ্রে হারিয়ে যেত না, ধ্রুবতারার মতো জ্ঞানাকাশে উদিত থেকে জাতির কল্যাণের পথ নির্দেশ করত।

ইংরেজ এদেশে যে শিক্ষার ব্যবস্থা করল, তাতে কত অপচয়, কত অপব্যয়! বিশিষ্ট শিক্ষাদানের কেন্দ্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অর্থ ফেলে দিলেই ডিগ্রীর দাবীদার তৈরী যায় বলে কী ভীড় সেখানে। এই ভীড় বলেই বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রীধারী মানুষ তৈরীর ফ্যাক্টরি। লেকচার কটিন, সিলেবাস সবই কাটা ছাঁটা বাঁধা-ধরা, বিশিষ্ট শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হীন। তবুও যে প্রতি বছরই কিছু কিছু সত্যিকারের সাফল্যমণ্ডিত ছাত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, তার গৌরব বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা দাবী করতে পারে না- পারে সেই অল্পসংখ্যক কৃতী ছাত্রদের অদম্য জ্ঞান-পিপাসা। বিশ্ব-বিদ্যালয় যদি অনুকূল ব্যবস্থা করতে পারত, তাহলে এই অল্প কৃতী ছাত্রদেরই ভাস্বর হয়ে সূচীভেদ্য অজ্ঞানান্ধকার থেকে জাতিকে মুক্তি দিতে পারত। ভীড় জড়ো করে বিশ্ববিদ্যালয়কে যে অপব্যয় করতে হয়, তার স্মৃতি রাষ্ট্রকে বহন করতে হোত না।

বাঙালী শীলভদ্র বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় করেছিলেন যেখানে সমগ্র এসিয়ার বিদ্যার্থীরা সমবেত হোতো। বৌদ্ধধর্ম্ম কেন্দ্রচ্যুত হোলো বলেই সে বিশ্ববিদ্যালয় লোপ পেল, একথা হয়ত সত্যি। কিন্তু শীলভদ্রের অসামান্য সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে বাঙালী ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ফিরে পাবার পর অনুরূপ একটা বিশ্ববিদ্যালয় কেন গড়ে তুললোনা? বাঙালী তা গড়ে তুলতে ত চায়নিই, পরন্তু বিশিষ্ট শিক্ষাকে বিযুক্ত-কেন্দ্র করেচে শত সহস্র চতুষ্পাঠীকে বাহন করে। সমাজের বাইরে, সমাজ থেকে পৃথক রেখে বিদ্যার্থীদের বাঙালী বিশিষ্ট জ্ঞানের অধিকারী করতে চায়নি। বিদ্যার্থী চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করত হয়ত বেদান্ত, কিন্তু পাড়ার গৃহস্থদের তিথি নক্ষত্রের, বারবেলার ফল, শুভাশুভ তাকে বলে দিতে হোতো, তাদের ব্রত-পূজায় অংশ গ্রহণ করতে হোত; দান প্রতিগ্রহ, ফলাহার কিছুই এড়াতে পারত না। এক কথায় বিদ্যার্থী তার নিজের গৃহ ছেড়ে আসত বলতে সমাজ ছাড়া হোত না। সমাজের সঙ্গেই তার যোগ থাকত, পরগাছা হোত না। চতুষ্পাঠী বিদ্যার্থীর ভিড় এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মাঝে গ্রাজুয়েট ম্যানুফ্যাকচার করবার তাগিদে ফ্যাক্টরী হোতো না বলে অধ্যাপক জ্ঞানকে পরিপূর্ণ করে দিতে পারতেন, বিদ্যার্থীও মন ভরে তা নিতে পারতেন। সময় হয়ত বেশী লাগত। কিন্তু তাতে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হোত না। কেননা শিক্ষা নিতে তারাই আসত যাদের ডিগ্রী পাবার প্রতীক্ষায় তাদের বাড়ীর লোক হাঁড়ি চড়িয়ে বসে থাকতনা। অভিভাবকরা জানত বিদ্যার জন্যে যাদের তারা গুরুগৃহে পাঠিয়েচে, তারা সমাবর্ত্তিত হবে, তখন পণ্ডিত হয়ে আসবে, কিন্তু অন্যে পাঁচজনের কায়দা-কসরৎ শিখে আসবে না। তার জন্যে তাদের আফ্‌শোষ হত না এই কারণেই যে, জেনে শুনে পণ্ডিত করবার জন্যেই তারা ছেলেদের গুরুগৃহে পাঠাতো আর ধার করে, অথবা আবশ্যকীয় ব্যয়-সঙ্কোচ করে, আর ঘুষ খেয়ে আয় বাড়িয়ে আখেরে সুরাহা হবে আশা করে তারা ছেলেদের পড়াতে পাঠাতো না।

ইংরেজ তার প্রয়োজন পূর্ণ করবার জন্যে তার ছেলে শিক্ষার একরকম ব্যবস্থা করলে আর আমাদের দেশে আর একরকম ব্যবস্থা করলে। কেরাণীর আর উকিলের দরকার হলো তার সব চেয়ে বেশী। কিন্তু তাদের শিক্ষার এমন ব্যবস্থা করল যা সব কেরাণীর বা সব উকিলের না শিখলে চলে। ওকালতীর তবুও সব বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞানের দরকার, কিন্তু ক'জনা কেরাণীর সাহিত্য কাব্য বিজ্ঞানের প্রয়োজন থাকে? ও-সব জ্ঞানের প্রয়োজন থাকে? ওসব জ্ঞানের প্রয়োজন থাকে না, কিন্তু ডিগ্রী

প্রয়োজন থাকে। অতএব চার বছর কোলকাতায় হোষ্টেলে থেকে অভিভাবকের প্রচুর অর্থ ব্যয় করে হোবু-কেরাণীকেও ডিগ্রী নিতে হবে। কিন্তু তার নিজের দেশে ম্যাট্রিকুলেট মাত্রেই সকল সিভিল সার্ব্বিসের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত এবং সর্ব্বপ্রকার বৃত্তি-শিক্ষা পাবার অধিকারী বলে বিবেচিত হয়। আমাদের দেশের শতকরা অন্তত বিরনব্বই জন ডিগ্রি-প্রার্থীর শক্তির এবং অর্থের অপচয়ের জন্য দায়ী ইংরেজের ব্যবস্থা। বিড়ম্বনা যেমন ডিগ্রী-প্রার্থীদের, বিড়ম্বনা তেমন জাতির। এই ফালতু ভীড় যারা করে, তারা যদি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে চাকরিতে ঢুকে পড়তে পারে, তাহলে তাদেরও শক্তির এবং অভিভাবকদের আর রাষ্ট্রের অর্থেরও অপচয় হয় না। অল্প ডিগ্রী-প্রার্থীদের প্রকৃত শিক্ষারও ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু তাতেও ত্রুটি থাকে যদি সমাজের সঙ্গে তাতেও ছেলেদের যোগ রাখার ব্যবস্থা করা না যায়। য়ুনিভার্সিটি শব্দটির আগে হিন্দু শব্দ জুড়ে দিলেই যে হিন্দু য়ুনিভার্সিটি হয় না ইংরেজের মোহে মজে থেকে আমাদের নেতা হিন্দুরাও তা বোঝেন নি। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু জানতেন বিশ্বের সারস্বতদের অধ্যাপক করে আনলেই তাঁর বিশ্বভারতী সার্থক হবে না, যদি না বাংলার সমাজের সঙ্গে সেই বিশ্বভারতীর যোগ থাকে। শ্রীনিকেতন যেমন বিশ্বভারতীর সার্থকতার পক্ষে অপরিহার্য্য, তেমন শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রতিফলিত নিছক বাঙালী জীবনের ধ্যান-ধারণা আচার-উৎসবও অপরিহার্য্য। কোনটাকেই বাহুল্য বলে বর্জ্জন করা যায় না। করলে বিশ্বভারতীও হিন্দু য়ুনিভার্সিটির মতোই ইংরেজী প্যাটার্ণে গঠিত একটা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে দাঁড়াবে। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরে তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে গেছেন এবং সারাজীবন ধরেই বোঝাতে চেয়েচেন শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষার রূপ না দেবার দরুণ কী অপচয়ই না হচ্ছে আর কতই না অকল্যাণ সাধিত হচ্ছে!

বিশিষ্ট শিক্ষাকেও সমাজ-অঙ্গনে স্থান দিয়ে এবং লোকশিক্ষার বাহনরূপে গান, নৃত্য, নাটকে নিয়োগ করে (অর্থাৎ পুঁথিনিরপেক্ষ করে) শিক্ষার প্রভাবকে সার্ব্বজনীন করে তুলেচে। সেই কারণে বাংলার নিরক্ষর লোকেরাও মূর্খ নয়। বাংলার কালচার তাদেরও একটা বিশিষ্ট রূপ দিয়েচে। আর সে রূপ শিক্ষিতদের রূপ থেকে খুব বেশী স্বতন্ত্র ছিল না। ইংরেজের আমলে শিক্ষিত আর অশিক্ষিতদের আচার-ব্যবহার বেশ-ভূষা দেখে এক জাতির লোক বলে মনে করা কঠিন হয়ে পড়েছে, কিন্তু ইংরেজের আবির্ভাবের আগে পার্থক্য এত বেশী ছিল না। ইংরেজী শিক্ষা এই যে ক্ষতি করেচে স্বাধীন-ভারতকে এর জন্যে অনেক দুঃখ পেতে হবে।

লোকশিক্ষা প্রসারের জন্য গান, নৃত্য, নাট্য প্রভৃতি নিয়োগ করে বাঙালী বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ কাজকে সার্থক করে তুলেছিল একথা যদি বলি তাহলে অনেকেই অত্যুক্তির অপরাধে আমাকে অপরাধী করবেন। কিন্তু সত্যিই তা অত্যুক্তি নয়। ও-গুলিকে শিক্ষার বাহন করা হয়েছিল বলেই সমগ্র জাতি ছন্দোবদ্ধ হতে পেরেছিল, জীবনের সংঘাতে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পেরেছিল, সৌন্দর্য্যের সাধক হতে পেরেছিল, রসপিপাসু হতে পেরেছিল, মনকে ঊর্দ্ধলোকে প্রসারিত করতে পেরেছিল। গান, নৃত্য, নাট্য কেবলই অভিনয় নয়। ও-গুলো যেমন রস-সৃষ্টি, তেমন রস সৃষ্টির প্রেরণাও যোগায়; যেমন জীবনকে প্রতিফলিত করে, তেমন দর্শকজীবনে রস-সঞ্চারও করে; যেমন দর্শকদের রসাপ্লুত করে, তেমন দর্শকদের চিত্ত থেকে রস সংগ্রহ করে নিজেকেও সার্থক করে; যেমন সাধারণ মানব-জীবনের ঊর্দ্ধে উঠে মানুষের বাসনা-কামনা আবেগ-অনুভূতিকে নাড়া দেয়, তেমন সাধারণ মানুষকেও বাসনা-কামনা আবেগ-অনুভূতির ঊর্দ্ধতর স্তরে টেনে তোলে। বাঙালী ওই গুলিকে লোকশিক্ষার বাহন করেছিল বলেই ত নিরক্ষর বাঙালীর রচিত কত গান, কত কাব্য সাহিত্যে অমর হয়ে রয়েছে; গানে কাব্যে কত দার্শনিক দুরূহ তত্ত্ব সরস হয়েছে; চিত্তগ্রাহী হয়েচে; নিরক্ষর লোককে সৌন্দর্য্যের সাধক করেচে, প্রকৃতির সঙ্গে প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য রক্ষার শিক্ষা দিয়েচে, রস-সৃষ্টির প্রেরণা যুগিয়েচে।

সীমা

লিঅন ফএখট্‌ভানগার   অনুবাদক: ভবানী মুখোপাধ্যায়

[লিঅন ফএখট্‌ভানগার প্রসিদ্ধ জার্মান সাহিত্যিক। ১৮৮৪-এর ৭ই জুলাই ম্যুনিকের ইহুদী ব্যবসায়ীর ঘরে জন্ম। বার্লিন ও ম্যুনিকে দর্শন অধ্যয়নান্তর নাটক, কবিতা ও উপন্যাস রচনা করে অশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। গ্রন্থাবলীর মধ্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস "জু স্যুস্", "জোসেফস্"—আর "আগলী ডাচেস্" বিশ্বব্যাপী খ্যাতি লাভ করেছে। ১৯৩৩-৭ জার্মানী থেকে বিতাড়িত হয়ে দক্ষিণ ফ্রান্সে বসবাস করেন। পরে জার্মান অধিকারের পর অন্তরীনাবদ্ধ অবস্থায় আমেরিকায় পালিয়ে এসেছেন।

বর্তমান উপন্যাস "সীমঁ" ১৯৪৪-এ যুদ্ধকালীন দক্ষিণ ফ্রান্সের পটভূমিকায় রচিত—বাঙালী পাঠকের সুবিধার জন্য "সীমঁ"কে "সীমা"য় রূপান্তরিত করা হয়েছে।

—অনুবাদক]

প্রথম ভাগ

—: প্রস্তুতি :—

শরণাগতের দল

আর কয়েক পা এগিয়ে গেলেই সংকীর্ণ গলিপথ সহসা বাঁক নিয়ে একেবারে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। এই টুকু পথ শেষ করার জন্য সীমার প্রত্যাশাভরা মন যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। বড় রাস্তার চৌমাথায় গতকাল সর্বপ্রথম ও শরণাগতদের মিছিল লক্ষ্য করেছিল, আজ এতক্ষণে তারা হয়ত ছোটো খাটো গলি ঘুঁজির ভিতর ঢুকে পড়েছে।

তিন সপ্তাহ ধরে এই শরণাগতদের শব্দ শোনা যাচ্ছে। গোড়ার দিকে আসছিল শুধু ডাচ্ আর বেলজিয়ানরা, এখন উত্তর ফ্রান্সের লোকেরাও অগ্রগামী শত্রুসৈন্যের হাত থেকে পালিয়ে দক্ষিণাঞ্চলে চলে আসছে—আসছেত' আসছেই। সারা বার্গেণ্ডী শহরটাইত' এখন এই দুর্গত শরণাগতদের দলে বোঝাই হয়ে গেছে। প্রতিদিনকার মতো গতকাল সাইকেলে বাজার যাবার সময় সীমাকে অতি-কষ্টে ভিড়ের ভিতর পথ করে নিতে হয়েছে—আর আজ ত' সে সাইকেল্ বাড়ীতেই রেখে এসেছে।

সীমা প্লানকার্ড্ যখন প্রথম এই শরণাগতদের কথা শুনেছিল তখন ওর কল্পনাপ্রবণ মনে একদল ভীত সন্ত্রস্ত পলায়মান লোকের ছবি জেগে উঠেছিল, সব বিষয়েই তাদের ব্যস্ততা আর ভয়। গত কয়েকদিনে যা দেখেছে তার ভিতর অবশ্য কিছু পরিমাণে স্বাভাবিকত্ব থাকলেও ভয়ংকরত্ব আছে। এই কথাই বারবার ওর মনে উদয় হয়েছে, ওকে উৎপীড়িত করে তুলেছে, রাতে ওর চোখে এতটুকু ঘুম নেই। যতবার শহরে যেতে হয়েছে ততবারই এই করুণ দৃশ্য সম্পর্কে মনে একটা আতঙ্কের ভাব জেগেছে,

কিন্তু প্রতিদিনই করুণা ও কোমলতায় বিগলিত হয়ে উৎকণ্ঠ আগ্রহে সীমা ওদের দেখেছে।

এতক্ষণে ও বাঁকের মুখে এসে পৌঁছেচে রাস্তার কিছু অংশ এইখান থেকে দেখা যায়—অবহেলিত সরু পথ, চিরদিনই জনহীন ও পরিস্কার, ও পথে মাত্র দুটি-বাড়ী ওলা পার্বত্যগ্রাম নাইরেট ভিন্ন আর কোথাও যাওয়া যায় না, আজ কিন্তু যা ভয় করা গিচ্ছল তাই হয়েছে—এ পথেও মানুষের ভীড়। বিশাল জনারণ্য এই পথেও এসে ছড়িয়ে পড়েছে।

সীমা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে চারিদিকে দেখতে লাগল—পনের বছরের মেয়ে, সুন্দর দীর্ঘচ্ছন্দ দেহ, পরণে ফিকে বাদুড় রঙের ডোরা কাটা ছিটের পোষাক বাজার করবার সময় এই পোষাকটাই ও পরে থাকে, মুখঢাকা একটি বড় ঘেতের ঝুড়ি গায়ের সঙ্গে লেপটানো হাত ও পায়ের সুঠাম অনাবৃত অংশ পোষাকের বাইরে বেরিয়ে আছে—ছাইরঙের চুলে ঘেরা সীমার চওড়া তামাটে মুখখানি। গভীর নীচু অথচ প্রশস্ত কপালের নীচে একজোড়া কালো চোখে ধূলিধূসর পথে যা কিছু বিচরণশীল সীমা পরম আগ্রহভরে তাই দেখে। সেই পরিচিত দৃশ্য, মানুষ ও যানবাহনের হতাশাভরা মিছিল—গৃহস্থালীর টুকীটাকী জিনিষপত্র বোঝাই করে গাড়ীর পর গাড়ি চলেছে, ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল বিমানের মেশিনগানের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার উদ্দেশ্যে মোটর গাড়ীর ছাদে বিছানার গদি বিছানো হয়েছে, পরিশ্রান্ত মানুষ আর পশু একই ভাবে, একই সঙ্গে নিরুদ্দেশের পথে চলেছে।

পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে সুগঠিত ঠোঁট দুটি দাঁতে চেপে সীমা দেখছে এই দৃশ্য। মেয়েটিকে সুন্দরী বলা অবশ্য ঠিক হবেনা, তবে ওর বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তাকুল সুদৃঢ় মুখশ্রী আর কঠিন চোয়াল আর সুস্পষ্ট বার্গেণ্ডীয় নাক চেয়ে দেখার মতো। পুরো একমিনিট—তারও বেশীকাল ধরে, অপরাহ্ণ বেলার উত্তাপ ও ধূলার ভিতর দাঁড়িয়ে সীমা এই পলাতকদের দেখতে লাগল।

অবশেষে ওকে পাশ কাটিয়ে সরে আসতে হ'ল। অনেক কাজ ওর—মাদাম অনেকগুলি কাজের ভার ওর ওপর দিয়েছেন। গ্রানকার্ড পরিবারের আবাসগৃহ "ভিলা মন রেপোয়" সব রকম জিনিষ মজুত রাখতে হবে, তবে অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে আর দু তিন দিনের ভিতর বাজার হাট করা এক রকম অসম্ভব হয়ে উঠবে। সেই কারণেই মাদাম সীমাকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির যে তালিকা করে দিয়েছেন তা আকারে দীর্ঘ। এই উত্তেজনা ও হট্টগোলের ভিতর সব কাজগুলি সারা হয়ত সম্ভব হয়ে উঠবে না। এই দৃশ্যের ভিতর আর আটক না থেকে সীমা দ্রুত পদক্ষেপে সোজা শহরের দিকে চলল।

সরু গলিটা যেখানে শেষ হয়ে ৬নং রুটে এসে পড়েছে, সীমা সেইখানে এসে পৌঁছল সেণ্ট মার্টিনের পার্বত্য কেন্দ্রের পাশে অর্ধবৃত্ত করে এই পথটি ঘুরে গেছে এইখানটিতে যে দৃশ্য সীমার চোখে পড়ল, গত কয়েক দিনের ভিতর এতখানি করুণ দৃশ্য আর ও দেখেনি। পথের মোড়ে ঘুরতে গিয়ে একদল মোটর দাঁড়িয়ে গেছে, অন্যদিক থেকে আর এক সার মোটর এসে পথ জুড়ে আছে, ঘোড়ার গাড়ি, মোটরকার, বাইসিকল, গাধা, পথচারী সবাই মিলে একটা অদ্ভুত খিচুড়ি পাকিয়েছে—অসহায় জনগণের পথহীন মিছিল। কেউ কিন্তু একটও কটু কথা বলছেনা, এই জটিল গন্থি খোলার চেষ্টা করছে না, অস্বস্তিকর অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে সবাই সেই উত্তপ্ত ধূলিমলিন পথের ওপর স্থির হয়ে বসে আছে,—ছেলেবুড়ো, নর ও নারী সৈনিক ও বে-সামরিক, আহত ও অক্ষত—সবাই স্বেদাক্ত কলেবরে হতাশাভরে বসে আছে

গভীর করুণাভরা চোখ মেলে সীমা সেই ধূলিমলিন সেই নিশ্চল ও বিস্ময়কর নীরব মিছিলের দিকে চেয়ে রইল, এই প্রাণহীন জনমণ্ডলী যেন একটি বিশাল ছবির অংশ বিশেষ, সীমার করুণার্দ্র মুখখানিতে যেন বয়সের ছাপ পড়েছে। পনের বছরের ভিতরেই সে অনেক খানি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, ভাবাবেগ সংবরণ করে নিজের

কাজ সেরে নেবার কথা স্মরণ করে এই জনতা ভেদ করে রাস্তা পার হবার জন্য সীমা সচেষ্ট হ'ল। ঝুড়িটি হাতে করে তারের বেড়া ডিঙ্গিয়ে গাড়ির শেষ প্রান্তের ভিতর দিয়ে আরোহীদের কাছে ক্ষমা চেয়ে সীমা অতি কষ্টে পথটি অতিক্রম করল—ওকে তারা লক্ষ্য না করে স্থাণুর মতো নীরবে বসে গরমে ধুঁকতে লাগল।

অবশেষে রাস্তা পার হয়ে ও প্রাচীন পাথরের পথ ধর্‌লো, নবাগতের পক্ষে এ পথ খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। এই পথ এঁকে বেঁকে সর্পিল ভঙ্গীতে পাহাড়ে গিয়ে উঠেছে —এইখান থেকে এই প্রাচীন শহর বেষ্টনকারী দুর্গ-প্রাকারের ধ্বংসাবশেষ ও নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল তরুবীথিকা দেখা যায়। প্রতি বাঁকে নূতন পরিপ্রেক্ষিতে সেরীণ নদীর তটভূমি দেখা যায়। উজ্জ্বল ও মনোহর দৃশ্যপট; বিস্তীর্ণ তটভূমি জুড়ে দ্রাক্ষাকুঞ্জ, জলপাই ও বাদামগাছের ঝোপ—প্রতি শৈলশিখরে কিছু না কিছু প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন বর্তমান, আর পূর্ব দিকে গর্বোন্নত ঘন অরণ্যাবৃত পাহাড়। সুসময়ে অসংখ্য যাত্রী এই মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে আস্‌ত। সীমার কাছে যতই পরিচিত ও পুরাতন হোক্ না কেন, চিরদিনই সে গভীর মনোযোগ সহকারে রসবোদ্ধার দৃষ্টি নিয়ে এই দৃশ্যাবলী দেখেছে। কিন্তু আজ আর এ সবের জন্য ওর মনে এতটুকু অনুভূতি নেই। আজ সে বড় রাস্তার উপর সদ্য-দেখা দৃশ্য ভুলে যাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল, পাহাড়ের কঙ্করকঠিন পথের বিশৃঙ্খলার ভিতরে অখণ্ড মনঃসংযোগ করতে হ'ল, এই কারণে সীমা মনে মনে স্বস্তি অনুভব কর্‌লো। এক এক জায়গায় ওকে লাফিয়ে পড়তে হয়েছে, অত বড় ঝুড়ি নিয়ে সে কার্য করা বড় সহজ নয়। এর পরে শহরে এলে সীমা পা-জামা পরে আস্‌বে। অনেকে আবার এই যুদ্ধকালে মেয়েদের পক্ষে পা-জামা পরাটা অন্যায় মনে করেন, মাদাম নিজেই পাজামা পরা অপছন্দ করেন।

এইবার সীমা ওপরে পৌঁছে পোর্ট সেণ্ট-লাজার দিয়ে শহরের ভিতর ঢুকে পড়ল। গির্জার সাম্‌নেকার সরকারী পার্ক ওকে পার হতে হল। অন্য সময় এই ছোট্ট জায়গাটুকু জনশূন্য ও শান্তিপূর্ণ থাকে। মাঝে মাঝে ভ্রমণকারী যাত্রীদল এইখানে দাঁড়িয়েই গির্জাঘরের বিখ্যাত পাথরের মূর্তিগুলি দেখতেন।

আজ পার্কটি ভিড়ে পরিপূর্ণ। অনেক শরণাগত ওপরে উঠে এসেছে, তবে মূর্তির দিকে তাদের লক্ষ্য নেই; ওরা পেট্রোল, খাবার বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী খুঁজছে। এইখানে ও অন্যত্র সঞ্চিত অভিজ্ঞতা পরস্পরের ভিতর বিনিময় করা হচ্ছে। তীব্র ও তিক্ত ওদের অভিজ্ঞতা। প্রায় সকলেরই সব কিছু নেই, আর সেণ্ট-মার্তিনেও কিছু পাওয়া যায় না, প্রায় সকলেরই মৃত্যুর নিশ্চিত হাত থেকে অল্পের জন্য অব্যাহতি মিলেছে। এইখানে এসে ওরা বসে দাঁড়িয়ে একটু বিশ্রাম করছে, আর তাদের পাশে দাঁড়িয়ে শহরের অধিবাসীবৃন্দ (তার ভিতর সীমাও আছে) ওদের কাহিনী শুন্‌ছে।

পলাতকদের মন্দগতি মিছিলের ওপর জার্মান বিমান বহর বোমা ফেলেছে—বার বার জার্মান আক্রমণের মুখে ওদের পড়তে হয়েছে। যানবাহনবহুল পথের চৌমাথায়, ব্রীজের ওপর, বা রেল রাস্তার লেভেল-ক্রসিং-এর মুখে সর্বত্রই জার্মানরা ওদের বিব্রত করেছে। ওদের মধ্যে অনেকে হতাশাভরে বল্‌ল···"আমরা পালিয়ে এসে বড় ভুল করেছি, বাড়িতে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে জার্মান বোমার জন্য প্রতীক্ষা করা ভয়ংকর বটে, কিন্তু পথের ভয়ংকরত্ব দশগুণ বেশী। এই পলায়নের সব কিছুই লোমহর্ষক।"

সীমা শুন্‌তে লাগল, তবে এ সব কথা ও আগেও শুনেছে। প্রাচীন কালের সুন্দর বাড়ি "হল অফ জাষ্টিস" ছাড়িয়ে সীমা চল্‌ল,—সে সহসা সেই প্রাসাদের দরজা দিয়েও লক্ষ্য কর্‌ল, মাটিতে খড় বিছিয়ে তার উপর অসংখ্য পলাতক অসহায় ভঙ্গীতে ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে শুয়ে আছে। এ দৃশ্য থেকে সীমা ওর চোখ ফিরিয়ে নিল, অন্তরে একটা অপরাধীর ভাব নিয়ে পথের ধারের বাড়িগুলির গা ঘেঁষে সীমা রু গু সভিনির দিকে চল্‌ল।

ওকে লক্ষ্য কর্‌ছিল—বয়স্ক লোকটি অন্যমনস্কভাবে আর বালকটি খুব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়েছিল। সীমা জানে শীগগীরই তত্ত্বাবধায়কের ঘর থেকে কেউ জানালা খুলে উঁকি মেরে মাথা নাড়বে আর এই ছেলেটি তার উজ্জ্বল চোখ মেলে দেখবে। ঠিক তাই হোল। বালকটি জানলার দিকে তাকালো, জানালা থেকে সীমার দিকে, সীমার বেতের ঝুড়ির দিকে, আর দেখলো দরজা খুলে গেল। সীমা বালকটির দিকে চাইতে পার্‌লো না, কিন্তু দরজার ভিতর ঢোকার সময় কিছুতেই তার দিকে মাথা ঘুরিয়ে তাকাবার লোভ সংবরণ কর্‌তে পার্‌লো না। সীমা দেখলো বালকটি ঝদারের মত উজ্জ্বল চোখ মেলে তার দিকে চেয়ে আছে, সীমা সেই কঠোর দৃষ্টি হজম কর্‌ল।

হোটেলের রান্নাঘরে সীমা দেখ্‌লো তালিকাভুক্ত অনেকগুলি জিনিষ পাওয়া যেতে পারে। একপাত্র চমৎকার মাংসের পেষ্ট্‌, একখণ্ড স্মোক্‌ড্‌ হ্যাম্‌, আরো কত কি! ঝুড়ি বোঝাই হয়ে গিছল, সীমাকে একখণ্ড রবেলকন্‌চীজ্‌ হাতে করে নিতে হল। বাইরে পাঁচিলের ধারে সেই দুটি শরণাগত সমানভাবে বসে আছে—সেই ভাবেই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সহসা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ভঙ্গীমায় সীমা ওর রবেলকন্‌চীজের টুক্‌রাটুকু ছেলেটির হাতে দিয়ে দিল। ছেলেটি অত্যন্ত রুষ্টভাবে ওর মুখের দিকে তাকাতেই সীমা তাড়াতাড়ি সে দিকে না ফিরে দেখে পালিয়ে এল, সে যেন একটা ভীষণ অন্যায় করেছে।

ওর কেবলই মনে হ'তে লাগ্‌ল—যতক্ষণ না মোড়ের মাথায় সীমা মিলিয়ে গেছে ততক্ষণ ওরা সেইরকম স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে। সীমা একটু ভয় পেয়েছে। পলাতকরা যদি টের পায় ওর ঝুড়িতে কি আছে তা'হলে ওরা জিনিষগুলি কেড়ে নিতে পারে। সীমা ভীত হয়ে পড়েছে, কিন্তু সেই মুহূর্তেই ওর মনে হ'ল—ওদের কোনো দোষ ধরা যায় না। ওর মনে হ'তে লাগল, আহা ওর যদি সত্যি ঝুড়িটা কেড়ে নেয় ত' ভালো হয়।

ভিলা মনরোপাতে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যকর পরিবেশে প্রতিপালিত। দশ বছর বয়সে বাপ মারা যাবার পর এ বাড়িতে দরিদ্র আত্মীয় হিসাবে কষ্টেই ও বাস করে আসছে। প্রকৃতপক্ষে দাসীর কাজের ভার নিয়ে ওকে কঠিন পরিশ্রম কর্‌তে হয়, এদিকে আবার পরিবারবর্গের সঙ্গে একত্রে আহার করে, তারাই ওর অভিভাবক। প্রস্‌পার খুড়োর হুকুম যে ওকে বাড়ীরই একজন হিসাবে যেন ধরা হয়। কর্ত্তব্য ও সুবিধা দুই-ই সে স্বাভাবিক নিয়ম হিসাবে মেনে নিয়েছে, ভিলা মনরোপার আচার ও ব্যবহার ওর কাছে দিন ও রাতের মতই অপ্রতিবাদ্য। প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য কোনোরূপ প্রতিবাদ না করেই ও প্রস্‌পার খুড়োর মা মাদামের সকল আদেশ ও নির্দেশ পালন করে। এই দুঃসময়ে একজন পাকা গৃহিণী যে তাঁর ভাঁড়ার ভর্তি করে রাখ্‌বেন এ ত' স্বতঃসিদ্ধ। তবু চেতনভাবে চিন্তাসূত্র না হারিয়েই সীমার মনে হতে লাগ্‌ল, যে মর্মবেদনা গত কয়েকদিন ধরে ওকে উৎপীড়িত কর্‌ছে, তার সঙ্গে এই ঝুড়িটির সংযোগ রয়েছে।

ইদানীংকার এই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কারো সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে আলোচনা করার জন্য সীমা উন্মুখ। এই সেদিন পর্য্যন্ত ম্যাজিনো লাইন আর শক্তিশালী সৈন্যদলের সংরক্ষণে ওরা গভীর নিরাপত্তা সহকারে বাস করেছে। যুদ্ধ সত্ত্বেও সর্বত্র বেশ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় ছিল, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা স্বাভাবিক নিয়মের প্রাচুর্যের ভিতর কেটে গেছে। তারপর সহসা রাতারাতি ম্যাজিনো লাইন ও সৈন্যদলের সতর্কতা সত্ত্বেও শত্রুসৈন্য দেশের অভ্যন্তরে এসে পড়েছে, আর সারা ফ্রান্স দুর্দশা ও দুঃখে অর্ধোন্মত্ত অসহায় শরণাগতদের দলে বোঝাই হয়ে গেছে। দুশ্চিন্তা ও দুঃখকাতর সীমা এই যুদ্ধের বছরে সবাই নির্বোধের মত নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটিয়েছে এই কথা ভেবে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। কি করে যে এই সব ঘটনা একযোগে সংযুক্ত হয়েছে একথা সীমা ভেবে পায়না, এ বিষয়ে ওর চেয়ে অধিকতর জ্ঞানী কারো সঙ্গে আলোচনা করে প্রশ্ন

করে কিছু জান্‌তে পারলে হয়ত ভালো হ'ত, কিন্তু প্রাণখুলে কথা কইতে পারে এমন কাউকেই ত' সে জানে না।

ওর বাবার সতাত ভাই প্রস্‌পার খুড়ো ওকে ভারী স্নেহ করেন। ওকে যে তিনি বাড়িতে রেখেছেন তার জন্য সীমা সত্যই কৃতজ্ঞ।

তিনি সদয় ও সহৃদয় ফরাসী ভদ্রলোক এবং অত্যন্ত স্বদেশহিতৈষী। যানবাহন সংক্রান্ত ওঁর ব্যবসা নিয়ে উনি আগের মতই ব্যস্ত আছেন, কাজটার অবশ্য গুরুত্ব আছে আর যদিও ইদানীন্তন ভয়ংকর ঘটনাবলীতে তিনিও বিব্রত আছেন তবু মনে হয় এই ব্যাপারে সীমা যেমন অভিভূত হয়ে পড়েছে তিনি ততটা হ'ননি। যাই হোক্ এই সব ব্যাপারে তিনি যা বলেছেন সে সব কথা সীমা যা জান্‌তে চায় তা নয়। সেই কথায় কোনো কিছুরই অর্থ পরিষ্কার হয়নি, তার মনের জটিলতা কাটেনি।

খুড়োর মা, মাদাম, সাম্প্রতিক ঘটনাবলী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন নিজের বাড়ি ও নিজের সম্পর্কে তিনি একটি সুদৃঢ় প্রাচীর রচনা করেছেন, আর সব কিছু ব্যাপারেই 'ভিলা মনরোপা'র সম্ভাব্য মঙ্গল আর অমঙ্গলের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেন। যেমন আজ যদি কারখানায় কাজ করছে কোনো পলাতক সীমার ঝুড়ি নিয়ে পালাত, তাহলে মাদাম তাকে সাধারণ দস্যু ও ঘৃণিত আসামী ছাড়া আর কিছু ভাব্‌তেন না, আর তাঁর সে ধারণার প্রতিবাদে সীমা কিছু বল্‌তে গেলে মাদামের কাছে তা ধৃষ্টতা ও বিদ্রোহের ভঙ্গী বলে বিবেচিত হ'ত। এমন কি এত সদয়চিত্ত হলেও এই সব ব্যাপারে প্রস্‌পার খুড়োর কোনো সহানুভূতি থাক্‌ত না।

এতকষ্টে সংগ্রহ করা রবেলকন্ চীজটুকু যে সে শরণাগত-দের ছেলেকে দিয়েছে সেকথা অবশ্য সে চেপে যাবে। ভিলা মনরোপাস্থ সীমার আত্মীয়বর্গ একথা শুন্‌লে তাকে উন্মাদ বিবেচনা করবেন। আর সেই ছেলেটি ত' ও'র দিকে রুষ্টভাবে চেয়েছিল। তবু ও পুনরায় হয়ত অনুরূপ কাণ্ড করে বস্‌বে।

নানা চিন্তায় ওর মাথা পরিপূর্ণ, অন্যমনস্ক ভাবে দ্রুত পদক্ষেপে ও পার্বত্য পথে চল্‌তে লাগ্‌ল—ওর কাজ শেষ হয়েছে। এইবার ওকে প্রস্‌পার খুড়োর গ্যারাজে পেট্রোল পাম্পে কাজ করবার জন্য যেতে হবে। ইতিমধ্যে বাড়ীর রাস্তা দিয়েই ওকে যেতে হবে। আহা! সে যদি এখানে থাক্‌ত বেশ হ'ত। সে এখন চ্যাতিলোর মেসিনে

(ক্রমশঃ)

বর্তমান

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

অতীত মিলায় দূর ছায়াসম দিক্‌চক্রবালে,
ভবিষ্যের কূল-রেখা তেমনি যে নিরাশা-মলিন,
কাল হ'ল কূলহারা, ঘূর্ণাস্রোত বিরামবিহীন
বহে যেই—বর্তমান লুকায়েছে তারি অন্তরালে।
গঙ্গাধর নাহি ধরে গঙ্গা আর। যেন রুদ্র-ভালে
অস্ত গেছে অর্দ্ধশশী; কটি হ'তে বক্ত গজাজিন
খসিছে সন্ধ্যার মেঘে; শোনা যায় শুধু নিশিদিন
তাণ্ডবের পদধ্বনি করধৃত ডম্বরুর তালে।

নৃত্য করে মহাকাল—স্কন্ধে মৃত সতী দেহ ভার;
গ্রাসিছে যজ্ঞের ভাগ দক্ষালয়ে যত নিশাচর,
গ্রাসমুদ্র হিমাচল সর্ব্বজীব গণিছে প্রলয়;
বিধি তবু অপ্রমত্ত, হেরিছেন যোগ নেত্রে তাঁর—
উমারূপে সেই সতী বসে বামে, হাসে মহেশ্বর,
ধীরে জাগে বর্তমান—দিগন্তরে জ্যোতির বলয়!

রবি-প্রণাম

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সেদিন চম্পক বনে মর্ম্মরিত সুরভি নিঃশ্বাস,
রবির পরশ লভি' অনুদ্ভিন্ন দলে স্বর্ণশোভা,
থরে থরে বিস্তারিয়া ফুল জন্মে আনিল আশ্বাস
বৃন্তে বৃন্তে পরিপূর্ণ সম্বৃত সৌন্দর্য্য মনোলোভা।

বসন্ত বিদায় নিল;—মঞ্জরিত চূতবল্লরীর
মৃদু গন্ধে আমোদিত বৈশাখের বৈরাগী বাতাস,
ক্ষণে ক্ষণে জাগে আশা ম্রিয়মান প্রাণে বল্লভীর
ক্ষণে ক্ষণে লুপ্ত হয় মিলনের অপূর্ব্ব আভাস।
বৈশাখের খর রৌদ্রে রুদ্রবীণা ওঠে ঝঙ্কারিয়া
অগ্নির স্ফুলিঙ্গ ঝরে অঙ্গুলির ক্ষিপ্র সঞ্চরণে,
শতাব্দীর সূর্য্য বুঝি পূর্ণ তেজে এল বাহিরিয়া
যুগের সে সন্ধিক্ষণে দেখা হোল জীবনে মরণে।

হে সূর্য্য, অমিতবীর্য্য, হে রবি বিশ্বের আদি কবি
ঊর্দ্ধমুখী ধরণীর অর্ঘ লহ প্রসন্ন আননে,
তব মন্ত্রে প্রকাশিত ভূমার এ অনিন্দিত ছবি
তোমার সঙ্গীতে মুগ্ধ বাণী তাঁর শ্বেতপদ্মাসনে।

হে রবি, শাশ্বত কবি, দিব্যজ্যোতি পুরুষ মহান
অ-মৃত প্রণাম লহ, মৃত্যুহীন অনশ্বর প্রাণ।

কৃষ্ণা কালো মেয়ে

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

পিতৃহীন দুটী বোন কৃষ্ণা ও কাবেরী
কালো অসঙ্গতিপন্ন। বিবাহের দেরী
হবেই তো, তবু যেন হয়, সে আশায়
সর্ব্বস্ব করিয়া পণ নানান্ শিক্ষায়
উভয়ে পালন করে দরিদ্রা জননী
হরিদ্রা ময়দা সর কখনো নবনী
মাখান তাদের মুখে।
গ্রামে বিদ্যালয়—
সে শিক্ষা হইলে শেষ উভয়ে প্রেরয়
উচ্চতর বিদ্যা লাগি বিশ্ববিদ্যালয়ে।
সেথা হ'তে নগরীর উচ্চ শিক্ষা লয়ে
উভয়ে ফিরিল ঘরে।
কাবেরীর রঙ
কিছু কম কালো, তার হাল চাল ঢঙ্
কথাবলা আধুনিক, বেশ বাস রুচি
ফিট্ ফাট্ মডার্ণ্, সেলায়ের সূচী
চালায় দর্জ্জির মত, বাজায় এস্রাজ,
আঁকিতে গাহিতে নৃত্যে কিছুতে নারাজ
নহেকো, যদিও ছোটো, তবু তার বিয়ে,
—অবশ্য তাদের যথাসর্ব্বস্ব বিক্রীয়ে—
হয়ে গেল আগেভাগে। কিন্তু অতঃপর
কৃষ্ণার বিয়ের ফুল ফোটানো দুষ্কর
হইল দুর্ঘট কিছু। ঘটক তৎপর
হইল যদ্যপি সবে, তার যোগ্য বর
মেলা সুকঠিন কিছু। একে যোগ্য ছেলে
মেলে না, যদিবা মেলে কোষ্ঠী নাহি মেলে।
কেন্দ্রে রন্ধ্রে গ্রহ তারা নানা যোগাযোগ,
কাহারো অষ্টমে, রাহু অকাল-বিয়োগ,
যোটকের বহুবিধ অবৈধ ওজোর।
কিম্বা যদি তাও মেলে নাই ঘরদোর
শিক্ষা দীক্ষা চালচুলো।
তবু লজ্জা নাই,
অম্লান বদনে কেহ বলে, 'দেখ ভাই
নগদ হাজার দুই, ত্রিশ ভরি সোনা
আর বরাভরণের সে আর বলো না
ঘড়ি-চেন আংটি আর পাথেয় ধরিয়া
কত হবে বড়জোর শ'বারো করিয়া
ধরে নাও মোটামুটি। কি বলিলে? দিতে
পারিবে না ট্রেণ ভাড়া? আমারি কি নিতে
ইচ্ছা তাহা? জামাতারে পোষ্টে পাঠাইতে
পারিতাম ভি-পি করি, কিন্তু পদ্ধতিতে
এখনো চলেনি তাহা।'

কিছু কাল কাটে,
কৃষ্ণা রয় পড়ে যেন হাটের রেজাটে
নিকৃষ্ট বাছট-পড়া বিক্রয়ের শেষে
ঝুড়ির তলার মাল ; হতভাগ্য দেশে
মেয়ে আছে, ছেলে নাই ! মেয়েটীর গুণ
প্রচারিত মুখে মুখে, রন্ধনে নিপুণ,
মধুর কীর্ত্তন গায়, সৌজন্যে শিক্ষায়
সমকক্ষ নাহি তার তবু তারে হায় !
কেবা লবে ? সে যে কালো, নাহিক যৌতুক
কৃষ্ণারে বলিতে কৃষ্ণা সবারি কৌতুক !
রূপ নাই অর্থ নাই বৃন্তে নাই বল,
অকালে শেফালি ফুল চুম্বে ভূমিতল।

রূপ নাই গুণ নাই, অর্থ যদি থাকে,
শশীর মসীর মত সে কলঙ্ক ঢাকে
রৌপ্যশুভ্র চূণকামে। অর্থ না থাকিলে
'রায়স্পোষ' হবে কিসে, সন্তোষ না মিলে
কাহারো 'নির্জ্জলা' গুণে।

ব্যর্থ হয় সবি
রূপ গুণ শিক্ষা শীল সব পরাভবি
প্রভাব প্রকাশ করে অর্থের অভাব
দারিদ্র্য পঙ্কিল করে সাধুরো স্বভাব,
প্রতিভার সুতীক্ষ্ণতা।

তাই ঘরে পরে
দরিদ্রেও দরিদ্রেরে দয়া নাহি করে,
সবাই শুষিতে চায়, যাতে অবহেলে
বিনা পরিশ্রমে অর্থ ততটুকু মেলে
যা'তে তার দিন কাটে, ঋণ হয় শোধ
তাহার দারিদ্র্য-দুঃখে চায় প্রতিশোধ
লইতে অন্যের পরে। গতানুগতি ক

এমনি চলেছে রীতি, চলেছে পথিক
চলার মসৃণ পথে।

কৃষ্ণা কালো মেয়ে
সেই ক্ষুদ্র সংসারের সুখ শান্তি খেয়ে
বেড়ে ওঠে, বিষবৃক্ষ মলিন উদাস
কালোবর্ণ কালোতর হয়, হতাশ্বাস
বক্ষে যত ধরে চেপে।

কৃষ্ণা কালো মেয়ে—
বছর বছর বাড়ে ; তার পানে চেয়ে
জননীর রক্ত জল, মুখে অন্নজল
রোচেনা, নয়নে তার ভরে উঠে জল
চাহিলে কন্যার পানে।

কৃষ্ণা কালো মেয়ে
শঙ্কিত কুণ্ঠিত প্রাণে দেখে চেয়ে চেয়ে
সমবয়সীরা একে একে হয় পার
তাহারি সে মন্দ ভাগ্যে না হয় উদ্ধার
কৃতকর্ম দুর্ব্বিপাকে দুর্ব্বিষহ ভার
দ্বাবিংশতি বৎসরের কালো অন্ধকার
কিছু নাহি কমে তবু।

কৃষ্ণা কালো মেয়ে—
কিন্তু তার মুখ চোখ রূপসীর চেয়ে
সুগঠিত, পটোলের মত চোখ দুটী
টানা টানা ভাসা ভাসা ঠিক যেন ফুটি
উঠিয়াছে মুখে তার ইন্দীবরশোভা
অনিন্দিত ঢল ঢল শিল্পী মনোলোভা,
ক্ষীণ বিষাদের হাসি শুক্লা পঞ্চমীর
ব্রীড়ান্বিত কমনীয়, স্বভাবে সুস্থির
যৌবনের অকৃপণ দানে।

অহর্নিশ
প্রতিবেশিনীরা ঢালে মুখে মুখে বিষ,
বলে, 'বীজ রাখিয়াছে এ সোমত্ত মেয়ে!'
কেহ বলে, 'নেকাপড়া সহবেতে পেয়ে
হয়ে গেছে খিবিশ্চান!'
হল বহুবার
যাওয়া আসা সাজাগোজা মেয়ে দেখাবার
প্রশ্নোত্তর বিড়ম্বনা; হেঁট মুখ করি
যত সে থাকিতে চায় চিবুকেতে ধরি
অভিভাবকেরা তত তুলিয়া দেখায়,
নতমুখী কুমুদিনী লাজে মরে যায়
দ্বাদশ সূর্য্যের তেজে। কালোমুখখানি
আরো কালো হয়ে যায়, প্রসাধন দানি
হয় না উজ্জ্বল কিছু।
তারা চলে যায়—
অনাদৃতা কালো মেয়ে সরমে শুকায়—
মরমে মরিয়া যায় অবহেলা পেয়ে,
ধনহীনা জননীর রূপহীনা মেয়ে—
সামান্যা সবার চোখে অসামান্যা নারী
দেখার শোনার দুঃখ সহে প্রতিবারই
নিরুপায় অসহায় মার মুখ চেয়ে—
নিজেরে করিয়া তুচ্ছ অমূল্য সে মেয়ে—
মায়ের চোখের মণি।
সে দিনো তেমনি
আসিল কে অকস্মাৎ, পড়িল অমনি
মেয়ে-দেখাবার পালা; মেয়ে বলে মায়ে,
গোপনে, সজলচক্ষু, ধরি দুটী পায়ে,
"আমারে রাখিয়া দাও তোমার সেবায়
আরাল্য বিধবা ঘরে যতটুকু পায়
ততটুকু স্থান দিয়া।"
শিরে হাত রাখি
বক্ষে জড়াইয়া নিয়া চুম্বনেতে ঢাকি
সে করুণ মুখখানি কহে তারে মাতা,
"ও কথা বলিতে নাই" স্নেহে অশ্রুস্নাতা
জননী মমতাময়ী, "সে দিন স্বপনে
স্বর্গগত পিতা তব মধুর বচনে
আমারে বলেন—'দ্যাখো, কৃষ্ণা সুখী হবে
সোনার সংসার গড়ি গৃহিনী-গৌরবে
পরিপূর্ণ চরিতার্থ সুপবিত্র সুখে
বিবাহিত জীবনের'।" শুনি, তার মুখে
অপূর্ব্ব লাবণ্য ফুটে, আশার অঞ্জন
কে যেন মাখালো চোখে নয়নরঞ্জন
নবীন লাবণ্য-লেখা।
কারেরীর স্বামী
রমানাথ, ট্রেণ হতে আসিয়াছে নামি,
এই মাত্র তারে লয়ে বাল্য বন্ধু তা'র,
কালো মেয়ে জেনে শুনে তবু দেখিবার
আগ্রহ অপরিসীম, সরোজেশ নাম,
কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক, ধাম
স্বনির্ম্মিত কাশীধামে।
পিতা পক্ষাঘাতে
পড়িয়া শয্যায় তার, জননীও বাতে
সকল সামর্থ্যহীন।
সুস্থ সুপুরুষ
সুন্দর প্রশান্ত মূর্ত্তি ললাটে পৌরুষ,
বলিষ্ঠ বিশালবক্ষ। সমীক্ষার ক্ষণে
কহিল কৃষ্ণারে ডাকি স্নেহার্দ্র বচনে,
"আমি আসিয়াছি আজি দেখিতে তোমারে,
পরীক্ষা করিতে নয়। রমা তো আমারে
বলেছে তোমার কথা, সব শুনিয়াছি,

মণিমালা

বিভূতি চৌধুরী

হেমন্তের রাত
নিঃশব্দে উঠিল কাঁপি যেন অকস্মাৎ—
যখন আমার পাশে এসে দাঁড়াল সে ছায়ার মতন,
সমস্ত পৃথিবীখানি ঘুমে অচেতন ;
বাহিরে উড়িয়া গেল পাখা নাড়ি' একটি বাদুড়,
কুয়াশায় কেঁপে কেঁপে বাজে তা'র সুর।
সেই ছায়া—দাঁড়াল সে
মোর পাশে এসে
একেবারে হৃদয়ের সীমানার কাছে—
মনে হল চোখে তা'র অনেক জিজ্ঞাসা যেন আছে ;
দেহেতে বুকেতে মোর নেমে আসে ভয়,
হেমন্তের মাঝ-রাতে সে এক বিস্ময়।
আকাশে পাণ্ডুর চাঁদ জাগে,
দক্ষিণ সমুদ্রে এসে স্পর্শ তা'র লাগে।

আমি চেয়ে দেখিলাম সেই ছায়া—সোনার শরীর,
আমার শয্যার পাশে। মানুষের ভিড়
কিছু নাই এ দুপুর রাতে মোর ঘরে,
হেমন্তের ধূসরতা নেমে আসে ক্লান্ত তা'র স্বরে।
আমারে চিনিতে পার ? ধীরে কহিল সে,

কুয়াশার মত ঠাণ্ডা বিছানায় উঠিলাম বসে
চেয়ে তা'র সেই মুখ সেই চোখ জিজ্ঞাসায় ভরা—
মৃত স্বপ্ন জাগে বুকে, স্পষ্ট তবু নাহি দেয় ধরা।
আমার চোখেতে শুধু নির্ব্বাক উত্তর।
আবার কাঁপিল তার স্বর :

এক দুই তিন চার—অনেক বছর তুমি একা
ঘুমায়েছ এই ঘরে, তোমার পাইনি আমি দেখা—
হৃদয়ে নেমেছে ব্যথা, দুই চোখে জল,
জানিতে এলাম আজ তোমার কুশল।
দিনে মোরে চিনিবে না, জেগে উঠি রাতের কবরে—
একটি ঝলক এল হিমেল বাতাস রুদ্ধ ঘরে।
তা'রপর কিছুক্ষণ স্তব্ধ নীরবতা,
আবার বাজিল কানে কথা :
নির্ব্বাক বিস্ময় কেন চোখে তব—আমি তো মানবী
তোমার সে মণিমালা, নহি ছায়াছবি।

রাখিতে গেলাম আমি হাতে তা'র হাত,
কোথায় মিলাল সেই ছায়া অকস্মাৎ।
এত মুঠো সাদা জ্যোৎস্না পড়ে আছে জানালার পাশে
চামচিকে বাদুড়ের স্বর কানে আসে,
ঘুমন্ত এ পৃথিবীরে মনে হয় স্বপ্নের কবর—
কোথা গেল মণিমালা, কোথা তা'র স্বর !
কি যে কথা কেঁদে মরে হেমন্তের রাতের বাতাসে,
কোন ফুল ঝরে গেছে—গন্ধ তা'র আসে
আমার নিঃসংগ ঘরে। চাঁদ ডুবে যায়
দূরের দিগন্ত পারে ; আমার শয্যায়
নেমে আসে নীরবতা—পৃথিবী নিঃসাড়,
সাদা মেঘে জমে উঠে কুয়াশায় শবের পাহাড়।
তা'রা শুধু দুচোখের ঘুম কেড়ে লয়,
স্বপ্ন— মৃত্যু—মণিমালা—
এ জীবন—সে এক বিস্ময়।

অর্থসচিবের মতে বাংলাব বাজেটের এই শোচনীয় অবস্থা হয়েছে দু'টী কারণে: (১) গত মহাযুদ্ধের ফল, (২) কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে প্রাদেশিক সরকারের অর্থসংক্রান্ত বর্ত্তমান বিধিব্যবস্থার অন্তর্নিহিত অযৌক্তিকতা। কারণগুলি সত্যই এই বলে আমরা কিন্তু মনে কবি না। বরং আমরা মনে করি, নিজেদের অজস্র গলদ অপব্যয় দুর্নীতি দূর করে নিজেদের ঘর আগে ঠিক করে না নিযে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে বাংলা সরকারের আর্থিক সাহায্য চাইবার কোন নৈতিক অধিকারই নেই। বাংলা সরকারেব গত ক'বছরের আয়ব্যয় ও কার্য্যাবলীর একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা দিচ্ছি, তা থেকেই আমাদেব কথাব মানে পরিষ্কার হবে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা প্রথম থেকেই স্মবণ রাখা দরকার। ১৯৩৭ সালে নূতন শাসনতন্ত্র চালু হওয়ার সময় থেকে বর্ত্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাতে মুস্‌লিম লীগ মন্ত্রীসভা প্রায় একটানাভাবেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে,—মধ্যে শুধু ১৯৪১এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৩এর এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাতে প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা ছিল এবং ১৯৪৫-৭৬ সালে কিছু মাস ধ'রে তিরেনব্বুই ধারার শাসন চালু ছিল। কিন্তু সে আর কতটুকু সময। প্রকৃতপক্ষে প্রায় গত দশ বছর ধ'রেই বাংলাশাসনের দায়িত্ব লীগের হাতে রযেছে। সুতরাং বাংলার বর্তমান ঘুণধবা অর্থনৈতিক কাঠামো, জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে মান ও মূল্যবোধের দ্রুত অবনতি, এই সমযটা ভ'রে ক্রমবর্ধমান অন্যায়, অত্যাচার ও কেলেঙ্কারী,—এ সব কিছুর দায়িত্বই বাংলার মুসলীম লীগেব।

রাজস্বের অপব্যয়

প্রথমে রাজস্বের ব্যাপারটা ধরা যাক্। যুদ্ধের পূর্ববর্তী বছর ১৯৩৮-৩৯ সালে বাংলায় রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল ১২ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা, আর ১৯৪৭-৪৮ সালে রাজস্ব থেকে আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৭ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা,—অর্থাৎ যুদ্ধপূর্ব আয়েব প্রায় চারগুণ। কিন্তু ১৯৩৮-৩৯ সালে যেখানে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১২ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা, ১৯৪৭-৪৮ সালে সেখানে ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িযেছে ৫৩কোটি ৮৮ লক্ষ টাকায় অর্থাৎ চারগুণেরও বেশী। বাংলা সরকাবের আযের চেয়ে ব্যয়ের পরিমাণ বছর বছর বেড়েই চ'লছে। এ কথা ভুলে গেলে চল্‌বে না, প্রাদেশিক স্বাযত্তশাসনেব প্রথম বছবেই (১৯৩৭-৩৮) বাংলার বাজেটে উদ্বৃত্ত তহবিল ছিল। তারপর থেকেই লীগের হাতে ক্ষমতা আসে এবং বাজেটে ঘাট্‌তির পরিমাণ বেড়ে বেড়ে বর্ত্তমান বছরে বারো কোটিতে এসে ঠেকেছে। এ রকমটা কেন হ'ল?

গত ক'বছরের বাংলার বাজেট্‌গুলি একটু তলিয়ে লক্ষ্য কবলেই চোখে পড়্‌বে যে সরকারের রাজস্বের এই বিপুল বৃদ্ধিব টাকাটা কোন জাতিগঠনমূলক কার্য্যের পেছনে খরচ কবা হয় নি। টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হযেছে। সাম্প্রদায়িক ও দলগত স্বার্থ-সাধনার্থ একটা বিশেষ সম্প্রদায় ও দলের লোকদের জন্য কেবলই চাকুরী ও 'কন্‌ট্র্যাক্‌ট'এব ব্যবস্থা করাব পেছনে, একান্ত সাম্প্রদাযিক শাসনব্যবস্থারই অনিবার্য্য অংশস্বরূপ বহুবিধ দুর্নীতিকে প্রশ্য দিতে গিয়ে এই বিপুল বর্দ্ধিত রাজস্বের টাকা জলেব মত বেরিয়ে গেছে। বাজেট্‌গুলির পর্যালোচনা করলে এও দেখা যায যে নূতন কোন দিক্ দিয়ে আযবৃদ্ধির আব পথ নেই—ট্যাক্সবসানোর নূতন আর রাস্তা নেই (অর্থাৎ একান্ত অন্যায় না ক'বে)। আগে যে সব ট্যাক্স্ ছিল, তা ছাড়াও ইতিমধ্যে কৃষি-আয়কর, বিক্রয় কর, মটর স্পিরিট্-বিক্রয়কর। কাচা পাটের উপর কর প্রভৃতি অনেক নূতন ট্যাক্স্ বসানো হযেছে। বিভিন্ন ট্যাক্স থেকে আয়ের পরিমাণ বর্ত্তমানে ১৯৩৯-৪০ সালের তুলনায় প্রায় আড়াই গুণ হ'য়েছে। এই বর্দ্ধিত ট্যাক্সের আয়েরও কি সদ্গতি হয়েছে?

১৯৪০ সালে ভূমি-রাজস্ব কমিশন মন্তব্য করে গিছলেন যে, অবস্থা বিবেচনায় দবকার হলে কৃষি-আয়কব ধার্য্য কর যেতে পারে; কিন্তু সে ক্ষেত্রে ঐ কর বাবদ প্রাপ্ত সব টাকাই কৃষির উন্নতির পেছনেই খরচ করতে হ'বে। বাংল

সরকার অবশ্য কখনও তা করেননি। অন্যান্য খাতে পাওয়া টাকারও একই হাল হয়েছে।

গত ক'বছর ধরে বাংলায় পুলিশ, দুর্ভিক্ষ, 'বিবিধ' প্রভৃতি খাতে খরচের অঙ্ক বেড়েই চলেছে, অন্যদিকে শিক্ষা, জন-স্বাস্থ্য, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি জাতিগঠনমূলক বিভাগকে শুকিয়ে মারা হচ্ছে। শেষোক্ত খাতে ১৯৩৯-৪০ সালে মোট ব্যয়ের শতকরা ২৩'৭ ভাগ খরচ করা হ'ত, আর বর্ত্তমান সালে (১৯৪৭-৪৮) খরচ করা হচ্ছে ২০'৬ ভাগ। অন্যদিকে, পুলিশ প্রভৃতি খাতে ১৯৩৯-৪০ সালে খরচ করা হ'ত মোট ব্যয়ের শতকরা ১৯'৭ ভাগ, আর বর্ত্তমান বছরে খরচ করা হচ্ছে শতকরা ২৮'৯ ভাগ। এ প্রসঙ্গে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, 'উন্নয়ন' খাতে বাংলা সরকার এ পর্য্যন্ত যে টাকা খরচ করেছেন, তার সবটাই কেন্দ্রীয় সরকারের,—সুতরাং তা বাংলার হিসাবে ধরা হয়নি। শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি বিভাগকে এমনি ক'রে উপেক্ষা ক'রে পুলিশ প্রভৃতির খাতে এমনি বেপরোয়াভাবে খরচ বাড়ানোর দৃষ্টান্ত ভারতের অন্য কোনও প্রদেশে মিলবে না।

নিমেয়ার সিদ্ধান্তের অজুহাত

লীগ গবর্ণমেণ্ট্ গত যুদ্ধকে আর নিমেয়ার সিদ্ধান্তকে বাংলার এই আর্থিক দুরবস্থার জন্য দায়ী ক'রে থাকেন। আসলে, সত্যিকার কারণগুলোকে ঢাকবার জন্যই ও সব কারণের দোহাই পাড়া হয়। পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, ও দু'টো কারণের একটাও এই দুর্গতির জন্য প্রধানতঃ দায়ী নয়। নিমেয়ার সিদ্ধান্তের ফলাফল সকল প্রদেশের উপরই প্রায় একরূপ হয়েছে। বরং ঐ সিদ্ধান্তে যে যে প্রদেশের সুবিধে হয়েছে, বাংলা তাদের অন্যতম। বোম্বাই আর মাদ্রাজ তো কিছুই পায়নি। ঐ সিদ্ধান্তের ফলে বাংলা পেয়েছে: (ক) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন-প্রবর্ত্তনকালে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বাংলার ঋণ ছিল ৯ কোটি টাকা, সেটা রহিত করা হয়েছে এবং তার ফলে বাংলার বছরে ৩৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকছে; (খ) পাটশুল্কে বাংলার অংশ শতকরা ৫০ ভাগ থেকে ৬২½ ভাগ করা হয়েছে; ১৯৩৬-৩৭ সালের হিসাবমতে ওর ফলে বাংলার আয় বছরে ৪২ লক্ষ টাকা বেড়েছে; তা ছাড়া, (গ) আয়করেও অন্য সব প্রদেশের মত বাংলাকেও অংশ দেওয়া হয়েছে। বরং একটু বেশীই দেওয়া হয়েছে। সমগ্র আয়ের শতকরা ২০ ভাগ বাংলা থেকে আসে না, তবু সম্ভবতঃ বাংলার বিপুল লোকসংখ্যা বিবেচনায় তাকে কেন্দ্র কর্তৃক বিভিন্ন প্রদেশের দেয় অর্থের শতকরা ২০ ভাগ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং নিমেয়ার সিদ্ধান্তে বাংলার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে, এ কথা বলা চলে না। তা ছাড়া, এও লক্ষনীয় যে বাংলার সমগ্র পাটশুল্ক এবং আয়কর-ভাণ্ডারে তার দেয় অর্থের সবটাও যদি বাংলা পায় তবু তার বর্ত্তমান বাজেট-ঘাটতি পূরণ হবে না। কারণ, ঐ দুই খাতে ১৯৪৬-৪৭ সালে বাংলা পেয়েছে ৭।৮ কোটি টাকা, এবং ১৯৪৭-৪৮ সালে পাবে ৯½। ১০½ কোটি টাকা। অথচ, বাজেট্ ঘাটতির পরিমাণ ১৯৪৬-৪৭ সালে হচ্ছে ১৩ কোটি টাকা এবং ১৯৪৭-৪৮ সালে হচ্ছে ১২ কোটি টাকা।

যুদ্ধের অজুহাত

যুদ্ধের অজুহাতের আড়ালেও বাংলা সরকার পার পেতে পারেন না। মুদ্রাস্ফীতি এবং যুদ্ধের অন্যান্য কুফল শুধু বাংলাতে দেখা দেয়নি, সারা ভারতেই তা হয়েছে। পূর্ব রণাঙ্গণের নিকটবর্তী ঘাঁটি ছিল ব'লে বাংলার ক্ষতি সব চেয়ে বেশী হয়েছে, এ যুক্তির উত্তরে বলা চলে, আসাম তো রণাঙ্গণের আরও অনেক কাছে ছিল, তবু দেখা যাচ্ছে যুদ্ধশেষে তার আর্থিক অবস্থা বিপর্য্যস্ত তো হয়ই নি, বরং উন্নয়ন-খাতেও সে বেশ কিছু টাকা খরচ করতে সমর্থ হচ্ছে। যুদ্ধের পেছনে বাংলাকে অনেক খরচ করতে হয়েছিল, এ যুক্তিও আর টেকে না। কারণ ঐ খরচের কিছুই বাংলা সরকারের পকেট্ থেকে যায়নি; হয় ব্রিটীশ

গভর্ণমেণ্ট নয় তো কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ও খরচটা বহন করেছেন।

বাংলার আর্থিক অবস্থার প্রসঙ্গে আর একটা বিশেষ অর্থপূর্ণ ব্যাপার স্মরণীয়। স্বায়ত্ত-শাসন চালু হওয়ার সময় থেকে ১৯৪৭-৪৮ সাল পর্য্যন্ত মোট বাজেট্-ঘাটতির পরিমাণ হচ্ছে ২২ কোটি টাকা, আর এ কয় বছরে বাংলা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে দুর্ভিক্ষ বা সাহায্য বাবদ ঐ পরিমাণ টাকাই পেয়েছে! মন্তব্যের আর দরকার আছে কি?

বাংলার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে অধিকতর উদ্বেগের কারণ এই যে ব্যয়-বৃদ্ধি যে অনুপাতে হয়েছে, জনহিতকর কার্য্যে ব্যয়বৃদ্ধি সেই অনুপাতের বেশী হয়নি। ব্যয়-বৃদ্ধি তো তিনগুণেরও বেশী হয়েছে। পুলিশ, দুর্ভিক্ষ, বিবিধ এবং অতিরিক্ত চার্জ্জ ইত্যাদি খাতে ব্যয়ের দরুণই জাতিগঠন-মূলক ও সমাজসেবামূলক বিভাগগুলোর পেছনে যথোপযুক্ত ব্যয় সম্ভব হয়নি'। সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি, তজ্জনিত দাঙ্গা-হাঙ্গামার ক্রমপ্রসার, শাসনকার্যে বহুমুখী দুর্নীতি, এসবই হচ্ছে পুলিশ প্রভৃতি খাতে ব্যয়-বৃদ্ধির কারণ। বাংলা গবর্ণমেণ্টের সাম্প্রতিক ক'বছরের ব্যয়ের সঙ্গে পূর্ববর্তী ক'বছরের ব্যয়ের এবং অন্যান্য প্রদেশের ব্যয়ের তুলনা করলে তা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ হ'বে। খরচ বেড়ে গেছে প্রধানতঃ বহুপ্রকারের দুর্নীতির জন্যই। যেখানে সম্ভব, মুসলমানকে কনট্রাক্ট দেওয়াই গবর্ণমেণ্টের নীতি। মুসলমানদের পক্ষে এজন্য কোন নির্দিষ্ট ষ্ট্যাণ্ডার্ডেরও বড় একটা প্রয়োজন হয় না। লীগ মন্ত্রীরা নিজেরা পর্য্যন্ত সব কনট্রাক্টের ভাগবাঁটোয়ারাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে থাকেন। কাপড়ের কলের যন্ত্রাদি এবং চিনি প্রস্তুতের যন্ত্রাদি বণ্টন, জনসাধারণের ব্যবহার্য ও শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বহু কাঁচা মাল নিয়ন্ত্রণ, এসব গবর্ণমেণ্টই নিজ হাতে নিয়েছেন। এই ক্ষমতা লীগ গবর্ণমেণ্ট বহুক্ষেত্রেই নিছক দল বা আত্মীয়-পোষণ কার্যে নিরঙ্কুশভাবে ব্যবহার ক'রে দুর্নীতির দ্রুত প্রসারে সাহায্য করেছেন। বাংলার অসামরিক সরবরাহ বিভাগের দুর্নীতি তো প্রায় প্রবাদবাক্যে পরিণত হ'তে চলেছে।

বাংলা সরকারের নিছক সাম্প্রদায়িক নীতির ফলে শুধু ১৯৪৬-৪৭ সালেই টাকা খরচ হয়েছে: (ক) দুর্ভিক্ষ সাহায্য —৫ কোটি ৫০ লক্ষ; (খ) দাঙ্গাসংক্রান্ত ব্যয়—২ কোটি ৩৮ লক্ষ; (গ) সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির জন্য পুলিশ খাতে অতিরিক্ত ব্যয়—১ কোটি—অর্থাৎ মোট প্রায় ৯ কোটি টাকা। সমগ্র শাসনব্যবস্থায় অযোগ্যতা ও দুর্নীতির ফলে কি পরিমাণ খরচ বেড়েছে, তার হিসাব দেওয়া একরূপ অসম্ভব। কারণ বহু বিভাগেরই ঐ একই হাল। ঐভাবে অপব্যয়ের পরিমাণও হবে অনেক। ১৯৪৬-৪৭ সালে অতিরিক্ত চার্জ্জ্ খাতে যে ১০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, তার মধ্যে অন্ততঃ ৭।৮ কোটি টাকা ব্যক্তিস্বার্থ, দুর্নীতি, অব্যবস্থা এবং কর্ম্মচারিদের অযোগ্যতার দরুণ খরচ হয়ে গেছে। খাদ্যশস্যের ক্ষতি বাবদও এ টাকার একটা মোটা অংশ খরচ হয়ে গেছে।

শাসন পরিচালনার ব্যয়

বাংলার সাধারণ শাসনকার্য পরিচালনের খরচও অস্বাভাবিক রকমের বেশী। দু'একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে। ১৯৪৫-৪৬ সালে দুর্ভিক্ষের খাতে মোট ৩,৩০,৯২,৫৭০৲ টাকা মঞ্জুর করা হয়। সে টাকা খরচ হয় এভাবে:

১।	বেতন ও দপ্তর খরচা	—	২,১৩,৪৭,৭৯৪৲
	(তন্মধ্যে বাজে খরচ	—	১,৫০,২৮,১৮৯৲)
২।	গ্র্যাটুইটী রিলিফ্	—	৬৪,৬৫,১২৫৲
৩।	বিবিধ	—	১১,২৮,৭৬৩৲
৪।	পুনর্বসতি-কার্য বাবদ	—	৪১,৪০,৮৩৪৲
	(তন্মধ্যে অফিসারদের বেতন দপ্তর-খরচা, ভাতা, বাজে-খরচ ইত্যাদি		২৬,৮০,৯৪৬৲)
৫।	ইংলণ্ডের চার্জ	—	১০,০৩৭৲
৬।	বিনিময়কালে ক্ষতি	—	১৭৲
	মোট		৩,৩০,৯২,৫৭০৲

উপরের হিসাব থেকে দেখা যায়, ৬৪ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা গ্র্যাটুইটী-সাহায্য বিতরণের জন্য কর্ম্মচারী প্রভৃতির

তার সারাংশ এই: কালেক্টারদের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে খয়রাতী দান ও টেষ্ট-রিলিফের কাজে যে খরচ হ'য়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বিল মাত্র পেশ করা হয়েছে, ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়নি। গবর্ণমেণ্টের অনুমতি মিলবে এটা অনুমান করে নিয়েই কোন কোন ক্ষেত্রে জরুরী ক্ষমতাবলে ট্রেজারী থেকে টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। মোট খরচের একটা প্রকাণ্ড অংশেরই বিস্তারিত হিসাব মেলেনি। আগের কয়েক বছরে ঐভাবে তোলা অর্থের খানিকটা অংশেরও হিসাব দেখানো হয়নি। মেদিনীপুর ও অন্যান্য বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে খয়রাতী দানে ব্যয়িত ১৪,৩৫,১৫৯৲ টাকার বন্টন-সার্টিফিকেট পেশ করা হয় নি। কয়েকটী জেলার দুর্ভিক্ষ-রিলিফের হিসাব স্থানীয়ভাবেও পরীক্ষা করা যায় নি,—কারণ টাকা খরচের এক বছর পরও তার হিসাব তৈরী হয় নি। অন্য কয়েকটী জিলারও দুর্ভিক্ষ-রিলিফের হিসাব পরীক্ষায় দেখা গেছে, হাজিরার খাতা, ক্যাস্-বই ও মজুত মালের হিসাব হয় রাখা হয় নি, নয় তো অত্যন্ত ত্রুটীপূর্ণভাবে রাখা হয়েছে। মাইনের খাতায় বহু ক্ষেত্রে প্রাপকের নাম সই বা টিপসই কিছুই নেই, কোথাও বা টাকার অঙ্ক নতুন ক'রে লেখা হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণ অব্যয়িত বাড়তি টাকা ট্রেজারীতে জমা না দিয়ে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কর্ম্মচারীরা হাতে রেখে দিয়েছেন। কালেক্টারদের আদেশ ছাড়াই বন্টনকারী অফিসারদের প্রচুর নগদ টাকা আগাম দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের ব্যয়ের কোন হিসাব দাখিল করা হয় নি।

১৯৪২-৪৩ ও ১৯৪৩-৪৪ সালে অসামরিক সরবরাহ বিভাগের আয়ব্যয়ের মধ্যে যে সব মারাত্মক গোলমাল ধরা পড়েছে, সে সম্পর্কে উক্ত ১৯৪৫ সালের অডিট্-রিপোর্টের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। নগদ টাকা ও মজুত মালের যে হিসাব দেখানো হ'ত, তা অনেক ক্ষেত্রেই অত্যন্ত অসন্তোষ-জনক ও অসম্পূর্ণ। নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে গুদামের মাল ও নগদ টাকাকড়ির হিসাব কচিৎই দেখানো হ'ত। মালের ঘাটতির ব্যাপারে মাল-চলাচলকালে ঘাট্‌তি হয়েছে, না কোন সরকারী কর্মচারীর গাফিলতি সেজন্য দায়ী, বহু ক্ষেত্রেই সে সম্পর্কে কোন তদন্তই করা হয় নি'। অন্যান্য স্থান থেকে প্রাপ্ত খাদ্যের পরিমাণ কোথাও কোথাও শুধু থলিয়ার সংখ্যা দিয়েই স্থির করা হয়েছে, মাল ডেলিভারী নেওয়ার কালে থলিয়াগুলি ওজন না করে দেখেই। কলিকাতা এবং জেলাগুলোর গুদামসমূহ খুব কম ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা করা হ'ত। তার ফলে মজুত মালের হিসাব যা-ও রাখা হ'ত, তা শুধু নামে মাত্র। কারণ মজুত মালের মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা ক'রে দেখে ঠিকমত হিসাব রাখার ব্যবস্থা ছিল না। এরকম ব্যবস্থার ফলে ক্ষতির পুরো বিবরণ তখনই শুধু প্রকাশ পেত, যখন বাজারে খাদ্যশস্যের লেনদেন হঠাৎ একেবারে বন্ধ হয়ে যেত এবং সরকারী এজেন্টদের গুদামের মাল নিঃশেষ হয়ে যেত। ঐরকম ঘাট্‌তি ধরা পড়ে গেলে বহু স্থানে দেখা গিয়েছে, তার পরিমাণ সাংঘাতিক রকমের বড়,—কোথাও শতকরা ২২৫ ভাগ পর্য্যন্ত। তা ছাড়া, মজুত মাল বাংলার একস্থান থেকে অন্য স্থানে চালান দেওয়ার ব্যাপারে, প্রেরক বা যার কাছে তা পাঠানো হত, তারা কেউই অধিকাংশ সময়ে চালান কালে মালের কোন ক্ষতি হ'ল কিনা এবং হয়ে থাকলে তার স্বরূপ কি তা ঠিক ধরবার চেষ্টা করেন নি। দু' এক জায়গায় তা ধরবার চেষ্টা করাতে ফল যা জানা গিয়েছে, তা অতি বিস্ময়কর। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কলিকাতা থেকে নৌকা-যোগে প্রহরাধীনে ঢাকা বিভাগের কোন জেলায় যে চাউল ও ধান পাঠানো হয়, তার ঘাটতির পরিমাণ হচ্ছে শতকরা ৮ ভাগ থেকে ২৭ ভাগ। এক ক্ষেত্রে ২১০০ মণ ধান পাঠানো হয়, কিন্তু মাত্র ১৫৩১ মণ ২৭ সের গন্তব্যস্থানে গিয়ে পৌঁছে। এরকম শত শত স্থানে ঘটেছে তা ছাড়া, এ রকমও ঘটেছে যে, যে শ্রেণীর (quality) জিনিষ পাঠানো হ'ল বলে জানানো হয়েছে, জিনিষ গিয়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছুলে দেখা গেছে, তা অনেক নিকৃষ্ট রকমের মাল। দোষীকে বের করবার জন্য উক্ত

অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে ২৫টি ইউরোপীয় আসন মিলিত হয়ে বাংলায় সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসন কায়েম করে রেখেছে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রদেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও সম্প্রদায়কে একেবারে ধ্বংস করা। ক্ষমতার সুযোগে লীগ গবর্ণমেণ্ট বাংলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর এভাবে অত্যাচার চালাচ্ছে যে তাদের নিরাপত্তাবোধ একেবারে ঘুচে গেছে। ক্ষমতা হস্তান্তর সম্বন্ধে বৃটিশ সরকারের সাম্প্রতিক বিবৃতির ফলে উক্ত নীতি অধিকতর নিরঙ্কুশ হয়েছে। শিক্ষা ও রিলিফদান সম্পর্কে আরও দু'চারটে তথ্য ও ঘটনার উল্লেখ করলেই আমাদের বক্তব্যটা আরও পরিষ্কার হবে।

টোল হচ্ছে হিন্দুদের প্রাচীনপন্থী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। তেমনি মক্তব, মাদ্রাসা, ইসলামিক-ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ প্রভৃতি হচ্ছে মুসলমানদের প্রাচীনপন্থী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ১৯৩৮-৩৯ সালের বাজেটে এদের এভাবে সাহায্য দেওয়া হয়েছিল :

টোলসমূহ (৮১৭)	—	৪৫৭৪৬৲

(এর মধ্যে গবর্ণমেণ্ট দিয়েছেন মাত্র ৭৪২০৪ আর বাকীটা মিউনিসিপ্যালিটী ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডসমূহ থেকে পাওয়া গেছল।)

পক্ষান্তরে,

১।	মাদ্রাসা (৭৬৪)	—	৫৬৬ ৮৮
২।	মোল্লা ও কোরাণ স্কুল	—	৪৭৬৬৲
৩।	মক্তব (২৪৩৮৮)	—	৪৬৪৪৫৲
৪।	ঢাকা ইসলামিক ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ	—	৪৯৩৭১৲
৫।	চট্টগ্রাম ইসলামিক ইণ্টার কলেজ	—	অজ্ঞাত
৬।	ঢাকা, চট্টগ্রাম ও কলিকাতার ৩টী মুসলিম হাই স্কুল	—	অজ্ঞাত
৭।	সাখাওয়াৎ গার্লস্ স্কুল্	—	অজ্ঞাত
			৭৬৬৭৭২৲
৮।	মাদ্রাসাগুলির জন্য অতিরিক্ত সাহায্য	—	১৮৬৯৩৮৲
		মোট	১৯,৫৩,৭১০০৲

উপরের তালিকার বৈষম্যগুলি এত বেশী করেই চোখে পড়ে যে, আলাদা মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। অধিকাংশ সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই অমুসলমানদের চেষ্টায় গড়ে উঠেছে ও তাদেরই টাকায় চলছে। এখন সেগুলোকেও সাম্প্রদায়িক আওতায় ফেলে গবর্ণমেণ্টের মরজীপালনে বাধ্য করা হচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গঠিত ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল-বোর্ডের অধীন। মুসলমানেরা যে সব এলাকায় সংখ্যাগুরু সেখানে সংখ্যালঘুদের পৃথক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা নিষিদ্ধ হয়েছে। ফলে সে সব অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো মক্তবে পরিণত হয়েছে এবং অমুসলমানদের সেখানে পড়তে বাধ্য করা হচ্ছে। ১৯৪১ সালের ১৭ই মার্চ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদে এই হিসাব দেওয়া হয়েছিল :

বৎসর	প্রাঃ বিদ্যালয়	ছাত্র	মক্তব	ছাত্র
১৯৩৬-৩৭	৩৫৪১৮	১১৭৮০৯	৬৫৪৮	২০৩০৮২
১৯৩৬-৩৭ :	৩৫৭৭৮	১৪৭৮৬৮৮	৩৫৭৩৯	৯৮১৮১৯

১৯৪০ সালেই মক্তবসমূহে হিন্দুছাত্রদের সংখ্যা ছিল ৭৪০০৬ (ব্যবস্থা-পরিষদে প্রশ্নোত্তরপ্রসঙ্গে মিঃ ফজলুল হক বলেছিলেন)। তারপর ঐ সংখ্যা আরও বেড়েই থাকবে। এখন, এ ব্যাপারটা হিন্দুদের সংস্কৃতি ও সাধারণ স্বার্থের পক্ষে একান্ত আপত্তিকর না হয়ে পারে না। কারণ এসব মক্তবে শুধু যে কোরাণের নির্দেশ প্রভৃতি ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হয় তা নয়, নামাজ, কোরবাণী প্রভৃতি মুসলমান-শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদিও শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। তা ছাড়া, মক্তবসমূহে সাধারণতঃ এমন সব বই পাঠ্য করা হয়ে থাকে, যাতে ইতিহাস ও বাংলাভাষাকে বিকৃত করা হয়েছে এবং অমুসলমানদের আঘাত লাগতে পারে এমন সব জিনিষ রয়েছে। দু'একটা দৃষ্টান্ত দেই :

(ক) মোহাম্মদ মোবারক আলি প্রণীত 'মক্তব-মাদ্রাসা সাহিত্য (১ম ভাগ) : 'পাক কোরাণের সকল কথা একমাত্র সত্য ধর্ম।... কোরাণ শরীফ পড়িলে সওয়াব হয়, মন পবিত্র থাকে...বাটীতে কোরাণ শরীফ পাঠ করিলে বালামসিবত কাটিয়া যায়।'

(খ) খান বাহাদুর কাজী ইস্‌মাইল 'ক বি-টি প্রণীত 'প্রবন্ধমালা': "প্রথম লোকমা মুখে তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের তরবারির আঘাতে মেহমানের ছিন্ন মস্তক দস্তরখানে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল।"

(গ) মৌলবী আব্দুল সাত্তার প্রণীত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (মক্তবের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ও জুনিয়ার মাদ্রাসার পাঠ্য): "আওরঙ্গজেব অতিশয় নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। ইসলাম ধর্ম্মের প্রতি সম্রাটের এইরূপ অনুরাগ দেখিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সংঘবদ্ধভাবে সমস্ত রাজ্যবাসী হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে ও ইসলাম ধর্ম্মের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার কুৎসা রটাইতে আরম্ভ করে সম্রাট আওরঙ্গজেব প্রজাসাধারণের উন্নতিকল্পে সর্ব্বশুদ্ধ ৮০ প্রকার ট্যেক্‌স উঠাইয়া দিয়া কেবলমাত্র জিজিয়া ও যাকাত এই দুইপ্রকার কর আদায় করিতেন।" ইত্যাদি।

মাধ্যমিক শিক্ষাবিল

মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির উপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের কুক্ষিগত করবার উদ্দেশ্যে লীগ গবর্ণমেণ্ট ১৯৪৩ সালে প্রথম কখ্যাত মাধ্যমিক শিক্ষা-বিল উত্থাপন করেন। বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর এই প্রচণ্ড আক্রমণের বিরুদ্ধে বাঙ্গালার প্রতিবাদ এত শক্তিশালী হয়েছিল যে ঐ বিলই একাধিক মন্ত্রীসভার পতনের কারণ হয়। 'কং মেজরটীর' জোরে শীঘ্রই অনুরূপ একটী বিল পাশ করিয়ে নেবেন বলে লীগ মন্ত্রীসভা দৃঢ় সঙ্কল্প জানিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থসাহায্যের ব্যাপারেও অনুরূপ মনোবৃত্তির ক্রিয়া সুস্পষ্ট। গত বাজেটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হয়েছে: পৌনঃপুনিক মঞ্জুরীকৃত—৫১৭৩৪৬৲, পৌনঃপুনিক প্রাপ্ত—৫৫০০০০৲, এককালীন মঞ্জুরীকৃত—২২২০০০৲। অন্যদিকে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাধীন অঞ্চল অনেক বড় হলেও তাকে দেওয়া হয়েছে মাত্র: পৌনঃপুনিক ২৫০০০৲ এবং এককালীন—৩০১২০০৲। বিজ্ঞান-চর্চ্চা ব্যবস্থায় সাহায্যের ব্যাপারে লীগ গবর্ণমেণ্টের কীর্ত্তির উল্লেখ আগেই করেছি।

সাম্প্রদায়িক কারণে নিয়োগ, পদোন্নতি, উপরের কর্মচারীকে উপেক্ষা ক'রে পদোন্নতি প্রভৃতির সংখ্যা অন্যান্য বিভাগের মত শিক্ষাবিভাগেও এত বেশী যে এখানে তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়।

সাম্প্রদায়িক-করণের অপচেষ্টা

শিক্ষার ব্যাপারে আর একটা সুদূরপ্রসারী বিপদ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া একান্ত দরকার। আগেই বলা হয়েছে, শিক্ষাব্যবস্থার সব এই ইস্‌লামিক পদ্ধতি নামে একটা বিকল্প ব্যবস্থা আছে এবং তার পেছনে প্রচুর টাকা খরচ করা হয়ে থাকে। কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে বাংলার লীগ গবর্ণমেণ্ট সাধারণ শিক্ষাকেও সাম্প্রদায়িককরণে ব্রতী হয়েছেন। সংখ্যালঘিষ্ঠদের অধিকার রক্ষা এবং (গণতন্ত্রের নিয়মানুযায়ী) তাদের জন্য দরকার মত বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করার পরিবর্তে সরকার অমুসলমান ছাত্রদের অসুবিধা করে মুসলমান ছাত্রদের জন্য সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করছেন। দু' চারটা তথ্যের উল্লেখ এখানে করছি।

কতগুলো কলেজ—যেমন ইস্‌লামিয়া কলেজ—শুধু মুসলমানদের জন্যই সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। শুধু ১৯৩৮-৩৯ সালেই এই একটা কলেজের পেছনে সরকার ১৮৩০৯৯ টাকা খরচ করেছেন। সরকারপরিচালিত প্রায় সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এবং সরকারপরিচালিত না হ'লেও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বহু প্রতিষ্ঠানে বাংলার সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের জন্য শতকরা কতকগুলো করে আসন সংরক্ষিত আছে। ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে শতকরা ৬০টী, চট্টগ্রাম কলেজে শতকরা ৫০টী, এবং অন্য যাবতীয় সরকারী আর্ট কলেজে শতকরা ২৫টী আসন মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এই হার শীঘ্রই নাকি শতকরা ৫০এ পরিণত করা হবে। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেও শতকরা ২৫টী আসন সংরক্ষিত আছে। সরকার-পরিচালিত ৩৫টী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৪টীতেই শতকরা ৫০টী আসন মুসলমান ছাত্রদের জন্য রক্ষিত, এবং

অন্যান্য স্কুলগুলোতেও কমবেশী পরিমাণে আসন সংরক্ষিত রয়েছে। এমন কি মুসলমানেরা যে সব জেলাতে বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানেও মুসলমানদের জন্যই আসন সংরক্ষিত।

ছাত্রছাত্রীদের সরকারী বৃত্তি দেওয়া ব্যাপারেও অনুরূপ সাম্প্রদায়িক বণ্টন ব্যবস্থা। মুসলমান ছাত্রাবাস বাবদ বহু টাকা মঞ্জুর করা হয়, কিন্তু অমুসলমানদের জন্য সরকারী সাহায্যের ছিটে ফোঁটাও বড় একটা জোটে না।

দাঙ্গাদুর্গতদের সাহায্যদানে সাম্প্রদায়িকতা

এ বিষয়েও বহু তথ্য ও ঘটনা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। নোয়াখালীর আশ্রয়প্রার্থীরা বাঙ্গালী হ'লেও হিন্দু অন্য দিকে বিহারের আশ্রয়প্রার্থীরা অবাঙ্গালী হ'লেও লীগমন্ত্রীদের স্বধর্মাবলম্বী। এই দুই ক্ষেত্রে সরকারী আচরণে তাই তারতম্যও হয়েছে অত্যন্ত বিসদৃশ রকমে। নোয়াখালী সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থার দু' চারটে দিক্ হচ্ছে এই। আশ্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় বিলম্ব। মাথাপিছু আশ্রয়-প্রার্থীর সপ্তাহে দু'সের ক'রে চা'লের বরাদ্দ—কিন্তু পাওয়া যেত তারও কম,—লবণ এবং মাঝে মাঝে ডাল,—এই শুধু। নোয়াখালী আশ্রয়কেন্দ্রগুলো গত ১৫ই মার্চ্চ তুলে দেওয়ার কথা হয় এবং কংগে'সব পীড়াপীড়িতে ওগুলো আরও অল্প কিছু দিনের জন্য চালু রাখা হয়েছে। অবস্থার উন্নতি না হওয়া সত্ত্বেও আশ্রয়প্রার্থীদের নোয়াখালী ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়। গৃহ নির্ম্মাণের জন্য প্রতি দুর্গত পরিবারকে মাত্র ২৫০৲ টাকা সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। কলিকাতার বিভিন্ন এলাকায় পাইকারী জরিমানা বসানো হয়েছে, কিন্তু নোয়াখালীর দুর্বৃত্তদের ওপর সে রকম কিছু করা হয় নি। টেষ্ট-রিলিফের কাজে ৫০।৬০ হাজার লোককে নিয়োগ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে শতকরা ৯৫জন মুসলমান। অথচ দুর্গতেরা সবাই হিন্দু। হিন্দুদের, বিশেষতঃ হিন্দু নারী ও শিশুদের জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। খয়রাতি সাহায্য তো আগেই বন্ধ করা হয়ে গেছে।

অন্য দিকে, বিহারী আশ্রয়প্রার্থিদের বেলায় তাদের সাহায্যের জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্টের অত্যধিক আগ্রহ: বিহার সরকারের আপত্তি সত্ত্বেও বাংলা সরকার কর্ত্তৃক তাদের প্রতিনিধি মিঃ খানকে বিহার পাঠানো। সে ভদ্রলোক গিয়ে বিহার থেকে মুসলমানদের বাংলায় আসতে প্ররোচিত করা ছাড়া আর কিছু করেন নি। বিহার আশ্রয়প্রার্থিদের মাথাপিছু সপ্তাহে খাদ্যবরাদ্দ হচ্ছে: চাউল ২ সের ১০ ছটাক, ডাল, সরিষার তেল লবণ এবং অন্যান্য খরচ বাবদ দৈনিক তিন আনা। তাদের জন্য দশ হাজার টন খাদ্যশস্য বাঁচাবার জন্য বাংলার অধিবাসিদের রেশান বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের আটা-ময়দা সরবরাহের জন্য আমাদের আটা-ময়দার সঙ্গে বালি মিশানো হচ্ছে। তাদের আশ্রয়কেন্দ্রগুলি তুলে দেওয়ার কথা পর্য্যন্ত কখনো ওঠানো হয় নি। বরং তাদের বাংলায় রাখবার জন্য একান্তভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে। হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম ঘাঁটি গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে তাদের সেখানে জমি দেওয়া হচ্ছে। মিঃ সুরাবর্দ্দীই বলেছেন, তাদের জন্য চাকরীর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাদের জন্য ১৯৪৬ ৪৭ সালের পরিবর্ধিত হিসাবে ৫১ লক্ষ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছে।

এবার প্রবন্ধটীর সমাপ্তি করতে চাই। বাংলা সরকারের গত ক'বছরের সাম্প্রদায়িক বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা, অসাধুতা ও দুর্নীতির ইতিহাস অতি দীর্ঘ। সরবরাহ ও খাদ্যবরাদ্দ ব্যবস্থা এবং সরকারের সাধারণ ব্যবসানীতি এখানে কার্য্যতঃ যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে, তাতে করে দেশ ক্রমশঃ দরিদ্র হয়ে পড়ছে, জনসাধারণের হয়রাণি বেড়ে যাচ্ছে, খাঁটী ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ ক'রে অসাধু ধনী চোরাকারবারীরা তাদের স্থান দখলের সুযোগ পাচ্ছে, ব্যবসাবাণিজ্যে অগ্রসর অমুসলমানদের ব্যবসাক্ষেত্র থেকে কৌশলে উৎখাত করা চলছে। ভূমিসংক্রান্ত আইন সংশোধনের যে চেষ্টা সম্প্রতি

সরকার করছেন, আপাতদৃষ্টিতে তা প্রগতিশীল বলে মনে হয়। কিন্তু লীগ গবর্ণমেণ্টের অতীত ও সাম্প্রতিক কার্য-কলাপ বিবেচনায় সন্দেহ দৃঢ় হয়। তাই আমাদের মনে জাগছে যে, এক্ষেত্রে সরকারের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে পতিত জমিগুলো সরকারের তরফ থেকে নামমাত্র মূল্যে কিনে নিয়ে সেখানে বিহারী আশ্রয়প্রার্থিদের সব উপনিবেশ স্থাপন করা।

লীগদলের হাতেই বাংলায় দীর্ঘকাল ধরে ক্ষমতা রয়েছে। অথচ তারাই গত ১৬ই আগষ্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' সুরু করেছিল। তার জের আজও মিটছে না, বরং আগুন স্থান থেকে স্থানান্তরে ছড়াচ্ছে। আইন ও শৃঙ্খলা, শান্তি ও নিরাপত্তা বলে আজকের বাংলায় আর কিছু নেই। পরিষদের গত অধিবেশনে বাংলা সরকার একটা অর্ডিন্যান্স প্রবর্তনের যুক্তি দেখান, অথচ যে নোয়াখালি ত্রিপুরায় এত বড় বীভৎস ধ্বংসযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হ'ল, সেখান থেকে নোয়াখালি-ত্রিপুরা অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার করেছেন।

পর্যায়ে পর্যায়ে কলিকাতা তথা বাংলার অন্যত্র যে সব দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়েছে ও হচ্ছে, সে সব ক্ষেত্রেও ধরপাকড়, জামীনে মুক্তিদান, পুলিশকর্ম্মচারিদের নিয়োগ, দাঙ্গাদুর্গত-সাহায্যব্যবস্থা, পাইকারী জরিমানা বসানো, হিন্দুদের বাড়ীগুলি (হিন্দু) মালিকদের ফিরে পাওয়া, ১৪৪ ধারা এবং অন্য অনেক বিষয়ে মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গঠিত এই আধা-সামরিক বাহিনীটাকে নানাভাবে প্রশ্রয় দেওয়া, এসব ব্যাপারেও লীগ সরকারের বিশেষ বৈষম্যমূলক এবং উদ্দেশ্যমূলক আচরণ আজ সবার কাছেই দিবালোকের মত স্পষ্ট। সাহিত্যে শিল্পে বিজ্ঞানে, ধর্ম্মে রাজনীতিতে, চিন্তায় কর্ম্মে আধুনিক ভারতের অন্যতম প্রধান স্রষ্টা বলে বিপুল গৌরবের অধিকারী, বিপুল ঐতিহ্যের উত্তরসাধক বাঙ্গালী হিন্দুর জীবনেও এতবড় দুর্দ্দশা ও প্রচণ্ড দুর্বিপাক আর আসেনি। সে কি আজ আত্মস্থ হবে না, পূর্ণ ঐক্যের শক্তিতে দুর্জ্জয় হয়ে অন্যায় ও অন্ধকারের দুর্গগুলোকে ভূমিসাৎ করতে পারবে না?

"আমরা বীর নই? হয়তো তাই। তুমিও না, আমিও না। কিন্তু আমরাও বীর হ'তে পারি, যখন বীর আমাদের হ'তেই হবে—তা ছাড়া উপায় আর থাকবে না। এবং তা ছাড়া আর উপায় নেই। দুই মৃত্যুর মধ্যে একটিকে আজ আমাদের বেছে নিতে হবে। হয় ম'রতে হবে কলঙ্কিত এবং শৃঙ্খলিত হ'য়ে, নয় মুক্ত এবং পরিতৃপ্ত হ'য়ে।"

—রোমাঁ রোলাঁ।

পিছন ফিরে জ্যাকের দিকে সহাস্যে চেয়ে অপূর্ব ঘাড় নেড়ে জানালে, হ্যাঁ।

তারপর বললে, ও যে এতদিন পরে আমাকে চিনতে পারবে ভাবতেই পারিনি। কী আশ্চর্য্য ওদের স্মরণশক্তি!

গম্ভীরভাবে প্যামেলা বললে, বললাম তো তোমাকে, ওরা প্রভুকে সহজে ভোলে না। আমার এই জিপ, একবার····

—এটি কী কুকুর ভাই?—মীরা জিজ্ঞাসা করলে। বড় বড় লোম-ওয়ালা এই কুকুরটিকে তার ভারী অদ্ভুত লাগছিলো। ওর চোখে-মুখে সব দেহে বড় বড় লোম ঢেউ খেলে যাচ্ছে। ওর চলা-ফেরায় কেমন একটা অভিজাত ঔদাসীন্য। চোখে যোগীসুলভ বিষয়-বিতৃষ্ণা।

—এটি কি কুকুর ভাই?—জিপকে কোলের উপর তুলে নিয়ে মীরা জিজ্ঞাসা করলে।

—পমিনেরিয়ান!—প্যামেলা সংক্ষেপে বললে।

অপূর্ব পোষ্টেড হ'ল রাজসাহীতে। দিল্লীর বাড়ীথানির সুবন্দোবস্ত ক'রে দিন কয়েক পরে ওরা এল ক'লকাতায়। সেখানে দিন দুই মীরার বাড়ীতে হৈ চৈ ক'রে চ'লে গেল রাজসাহী।

চারটি প্রাণী, অপূর্ব আর প্যামেলা, জ্যাক আর জিপ।

এ ক'দিন মীরা ছিল। সুতরাং জ্যাক কোন অসুবিধা বোধ করেনি। রাজসাহী গিয়ে কয়েক দিনের মধ্যে সে অসুবিধা অনুভব করতে লাগলো।

খাওয়া-দাওয়া নয়, অন্য রকমের একটা অনির্বচনীয় অসুবিধা।

অপূর্ব তাকে আদর-যত্ন যথেষ্টই করে। কিন্তু দিনের অধিকাংশ সময়ই সে থাকে অফিসের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। বিকেলে খেলা-ধূলা আছে, সন্ধ্যায় ক্লাব। এর উপর আছে স্বয়ং প্যামেলা। সুতরাং জ্যাক ওকে কতটুকু সময়ই বা পায়।

প্যামেলা, সেও লোক খারাপ নয়, দয়া-মায়া আছে। খাওয়া-শোয়া নিয়েও জিপের সঙ্গে কোনো তারতম্য করে না। কিন্তু তবু সে জিপেরই মনিব, জ্যাকের নয়। ওর উপর জ্যাকের তো সত্যসত্য কোনো জোর নেই।

এই 'জোর'টাই হ'ল আসল কথা।

এ বাড়ী যেমন জিপের মনিবের, তেমনি জ্যাকেরও। বরং জ্যাকের মনিবেরই বেশি। অপূর্বই হ'ল আসল মনিব। সে-ই খাটে-খোটে, রোজগার ক'রে আনে, তবে প্যামেলার নবাবি চলে। কিন্তু এ সবই হ'ল আইনের কথা। আসলে জিপের মনিবের কর্তৃত্ব অনস্বীকার্য। এবং সেইটে উপলব্ধি ক'রে একদিকে যেমন জিপের গুমোর বেশি, অন্যদিকে তেমনি জ্যাকও কিছুতে জোর পায় না।

জ্যাক যে খুব একজেদী, দাম্ভিক, তাও নয়। মনে মনে সে জিপের প্রাধান্য স্বীকার করে। প্রকাশ্যে মাঝে মাঝে জিপকে তোয়াজ করার চেষ্টা করে।

কিন্তু জিপ যেন কী রকম! জ্যাককে সে 'এক নেটিভ' ব'লে স্বীকারই করে না। জ্যাক যদি কখনও ওর কাছে ভাব করতে আসে, জিপ হয় তাকে চোখ পাকিয়ে গর্জন ক'রে ধমকে দেয়, নয়তো ফেঁচকে প্যামেলার কাছে পালিয়ে যায়।

জ্যাক বোকার মতো চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে শোবার জায়গাটিতে গিয়ে দুই পায়ের মধ্যে মুখ ঢেকে ক্ষুণ্নচিত্তে শুয়ে পড়ে।

তা ছাড়া কীই বা করতে পারে সে!

হাজার হোক, জিপ মেমসাহেবের কুকুর।

জ্যাকের মনে সুখ নেই।

অপূর্ব একদিন জিজ্ঞাসা করলে প্যামেলাকে, জ্যাক রোগা হয়ে যাচ্ছে যেন।

প্যামেলাও উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে জ্যাকের দিকে চাইলে। বললে, কি জানি!

—খাচ্ছে?

—খাচ্ছে বই কি।

—তাহ'লে ভয়ের কিছু নেই। অপূর্ব চা খেতে-খেতে বললে, উনার টেবিলটা আজ সকালে পৌঁছুচ্ছে খবর পেলাম। গণরানী পাঠিয়েছি, একটু পরেই এসে যাবে বোধ হয়।

প্যামেলা খুশি হয়ে বললে, তাই নাকি?

তারপরে কোথায় টেবিলটা বসানো যায় তাই নিয়ে ওরা ব্যস্ত হয়ে রইল, যতক্ষণ না হাঁক ডাক ক'রে সেটা এসে পৌঁছুলো। জ্যাকের সম্বন্ধে অপূর্বর মনে উদ্বেগের লেশমাত্রও রইলো না।

বেচারা জ্যাক।

ওই যে বললাম, খাওয়া-শোওয়ার কোনো অযত্ন জ্যাকের নেই, কিন্তু এবাড়ীতে তার জোরটাই গেছে ক'মে। এ বাড়ীতে সে যেন অতিথি মাত্র। খায়-দায়, ঘুরে বেড়ায়, ক্লান্ত বোধ করলে শুয়ে থাকে।

মীরা এল ক'দিনের জন্যে বেড়াতে।

বললে, জ্যাকের শরীরটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে কেন দাদা?

—কি জানি ভাই। অথচ যত্নের কোনো ত্রুটি হচ্ছে না।

জ্যাক মীরাকে দেখে খুশি হ'ল। তার কাছে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়তে লাগলো। ভাবটা, আমার অবস্থাটা দেখ দিদিমণি,—কি ছিলাম, কি হয়েছি।

ওর গায়ে সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, শরীর নয়, স্ফূর্তিটা যেন ক'মে গেছে। এ জায়গাটা বোধ হয় ওর ভালো লাগছে না। ওকে আমি নিয়ে যাই, কি বল? যাবি জ্যাক, যাবি?

জ্যাক কি বুঝলো জানি না, কিন্তু মীরার আদরে গ'লে গিয়ে ভউ ভউ ক'রে শব্দ ক'রে উঠলো। তার পরিপূর্ণ কণ্ঠের এই ডাকটা স্ফূর্তির ডাক। এবাড়ীতে এই প্রথম সে এমনি শব্দ ক'রে ডাকলে।

সে আওয়াজে অপূর্ব খুশি হ'ল। পরম আদরে জ্যাককে নিজের দুই উরুর মধ্যে চেপে ধ'রে, তার মাথায় মৃদু মৃদু আঘাত করতে করতে বললে, নিয়ে যাবি কি রে? তাহলে আমি থাকব কি ক'রে?

প্যামেলা একপাশে ব'সে সেলাই করছিল। বললে, তাই নিয়ে যাও বরং। আমি হয়তো ওর ঠিক যত্ন করতে পারছি না।

মীরা ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বললে, সে কথা তো আমি বলিনি বৌদি।

অপূর্ব তাড়াতাড়ি বললে, সে কথা তো বলেনি প্যামেলা। তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার কি থাকতে পারে?

—অভিযোগটা তবে কার বিরুদ্ধে?

—কারও বিরুদ্ধে নয় বৌদি, তোমার বিরুদ্ধে তো নয়ই। জ্যাকের শরীর খারাপ হয়েছে। হয়তো জায়গাটা ওর ভালো লাগছে না। তাই ওকে নিয়ে যেতে চাইছিলাম। এর মধ্যে দোষের কি আছে?

প্যামেলা বললে, বেশ তো, নিয়ে যাও না।

—যাবই তো।—মীরা জেদের সঙ্গে বললে,—আমি ওকে মানুষ ক'রেছি। আমি যদি ওকে নিয়ে যেতে চাই, কে বাধা দিতে পারে?

অপূর্ব হাসতে হাসতে বললে, কেউ বাধা দিতে যাচ্ছে না তো মীরা। ইচ্ছে করলে তুই নিয়ে যেতে পারিসই তো।

প্যামেলা আর একটি কথাও বললে না। নিঃশব্দে সেলাই করতে লাগলো।

কথাটার মধ্যে রাগারাগি কিছু নেই। কুকুরের কেন, কুকুরের মালিকেরও শরীর নানাকারণে খারাপ হতে পারে, যত্ন সত্ত্বেও। তার জন্যে কারও কুণ্ঠিত, ক্ষুব্ধ অথবা ক্রুদ্ধ হবার কিছু নেই।

অথচ প্যামেলা ক্রুদ্ধ হ'ল কেন?

কে জানে কেন। কিন্তু এই ক্রোধ মীরার ভালো লাগলো না। তার মনে সন্দেহ দেখা দিল। স্থির করলে, জ্যাককে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেই হবে। তার কেমন মনে হ'ল, ওকে এখানে রেখে যাওয়া ঠিক হবে না।

অথচ নিয়ে যেতেও পারলে না।

যে ক'দিন মীরা এখানে রইলো জ্যাক সর্বক্ষণ ওর পায়ে-পায়ে ঘুরলো, ওর গা ঘেঁসে বসলো আর কত রকমে

যে ওর আদর কাড়লো তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু যেই বুঝলো মীরা ওকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে, অমনি কেমন আড়ো আড়ো ভাব দেখা দিল।

শেষ মুহূর্ত্তে যখন গলায় চেন বেঁধে মীরা ওকে নিয়ে যাবার জন্যে টানতে লাগলো, তখন ও একেবারেই বেঁকে দাঁড়ালো কিছুতেই যাবে না।

প্যামেলার মুখের মেঘ কেটে গিয়ে যেন এক ঝলক হাসির রোদ খেলে গেল। অপূর্ব হেসে ফেললে। রাগ করতে গিয়ে মীরাও হেসে ফেললে। জ্যাকের কান ম'লে দিয়ে বললে, নিমকহারাম কোথাকার।

অপূর্বকে ছেড়ে যেতে জ্যাক চায় না। আবার মীরাও এইখানে থাক, এই তার ইচ্ছা। তাহ'লে এ বাড়ীতে সে তার স্বাভাবিক জোর পায়। কিন্তু তাকে জোর পাওয়াবার জন্য মীরা যে চিরকাল এখান থেকে যেতে পাবে না, সেটা সে বোঝে না।

সুতরাং মীরা চ'লে যেতে সে আবার মুষড়ে পড়লো। সমস্ত দিন তার বিছানায় নিঃঝুম হয়ে শুয়ে রইলো।

অপূর্ব বললে, দেখছ, মীরা চ'লে যেতে জ্যাক কি রকম দ'মে গেছে!

প্যামেলা উত্তর দিলে, কিন্তু এতই যদি টান তবে ও গেলই না বা কেন তার সঙ্গে?

—কে জানে।

প্যামেলা তিক্ত কণ্ঠে বললে, আমি বলছি তোমার এই জ্যাক সহজ কুকুর নয়। ও মাঝে-মাঝে এমন ক'রে আমার দিকে চায় যে ভয় করে।

অপূর্ব হা হা ক'রে হেসে বললে, না, না। জ্যাক বড় ভালো কুকুর।

—ভালো কুকুর! আমি কুকুর চিনিনে? ওর পেটে পেটে বহু দুর্বুদ্ধি খেলছে, একদিন টের পাবে।

অপূর্ব হাসতে হাসতে জ্যাকের মাথায় হাত বুলোতে লাগলো। ওদের কথা জ্যাক বুঝতে পারলে কি না কে জানে, কিন্তু অপূর্বর অত আদরেও ও কি রকম অস্বস্তিতে ছটফট করতে লাগলো।

সে রাত্রিও জ্যাকের খুব মন-খারাপের মধ্যেই কাটলো। পরদিন সকালে শান্ত হয়ে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে লাগলো। বিকেলে মনকে বুঝিয়ে ফেললো:

সত্যি তো, জিপ হল মেমসাহেবের কুকুর। জ্যাকের স্থান তার নীচে হ'তে বাধ্য। অপূর্বকে ছেড়ে যখন সে যেতে পারবে না এবং এই বাড়ীতে থাকতেই তাকে হবে, তখন জিপের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেওয়াই তার পক্ষে শ্রেয়ঃ। নইলে অনেক অনর্থের সৃষ্টি হ'তে পারে, এবং দেহে মনে কষ্ট পেতে হবে তাকেই।

বিকেলে জিপ বাগানে একটা ফড়িং পতঙ্গের পিছনে ছুটোছুটি করছিল। জ্যাক স্থির করলো এই অবসরে জিপকে একটু তোষামোদ ক'রে আসা যাক।

বাগানের দিকের খোলা বারান্দায় প্যামেলা ব'সে ব'সে একখানা নভেল পড়ছিল।

জ্যাক অত্যন্ত বিনীত ভাবে জিপের দিকে অগ্রসর হ'ল। তার ইচ্ছা করছিল যে চমৎকার বিকেলে জিপের সঙ্গে ও-ও প্রজাপতির পিছনে ছোটাছুটি করার খেলায় যোগ দেবে। এই ভেবে যেই ও জিপের কাছে যাবে, জিপ সেই সময়েই অন্যমনস্কভাবে ছুটে এসে জ্যাকের গায়ে পড়লো।

মীরা যে ক'দিন এখানে ছিল, জ্যাকের যেন পাঁচটা পা গজিয়েছিল। দেমাকে যেন সে ধরাকে সরা জ্ঞান করছিল। সে-রাগ জিপের ছিল। এখন মীরা নেই, জ্যাক অসহায়। জ্যাকের গায়ে গিয়ে পড়বামাত্র জিপের সেই রাগ যেন বোমার মতো ছিটকে পড়লো।

চক্ষের পলকে সে জ্যাকের মুণ্ডুটাকে তীক্ষ্ণ দাঁতে কামড়ে ধ'রে ছিটকে ফেলে দিলে। এবং তৎক্ষণাৎ এক ছুটে গিয়ে প্যামেলার দুই পায়ের ফাঁকে ব'সে গোঁ গোঁ করতে লাগলো।

আক্রমণের আকস্মিকতায় হতবুদ্ধি হয়ে জ্যাক প্রথমে চিৎকার ক'রে উঠলো, কিন্তু তখনই চুপ ক'রে গেল। ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে উঠে তার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো।

ভারতীয় শিল্পের নবযুগ

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্প্রতি ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। মহাযুদ্ধের সময় এদেশে বিদেশী পণ্য আমদানী একরকম বন্ধ ছিল, অতি সাধারণ ভোগ্যপণ্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী ভারতবর্ষের পক্ষে এই আমদানী বন্ধ হওয়া যে কি মারাত্মক অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল তা নিয়ে আলোচনা না করলেও চলবে। এই সময়কার প্রচণ্ড অভাববোধের ভিতর দিয়ে ভারতবাসীর মনে প্রবল শিল্পচেতনার সঞ্চার হয় এবং পরিস্থিতির গুরুত্ব অস্বীকার করতে না পেরে ভারতসরকার এদেশের শিল্প প্রগতি সম্বন্ধে তাঁদের চিরকালীন উদাসীনতা কিছুটা পরিত্যাগ করেন। ভারতবর্ষে যন্ত্রপাতি তৈরারী হয় না। যন্ত্রপাতির অভাবে শিল্পপ্রসার অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের মধ্যে শিল্পোৎসাহ বা মূলধনের অনটন না থাকলেও কেবলমাত্র যন্ত্রপাতি মেলে নি বলে ভারতবর্ষ শিল্পসমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে নি। তবে এরই মধ্যে যতটুকু পাবা গিয়েছিল, নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং পুরাতন শিল্পের প্রসার করতে চেষ্টার ত্রুটি দেখা যায় নি। সিগারেট, ব্লিচিং পাউডার, সাইকেল, সেলাইয়ের কল, ঔষধাদি নানা রাসায়নিক পণ্য, বৈদ্যুতিক ও সমরসংক্রান্ত সাজসরঞ্জাম, লণ্ঠন, চকোলেট ও জমানো দুধ, প্লাইউড, ববিন, এ্যালুমিনিয়াম, কাঁচ, প্রভৃতি অসংখ্য প্রকার ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের জন্য নূতন নূতন কারখানা যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী যন্ত্রপাতি না পাওয়া গেলেও চাহিদার চাপে পুরাতন ভারতীয় শিল্পাগারগুলির কাজকর্ম অনেক বেড়ে যায়। লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা, কাপড়ের কল, কাগজের কল, পাট কল প্রভৃতিতে এই সময় একরকম দিনরাত কাজ হয়েছে। শুধু কারখানার কাজ বাড়িয়ে যুদ্ধের মধ্যে পণ্য উৎপাদন কি ভাবে বাড়ানো হয়েছে ভারতীয় কাগজ শিল্প তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। ভারতে কাগজের কলের সংখ্যা ৭। এই ৭টি কলে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ৫৯,৫০০ টন কাগজ উৎপন্ন হয়, ১৯৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ৯৩,০০০ টনের বেশী হয়েছিল। যুদ্ধ যখন আরম্ভ হয় তখন ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে ৩৮০ কোটি গজ কাপড় উৎপন্ন হয় আর ইস্পাতের কারখানাগুলিতে উৎপন্ন হয় ৭৫,০০০ টন ইস্পাত, যুদ্ধের মধ্যে উভয়প্রকার পণ্যের উৎপাদনই আশ্চর্য্যরকম বৃদ্ধি পায় এবং যুদ্ধ শেষ হবার আগেই কলে তৈরারী কাপড়ের পরিমাণ ৪৭০ কোটি গজ এবং উৎপন্ন ইস্পাতের পরিমাণ ১১,২৫,০০০ টন দাঁড়ায়। এই সময় সমগ্রভাবে ভারতের কুটিরশিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল। এর উপর যুদ্ধের মধ্যে সব জড়িয়ে ভারতে আগের তুলনায় শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ শিল্প প্রসার হয়েছিল।

আপাতদৃষ্টিতে এই শতকরা ৩০ ভাগের মত শিল্প প্রসার সহজ কথা নয় সত্য তবে এজন্য আনন্দে উচ্ছ্বসিত হবারও কিছু নেই। প্রথমতঃ ভারতবাসীর প্রয়োজনের তুলনায় এই শিল্প প্রসার

একান্ত নগণ্য। মুদ্রাস্ফীতি বা যুদ্ধকালীন সার্ব্বজনীন কর্ম্মসংস্থানের ফলে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান সামান্য একটু বেড়েছে, প্রচণ্ড পণ্যাভাবের কথা ছেড়ে দিলেও এখনও ভারতীয় শিল্পের বর্দ্ধিত উৎপাদনে ভারতবাসীর চাহিদা একেবারেই মিটছে না। যুদ্ধ শেষ হবার পর দু বৎসর অতীত হলেও এখনও বিদেশ থেকে যথেষ্ট পণ্য আমদানী হচ্ছেনা বলেই ভারতীয় শিল্পের এই দৈন্য এতটা স্পষ্টভাবে অনুভব করা যাচ্ছে। যুদ্ধের সময় প্রসারিত শিল্পাদির দ্বিতীয় সমস্যা যন্ত্রপাতির অভাব। আগেই বলা হয়েছে চাহিদার চাপে যুদ্ধের শেষ বৎসর ধরে ভারতীয় কলকারখানায় একরকম দিনরাত কাজ হয়েছে, এইভাবে অত্যধিক কাজের চাপে শিল্পাগার-গুলির যন্ত্রপাতি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে খুব বেশী। ভারতে এখনো যন্ত্রাদি উৎপাদনের যথেষ্ট সংখ্যক কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় নি, যুদ্ধকালীন বিশৃঙ্খলা এখনও যন্ত্র উৎপাদনকারী প্রায় সব দেশের বজায় আছে বলে বিদেশ থেকে ভারতে দরকারমত যন্ত্রপাতি আমদানী উপস্থিত করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে ভারতে যেটুকু শিল্পপ্রসার হয়েছে, তা টিকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করা সত্যই অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেছে। যুদ্ধোত্তর শিল্পপুনর্গঠন পরিকল্পনায় এদেশে বিমান মোটরগাড়ী, জাহাজ, রেলইঞ্জিন, ইত্যাদি বহু জিনিষ তৈয়ারী করবার জন্য অনেকগুলি বড় বড় কারখানা খোলার ব্যবস্থা হচ্ছে, এছাড়া প্লাষ্টিক, সুরাসার, সংবাদপত্র ছাপার কাগজ (Newsprint) থেকে আরম্ভ করে কৃত্রিম রেশম পর্য্যন্ত নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় পণ্য ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন করবার চেষ্টা চলছে। যে সব শিল্প ইতিমধ্যে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলি প্রসারিত করার প্রস্তাবও পুনর্গঠন পরিকল্পনায় আছে। এত কলকারখানা চালু করতে হলে বিপুল পরিমাণ যন্ত্রপাতি আবশ্যক। এখন বিদেশ থেকে যে সামান্য পরিমাণ যন্ত্রপাতি আমদানী হচ্ছে তা দিয়ে চালু কারখানাগুলির ক্ষয়প্রাপ্ত যন্ত্রাদির সংস্কারই সম্ভব হচ্ছে না। শীঘ্র যে আমদানী খুব বেশী বাড়বে অবস্থা দেখে তা মনে হয় না। সুতরাং ভারতীয় শিল্পের যেটুকু উন্নতি হয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও যেটুকু উন্নতি হবার আশা রয়েছে, এখনকার বিশৃঙ্খল অবস্থা একটু শান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তা নিয়ে হৈ চৈ করা নিরর্থক।

ভারতের শাসনভার এতকাল বিদেশী আমলাতান্ত্রিক কর্ত্তৃপক্ষের হাতে ছিল বলে এদেশের আর্থিক স্বার্থ সংরক্ষণে কোনকালেই ভারতসরকারের আগ্রহ দেখা যায় নি, বরং পারতপক্ষে তাঁরা বরাবর চেষ্টা করেছেন যাতে ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যের প্রসার ঘটতে না পারে। ভারতবাসীর আর্থিক স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি হলে তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার আপনা থেকেই হবে এবং শিক্ষিত ও সচ্ছল ভারতবাসী সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠলে কোন বিদেশী জাতির পক্ষেই আর ভারতে শাসন সম্ভব হবে না,—এই ছিল ভারতসরকারের ধারণা। ভারতবাসীর বহু ত্যাগস্বীকারের ভিতর দিয়ে আজ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটেছে। ভারতীয় জননায়কদের দ্বারা গঠিত অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের হাতে এখন ভারতের শাসনভার এসেছে, বলা নিষ্প্রয়োজন, এং নবগঠিত সরকার ভারতের আর্থিক অগ্রগতির সমস্ত সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা না করে পারেন না। যুদ্ধের প্রচণ্ড ধাক্কায় ভারতের অর্থনৈতিক বনিয়াদ বিপন্ন হয়েছে সত্য, কিন্তু অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার ইতিমধ্যে এদেশের আর্থিক পুনর্গঠনে মনোযোগী হয়ে প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। গত ১৫ই জানুয়ারী নয়াদিল্লীতে বিভিন্ন প্রদেশের খাদ্যসচিবদের এক সম্মেলনে আহ্বান করে অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের খাদ্যসদস্য ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারতের জন্য একটি পঞ্চবার্ষিকী খাদ্যপরিকল্পনা উপস্থাপিত করেছেন। এখন ভারতবর্ষে যেভাবে লোক-

সরকারের আগ্রহ ঘোষণা করে উপসংহারে বলেছেন, "পশ্চাৎপদ প্রত্যেক দেশেরই দেশীয় শিশুশিল্পগুলিকে এমনভাবে রক্ষা করা উচিত যাতে এই সব শিল্প শক্তিশালী বৈদেশিক প্রতিযোগিতা থেকে আত্মরক্ষা করে নিজেদের পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে।"*

ভারতে শিল্পপ্রসার করতে হলে যন্ত্রপাতির দরকার এবং উপস্থিত সেই সব যন্ত্র আনতে হবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ থেকে। এই যন্ত্রাদির দাম হিসাবে ভারতবর্ষকে অবশ্যই প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হবে। অর্থ বলতে এখানে নোট বা টাকা বুঝলে চলবে না, সোনা বা যন্ত্র সরবরাহকারী দেশে প্রেরিতব্য ভারতীয় পণ্যের দাম বুঝতে হবে। যুদ্ধের জন্য গরীব দেশ ভারতবর্ষ আরও গরীব হয়ে পড়েছে, সোনা তার হাতে নেই বললেই চলে। আগের মত কাঁচা মাল রপ্তানী করে অনুকূল বাণিজ্যিক গতি সৃষ্টি করাও এখন আর ভারতের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। এক্ষেত্রে শিল্প সম্প্রসারণের উপযোগী যন্ত্রপাতি আমদানী করতে হলে সেই সব যন্ত্রের মূল্য সংগ্রহ করা ভারতবর্ষের পক্ষে অবশ্যই একটা বড় রকমের সমস্যা। তবে ব্রিটেনের কাছে ভারতের যে ১,৮০০ কোটি টাকার ষ্টার্লিং পাওনা রয়েছে, সেগুলো ফেরৎ পেলে উপস্থিত এই সমস্যার সমাধান হয়। যুদ্ধের মধ্যে ভারতবাসীর চরম স্বার্থত্যাগের বিনিময়ে এই ষ্টার্লিং পাওনা জমে উঠেছে, এখন যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ভারতের প্রয়োজনের সময় পাওনা ষ্টার্লিংগুলি আদায় হয়ে যাওয়া উচিত। দুঃখের বিষয়, ব্রিটিশ সরকারের দিক থেকে অবিলম্বে ঋণ পরিশোধের বিশেষ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না এবং প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল প্রমুখ একদল লোক এবং একশ্রেণীর ব্রিটিশ সংবাদপত্র ভারতের ন্যায্য পাওনা ফাঁকি দেবার জন্য আন্দোলন চালাচ্ছেন। আশার কথা, অন্তর্বর্তী সরকার ষ্টার্লিং পাওনা যথাসম্ভব সম্পূর্ণভাবে আদায়ের জন্য দৃঢ় মনোভাব অবলম্বন করেছেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সরকার যখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ৪৪০ কোটি ডলারের নূতন ঋণ গ্রহণ করেন, তখন তাঁদের স্বীকার করে নিতে হয়েছিল যে বাহিরের দেনা পরিশোধ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দেশের সঙ্গে ব্রিটেন অবিলম্বে আলোচনা চালাবে এবং দেনার একাংশ বাতিলের চেষ্টা করবে। এই সর্তানুসারে ভারতের পাওনার একাংশ বাতিল করতে ব্রিটিশ সরকারের আগ্রহান্বিত হওয়া স্বাভাবিক। অন্তর্বর্তী সরকার কিন্তু ভারতের আর্থিক পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করবার পক্ষে একমাত্র অবলম্বন ষ্টার্লিং পাওনার একপয়সা ছাড়তে সম্মত নন এবং তাঁরা জানিয়েছেন যে ইঙ্গ-ভারতীয় দেনাপাওনার ব্যাপারে ইঙ্গ মার্কিণ ঋণচুক্তির কোন ধারাই তাঁরা কোনরূপ অসুবিধা স্বীকার করে মেনে নেবেন না।† ভারত সরকারের এই দৃঢ়তার ফলে সম্ভবতঃ শীঘই ষ্টার্লিং পাওনা আদায় হবে এবং এই অর্থ দ্বারা বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি এসে ভারতে শিল্পসংস্কার ও শিল্পপ্রসার সম্ভব হবে।

অনেকের ধারণা শিল্পপ্রসারের ফলে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে এদেশে বিদেশী মালের আমদানী কমে যাবে। এই ধারণাবশতঃই এতকাল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতীয় শিল্পপ্রগতির পক্ষে নিত্যনূতন বাধা সৃষ্টি করে

* "It is the duty of every country which is backward, to protect its infant industries, so that those infant industries might be able to stand on their own legs against competition from foreign countries which have had long and better experience in the line."

† ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর অর্থসদস্য মিঃ লিয়াকৎ আলি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ষ্টার্লিং পাওনা সম্পর্কে ভারতসরকারের পক্ষ মনোভাব নিম্নোক্ত ঘোষণায় ব্যক্ত করেছেন :—

"I want to make it absolutely clear that whatever agreement may have been arrived at between the U.S.A. and the United Kingdom in connection with the Anglo-American loan, we are not bound by it. We were not a party to it and if it is mentioned as one of the terms that there shall be a scaling down of balances India is not certainly bound by it and we do not accept that proposition."

উত্তমাশা অন্তরীপ

জ্যাগমুন্ত্‌ নভাকভ্‌স্কি   অনুবাদক হিরন্ময় ঘোষাল

[লেখক Zygmunt Nowakowski আধুনিক পোলিশ সাহিত্যে একজন দিকপাল। বলা বাহুল্য, এ গল্পটি তাঁর বাল্যস্মৃতিবিষয়ক হওয়া সত্ত্বেও শুধু ছেলেদের জন্যে লেখা নয়। ছোট ছেলের মন নিয়ে ছেলেদের ভাষায় লেখা কত সুন্দর হতে পারে এই গল্পটি তার নিদর্শন। —অনুবাদক]

জানজিবারের সুলতান। মাথায় প্রকাণ্ড শাদা পাগড়ী। আর নীলরঙের স্পেনের রাজা। রাজার বয়েস খুব বেশী হলে সতেরোর বেশী নয়। অর্থাৎ বড় জোর বালকের চেয়ে সাত বছরের বড়। কেন জানি না, আমার ভারী আশ্চর্য্য লাগে, আমি সেই রাজার মুখের দিকে প্রায়ই তাকিয়ে দেখি। ওর চোখ দুটো বড় বড়, মনে হয়, ও ভারী দাম্ভিক। কিন্তু একটু বেশীক্ষণ চেয়ে দেখলে ধরা যায় ওর মনে বিশেষ একটা ভয় গুঁড়ি মেরে বসে রয়েছে। হয়তো আমার চোখের ভুল, আমার কিন্তু তাই মনে হয়। কারণ ইতালীদের রাজা হুম্বের্তো, যার ছবি ওদের সব টিকিটে আর যার মুখের দুপাশে ইয়া বড় বড় একযোড়া গোঁফ, তাকেও বিদ্রোহীরা খুন করে ফেলেছে। মহারাণী এলিজাবেথকেও, ইস্কুল খোলবার কিছুদিন পরেই। বলেক্ আর য়ানেক্‌দের ইস্কুলে ছুটী দিলে। ওরা ভারী খুসী। বলে, ভাগ্যিস্ ছুটীর সময়ে কাণ্ডটা ঘটে নি। একটু আগে, এই দিন তিন-চার আগে, তাকে খুন করলে ছুটীটা একেবারে মাঠে মারা যেতো। একটা দিন একটা দিনই সই। ওদের দুজনেরই ক্লাসের ছেলেরাও ভারী খুসী। কেবল দিদিমা বলে, ছেলেগুলোর ঐ রকম খুসী হওয়াটা একেবারেই শোভন নয়, যদিও এলিজাবেথ অস্ট্রিয়ার মহারাণী। তাছাড়া তার বাড়ী বাভারিয়ায়। আমার কিন্তু ঐ এলিজাবেথের কথা ভেবে একটু দুঃখ হয়, ভারী সুন্দর তার চেহারা। বলেক্ বলে, আমি যদি ইস্কুলে ভর্তি হতাম, তাহলে ও-কথা বলতাম না। হতেও পারে।

যাই হোক্ ঐ স্পেনের রাজার কিছুই করবে না বোধ হয় ওরা। ওর বয়েস যে ভারী অল্প। হয়তো সতেরোও পেরোয় নি।

পোপের রাজত্ব ভ্যাটিকান বলেক্ তার ক্লাসে বেচে দিলে অর্থাৎ একটা দামী সুদান দুটো হণ্ডুরাস্ আর একটা বলিভিয়ার সঙ্গে বদলাবদলি করলে। বলে, লোক ভারী জিতেছে কারণ ঐ ভ্যাটিকানটার দাম প্রায় কিছুই নেই। তাছাড়া এ্যালবামে ঠিক ঐ রকমই একটা আছে তাতেও ঐরকমই মুকুট আর চাবির ছবি, কেবল নীচের দিকে একটু তফাৎ এই যা। ঐ পোপের রাজত্ব শুনতে যেন কেমন লাগে। যখন ওটা তৈরী হয়, তখন দিদিমা নাকি ইতালীতে। আমি শুধু ঐ একটা কথা বুঝতে পারি না। পোপ কেন ওর রাজত্ব ছেড়ে পা বাড়াতে চায় না, যদিও তাকে ছেড়ে দিতে কারো আপত্তি নেই। এমন কি, সবাই খুসীই হয় যদি পোপ একটু বাইরে যায়। কিন্তু ওর ঐ গোঁ। ও বাইরে যাবেই না, কিছুতে না। সেখানে নাকি চমৎকার চমৎকার বাগান আছে, তবুও ঐরকম এক জায়গায় সারা জীবন বসে থাকা। তা হোক্ না বাগানে।

নিশ্চয় ওর ভীষণ আত্মসম্মান, আর তেমনি একগুঁয়ে সে। কী নিয়ে রাগ করেছে ব্যস্ তার আর মাপ নেই। নিশ্চয়ই ওকে যখন তখন বেরতে বলে ব'লেই। ওকে এখন আর বেরতে না বলাই ভালো। এমন ভাব দেখানো উচিত, যেন না বেরুলো তো বয়েই গেলো। ও নিজেই তখন সুড়সুড় করে বেরিয়ে আসবে। ওকে কেউ

করবার একমাত্র উপায় হলো তাই। দিদিমাকে ও-কথা বলাতে তার সঙ্গে আমার একটু চটাচটি হয়ে গেলো।

আমার তো ভারী বয়েই গেল। ভালোই হলো, এইবার নিজে নিজেই ডাকটিকিটগুলো দেখতে পারবো। তাছাড়া এমন অনেক জিনিষ আমার চোখে পড়ে যা ওরা কেউই আমায় বুঝিয়ে দিতে পাবে না। তাই আমিও কাউকে বিরক্ত করতে চাই না। সারা দিন ধরে আমি ঐ ডাকটিকিটগুলো নিয়ে খেলতে পারি। একবার আমি মিছামিছি অসুখ করার ভাণ করলাম, সকালে এমন কাশতে লাগলাম যে মা আমায় বিছানা থেকে উঠতে বারণ করে দিলে, সুতরাং আমি বিছানায় শুয়ে রইলাম, আর ওরা আমার এ্যালবামখানা দিয়ে গেলো। বাস্তা আমার খাবার দিয়ে যেতেও ভুলে গেলো, কিন্তু আমি একটি কথাও বললাম না। আমার ভারী ভালো লাগছিল তারপর রাত্তিরবেলা আমি পার্সিয়ার স্বপ্ন দেখলাম। সমস্ত দেশটা যেন বড় বড় শাদা আর কালোতে ছক কাটা, আর ছকগুলোর উপরে হাতীর দাঁত আর প্রবালের তৈরী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কী সব জন্তু হেঁটে বেড়াচ্ছে। কী রকম সব অদ্ভুত অদ্ভুত এক-পা-ওলা ঘোড়া আড়াই পা করে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে, আর সমস্ত পার্সিয়াটার এক কোণ থেকে আর এক কোণ পর্যন্ত গজগুলো হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটোছুটি করছে। লম্বা একসারি ঘোড়ের পেছনে দাঁড়িয়ে পার্সিয়ার শাহ, মাথায় ভেড়ার লোমের টুপী, ঠিক ডাকটিকিটের ছবিটার মত। মা'কে যেন বলছে: "কিস্তি, মন্ত্রী সামলাও।"....

পার্সিয়া!....পার্সিয়া নানান্ রকমের হয়। হল্‌দে, সবুজ, লালও। সালভাদর-এর রঙ আশমানী। সালভাদরএর ঠিক মাঝখানে আগ্নেয়গিরি, আর এগারোটা কী রকম রকম অদ্ভুত তারা, ঠিক একরকম দেখতে। গুণে দেখলাম। আগ্নেয়গিরিটা থেকে কেবলই ধোঁয়া বেরুচ্ছে। দিদিমার সেই কৌটোটার আঁকা ভিসুভিয়াসের ছবিটার মতন।

মেক্সিকোর টিকিটে ঈগল আর সাপ, গোয়াতেমালায় টিয়াপাখী। সুদানের টিকিটে উট, বোর্ণিওতে গরিলা, আর জাপানে সূর্য। তিন কোণা হাইতিতে পামগাছ, অরানিয়ায় কমলালেবুর গাছ। সিংহলে চায়ের বদলে মহারাণী ভিক্টোরিয়া। নিশ্চয়ই তার অনেক পয়সা। কিন্তু কেমন যেন বিরক্ত বিরক্ত মুখ করে বসে আছে, দেখতে ভালো লাগে না। মনে হয় যেন ইস্কাবনের বিবি, অবশ্য বয়েসে তার চেয়ে বড়। ওর চেয়ে আমার ওলন্দাজদের মহারাণীকে বেশী পছন্দ হয়, যদিও দেখতে ঐরকমই গম্ভীর। দিদিমা বলে নাকি, নিশ্চয়ই দেখতে আরো কুৎসিত, শুধু ডাকটিকিটের জন্য ঐরকম একটু মেজে ঘষে সুন্দর করা হয়েছে তার চেহারাটাকে।

ঐ ভিক্টোরিয়া কিন্তু সর্বঘটে। ইংল্যাণ্ডে, ভারতবর্ষে, হংকঙে, সোমালিল্যাণ্ডে, সেণ্ট হেলেনায়, সিয়েরা লিয়নে। সর্বত্র। ইউরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা, সব জায়গায়। ওতেও ওর আশ মেটে না। এইবার এসে বসেছে ট্রান্সভালে। ট্রান্সভাল হেরে গেলো, যদিও ওদের সেই বীর পীটার ম্যারিৎস্ খুব লড়েছিল। একজামিনের পর বলেকৃ ইস্কুল থেকে বইখানা পেয়েছিল নাকি ভাল করে পড়াশোনা করার জন্যে। আমি কিন্তু ওকে কখনো পড়তে দেখিনি, য়্যানেকৃও পড়ে না। ওরা দুজনেই বলে, ওরা নাকি সব জানে, তাই ওদের বাড়ীতে না পড়লেও চলে। অবশ্য ঐ টাস্কগুলো একটু আধটু করলেই হলো। সেগুলো করবার সময়ে ও বলে—"এসব গাধাদের জন্যে।" পনেরো মিনিটেই শেষ করে ফেলে। আমায় কিন্তু দেখাতে চায় না। বলে আমি ওর কিছুই বুঝবো না।

যাই হোক্ কিছুদিন আগেও ট্রান্সভালে ছিল ঢাল, আর নওর মাঝখানে, চারিদিকে নিশান, আর সবার ওপর ঈগল। আর এখন শুধু একটা নড়বড়ে সিংহাসনে বসে আছে মহারাণী ভিক্টোরিয়া। ট্রান্সভালে সোনা

বড়ো সাহিত্য ও গণ-সাহিত্য

শ্রীপ্রমথ নাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সাহিত্যের আলোচনাপ্রসঙ্গে সাধারণভাবে প্রথমেই বলা যেতে পারে, সব সাহিত্যিকের সাহিত্যই, সব বড়ো সাহিত্যই—তা সে স্পষ্টভাবে সমাজ-সচেতন হোক্ বা না হোক—গতিশীল সাহিত্য, প্রগতিশীল সাহিত্য কারণ সব বড়ো সাহিত্যেই মানুষের আত্মার দিক্‌চক্রবাল ক বিস্তৃত ক'রে দেওয়ার [illegible] হয় বলে প্রেম বিরহ এবং বিবিধ সামাজিক সমস্যাকে [illegible] মানবজীবনের অবলম্বনে একটি সুবৃহৎ আনন্দলোক, একটি দেশকালনিরপেক্ষ অখণ্ড সৌন্দর্য্য-স্বর্গের [illegible] হয়। কবি সাহিত্যিক আপনার জন্য লেখেন,—সে হচ্ছে তাঁর আত্মপ্রকাশ, অস্তিত্বের যে একমাত্র রূপের মধ্য দিয়ে তিনি আপনাকে উপলব্ধি করতে ভালোবাসেন কিন্তু ঐ একই সঙ্গে তিনি সকলেরই জন্য লেখেন। চারিপাশের মানবসমাজ এবং বিশেষ ক'রে সমসাময়িক যুগের অন্তরতম নাড়ীর স্পন্দনকে তিনি একান্তভাবে অনুভব ও প্রকাশের চেষ্টা করেন। তাই, তিনি তাঁর পূর্ণতম মুহূর্তে যখন কথা বলেন, তখন তাতে সব দেশের সব কালের বিশ্বমানবের কণ্ঠ বাজে, গতিশীল ক্রম-বিকাশমান জীবনের মূলতম রহস্যের নিবিড়তম আবেগ সেখানে একান্তভাবে সঞ্চারিত হয় এই সুগভীর অর্থে সব যুগের শ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যিকেরাই—কালিদাস, সফোক্লিস, ইউরিপিডিস্, সেক্সপীয়ার, গোটে, হোমার, ডান্টে, টলষ্টয়, ডষ্টয়েভস্কী, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, হিউগো, রোলাঁ, হুইটম্যান্, এমার্সন্, ওমর খৈয়াম, ডিকেন্স, হার্ডি, এরা সবাই একই সঙ্গে—বড়ো সাহিত্যিক এবং প্রগতিশীল সাহিত্যিক। কিন্তু আজকের জগতের বিশেষ রাষ্ট্র ও সামাজিক পটভূমিকার মধ্যে প্রগতিশীল সাহিত্যের বিশেষ একটি মানে দাঁড়িয়েছে, [illegible] হচ্ছে। কিন্তু সে কথা পরে বলা।

যেমন উপরে বলেছি,—সব বড়ো সাহিত্যই প্রগতিশীল সাহিত্য, সাধারণ অর্থে হিসেবে এ কথা সম্পূর্ণ নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে সেক্সপীয়ার বা রবীন্দ্রনাথ, গোটে বা টলষ্টয়ের বইগুলো খুললেই আমরা দেখব তাঁদের সৃষ্ট জগতে কতো বর্ণোজ্জ্বল বিশালতা, কতো [illegible] রচনা, নৈর্ব্যক্তিক অথচ চিরকালের সৌন্দর্যের ধারায় সেখানে হর্ষ-বেদনা-সংগ্রাম-মুখরিত জনগণের জীবন-কাহিনী জীবনের স্বপ্ন এবং সমস্ত বাধা ও অন্ধকার শক্তিকে অতিক্রম করে যাওয়ার জন্য গৌরবময় চেষ্টা ও বিপুল পণের কথা রূপায়িত হয়েছে। জীবনকে যে সাহিত্য নব নব রেনেসাঁসের পথে অগ্রসর করিয়ে দেয়, উজ্জীবিত করে তোলে,—সেই সাহিত্যই বড়ো সাহিত্য। সে অর্থে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস এবং সাধারণভাবে বৈষ্ণব মহাজনগণ রচিত পদাবলী সাহিত্য, এবং বাংলাদেশের কোণে-কোণে গোধূলির আবছায়াকোমল আলোয় নিঃসঙ্গ সব রহস্যগন্ধী ফুলের মত ছড়িয়ে থাকা অজস্র গান ও লোকসঙ্গীত, যে সবের মধ্যে এ কথাটাই সব চাইতে সুন্দরভাবে ও সবলে ঘোষিত হয়েছে যে

গোয়েবল্‌স ইত্যাদির মতো শক্তিমান্ জার্মান-মনীষী এবং ড্'য়্যানান্‌জিও'র মতো প্রতিভাশালী ইটালিয়ান লেখক ও কবি ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদের ভাব-প্রসারণে নিজেদের নিযুক্ত করেছিলেন। তাইতো বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কিপ্‌লিঙের মতো বিশ্ববিখ্যাত কবিকে এবং সম্প্রতি জার্মান্ এঞ্জেল ইত্যাদির মতো শক্তিমান লেখককে সাম্রাজ্যবাদের জয়গান করতে শুনেছি। বলা বাহুল্য, এই জাতীয় সাহিত্য অধিকাংশ জনগণের কোনরূপ কল্যাণ সাধন করতে পারে না। তাছাড়া, মুষ্টিমেয় একটী শ্রেণীর উগ্র স্বার্থ ও ক্ষমতাপ্রিয়তার সেবায় নিয়োজিত হওয়ার জন্য এ ধরণের সাহিত্যের অন্তর্দৃষ্টি সংকীর্ণ ও অসার্বজনীন হতে বাধ্য, পাঠকের রসবোধকে বিকৃত করতে বাধ্য। কিন্তু এ জাতীয় সাহিত্যের আজ কতগুলো দেশে সৃষ্টি হয়েছে ও হচ্ছে। তাই এর সঙ্গে পার্থক্যের পরিষ্কার সীমারেখা টানবার জন্য গণসাহিত্য বা প্রগতিসাহিত্য এই কথাটা ব্যবহার করবার আজ বিশেষ প্রয়োজন ঘটেছে। সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদের রাজনৈতিক ও কৃষ্টিগত আন্দোলনের সঙ্গে এবং তা থেকে বর্তমান রাশিয়ার বিচিত্র নব জীবনস্রোতের সঙ্গে এ সাহিত্যের কিছু নাড়ীর সম্বন্ধ স্বভাবতঃই ঘটেছে।

কিন্তু যে কথা আগেই বলেছি,—যে কোন দৃষ্টিভঙ্গী, যা নাকি উপরিউক্ত অর্থে সমাজ-সচেতন না হয়েও আমাদের প্রতিটী খণ্ড ব্যক্তিত্বের বা শ্রেণীগত সংকীর্ণ স্বার্থের ক্ষুদ্রতার আবহাওয়া থেকে মুক্তি দেয়, দেশকাল-নিরপেক্ষ অতলস্পর্শী সৌন্দর্য্যের অনির্বচনীয় স্পর্শ, ব্যঞ্জনা আমাদের মনে সঞ্চারিত করে, তা সর্ব্বদাই নিঃসন্দেহে বড়ো সাহিত্য।

সেক্স্‌পীয়ারের অনেক নাটক, গোটের 'ফাউষ্ট', ওমর খৈয়ামের কবিতা, ইমার্সনের অনেক প্রবন্ধ, বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা', রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনা, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী'—'অপরাজিত' প্রভৃতি অত্যন্ত উঁচু শ্রেণীর সাহিত্য-সৃষ্টি—তথাকথিত অর্থে আদৌ সমাজ-সচেতন নয়। সুতরাং আজকের দিনেও গণসাহিত্য রচনার চেষ্টা না করেও বা স্পষ্টরূপে সমাজসচেতন না হ'য়েও বড়ো সাহিত্যিক হওয়া নিশ্চয়ই সম্ভবপর। কিন্তু তীব্ররূপে সমাজ-সচেতন হ'য়ে, প্রধানতঃ অর্থনীতি ও রাজনীতি থেকে উদ্ভূত বহু সমস্যা, সংঘর্ষ ও আন্দোলনের জট-পাকানো বর্তমান শতাব্দীর প্রত্যক্ষ জীবনধারাকে অত্যন্ত বাস্তবরূপে আশ্রয় ক'রে বিশেষ জোর নিপীড়িত, শোষিত, গরীব মানুষদের স্বার্থেই নিজেদের লেখনী ও তুলিকে অস্ত্রের মত ব্যবহার ক'রেও যদি বড়ো সাহিত্যিক বা শিল্পী হওয়া যায় তো অন্ততঃ কিছুকালের জন্য আজকের দিনে তাঁরা যেন প্রধানতঃ তা-ই করেন, যুগের অধিকাংশ মানুষের এই দাবী কি তাঁরা অনুভব করছেন না? এই পথেই যদি আজ বড়ো সাহিত্য রচিত হয়, তবে একই সঙ্গে লেখকের নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্বও অত্যন্ত সার্থকরূপে পালিত হ'বে। তাঁরা তাঁদের আর্টের ক্ষতি না ক'রেও সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে যে শতকরা নিরেনব্বই জন লোককে স্থায়ীভাবে নীচের তলায় রাখবার ব্যবস্থা রয়েছে, তাদের ন্যায্য আসনলাভের লড়াইকে, তাদের নিজস্ব বেদনা—অভিযোগ—মর্য্যাদাবোধকে যদি এমনভাবে সাহায্য করতে পারেন, যা আর কেউ পারে না, তা কি তাঁরা করবেন না? বড়ো সৃষ্টিই বা এদিক দিয়ে কেন হবে না? এই নব-কল্লোলিত গণ-জীবনের সহস্রমুখী জীবনাবর্তকে, কাব্যে অনাস্বাদিত তাদের গরীব জীবনের অলিখিত বৈচিত্র্য-গুলিকে, তাদের উপকরণমাত্র ক'রে যে সমাজ-বিপ্লব সম্ভাবী হ'য়ে উঠ্‌ছে তাকে—আশ্রয় ক'রে রচিত সাহিত্য উচ্চতম সাহিত্যের 'সাব্‌লিমিটি'তেই বা পৌঁছুতে পারবে না কেন?

এই পথের সাহিত্যিকদের মধ্যে আমরা পেয়েছি রাশিয়ার গর্কি, শোলোকভ ও এহ্‌রেণবুর্গকে, পেয়েছি শেষের দিকের রোমাঁ রোলাঁকে, পেয়েছি ইংলণ্ডে আওয়েন, র‍্যালফ ফক্স্ প্রভৃতিকে, পেয়েছি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের

একাধিক খ্যাতনামা লেখককে। একেবারে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি এদের মধ্যে দু'একজনের বেশী কেউ আজ পর্য্যন্ত করতে পারেন নি। কিন্তু আসলে সেটা স্রষ্টার ক্ষমতার উপরই নির্ভর করে। সেজন্য এক্ষেত্রে উপকরণের দোষ দেওয়া বৃথা, বিষয়বস্তুকে দায়ী করার চেষ্টা যুক্তিহীন। এদিক্ দিয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধরের আবির্ভাব আজও বেশি সংখ্যায় না হয়ে থাকলেও ভবিষ্যতে যে হবে না, একথা বলা অর্থহীন। আওয়েন প্রথম মহাযুদ্ধে মারা যান—যুদ্ধবিরতির অল্প ক'দিন আগে মাত্র। যুদ্ধের সত্যিকারের স্বরূপ এবং যে গলদভরা সমাজব্যবস্থা যুদ্ধকে বার বার সম্ভব করছে, তার স্বরূপ আওয়েনের কবিদৃষ্টির সম্মুখে অত্যন্ত স্বচ্ছ হয়ে ধরা পড়েছিল। র‍্যালফ্ ফক্স্ ছিলেন জাতবিপ্লবী আদর্শবাদী ইংরেজ। জেনারেল ফ্র্যাঙ্কোর বিরুদ্ধে যে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসৈনিকবাহিনী স্পেনের গণতন্ত্রের সপক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল, তিনি তাতে যোগ দেন এবং স্পেনের মাটিতেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পড়ে। তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার বিরাট বৈপ্লবিক প্রতিশ্রুতি ছিল, তা অপূর্ণ রয়ে গেল। আরো কতো ইউরোপীয় কবি ও লেখক এমনি ক'রে স্পেন তথা অন্যত্র গণতন্ত্রের লড়াইয়ে জীবন দিয়েছেন, আর্নেষ্ট টলারের মতো হিটলারের Concentration Camp এতে অমানুষিক নির্য্যাতন সয়ে শেষ রক্তবিন্দু বিসর্জ্জন করেছেন অকপট আদর্শ-বাদের ঋণ শোধ্‌তে গিয়ে। কিন্তু তাঁদের লেখা রয়েছে। বুকের রক্ত দিয়ে লেখা সে সব সাহিত্য সর্ব দেশের প্রগতি, স্বাধীনতা ও শোষণাবসানের আন্দোলনকে অনুপ্রেরণা যোগাবে। 'I will not Rest' এবং অন্যান্য অসাধারণ বইয়ের অক্লান্ত মানবপ্রেমিক লেখক রোলাঁ, নাটকের আর অনবদ্য গ্রন্থভূমিকাগুলোর মধ্য দিয়ে তীব্র কশাঘাতে যিনি সমাজকে রোগমুক্ত করতে প্রয়াস পেয়েছেন সেই বার্ণার্ড শ, সমাজ ও রাষ্ট্রচৈতন্যের উজ্জীবনের জন্য যিনি গদ্যে পদ্যে অশ্রান্তভাবে কলম চালিয়ে গেছেন সেই ওয়েলস্, আমেরিকার মহীয়সী লেখিকা পার্ল বাক্, নাৎসীবাদকে অস্বীকার করার অপরাধে নির্বাসিত বিখ্যাত জার্ম্মাণ কথাশিল্পী টমাস ম্যান, সভ্যতার সংকটে বার বার সাবধান বাণী উচ্চারণকারী, পথনির্দেশকারী রবীন্দ্রনাথ, নূতন জীবন ও নূতন পৃথিবীর সত্য-স্বাক্ষরিত বলিষ্ঠ বাস্তববাদী সাহিত্যের স্রষ্টা গর্কি শোলোকভ, ম্যালেক্সী টলষ্টয়, এহ্‌রেণবুর্গ প্রভৃতি রাশিয়ান্ লেখক,—এদের এবং বিংশ শতাব্দীর অনুরূপ অন্যান্য লেখকদের কাছে এই শতাব্দীর সংগ্রামরত সাধারণ মানুষদের ঋণ অপরিসীম। (যদিও সংজ্ঞার চুলচেরা বিচারে এঁরা সবাই হয় তো গণ-সাহিত্যের স্রষ্টা নন)।

আধুনিক বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যে এই নব-জীবনোচ্ছলতার সুর যথেষ্ট গভীর হয়ে ফুটে উঠেছে কি? ভারতবর্ষের পায়ের শিকল আজও খুলে পড়েনি', তবে তা অনেকটা ঢিল হয়েছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারত স্বাধীনতা পাওয়ার দিকে যতো এগোচ্ছে, ইংরেজ-হস্তান্তরিত ভারত-শাসনতন্ত্র এবং দেশের সম্পদসৃষ্টির যন্ত্র ও পথগুলোকে একান্তভাবে কবলিত করবার জন্য দেশের পুঁজিপতিরা তত বেশী সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছেন, তার লক্ষণ সুস্পষ্ট। এরই ফল স্বরূপ দেশের শ্রমিক-কৃষক-কেরাণীদের আন্দোলন-গুলোকে, গরীব ও মধ্যবিত্তের রুটী ও ন্যায্য অধিকারের লড়াইকে পিষে মারবার তোড়জোড়ও সুরু হয়েছে বড়ো বড়ো কথার আড়ালে। দেশের জীবনের অনুরূপ বিরাট পরিবর্তনের ক্ষণে এরকমই প্রথমটা ঘটে, ইতিহাস বলে। ভারতবর্ষেও সেই অত্যন্ত অর্থপূর্ণ, সংঘর্ষপূর্ণ, বিরাট ঐতিহাসিক মুহূর্ত প্রায় সমাগত। চারিপাশের গরীব মানুষদের জীবনের দুঃখকে আশাকে ন্যায্য দাবীর লড়াইকে, তাদের বিরুদ্ধে নিজ দেশেরই বড় লোকদের ক্রমবর্দ্ধমান ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের ক্রমবর্দ্ধমান গতিকে জ্বলন্ত ভাষার আখরে জীবন দিয়ে কি আজকের দিনের ভারতীয় লেখক ও শিল্পী একাধারে তাঁদের আর্টগত সমাজগত কৃষ্টিগত ও নৈতিক দায়িত্ব নিঃসন্দেহরূপে পালনের অকপট প্রয়াস করবেন না? সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

ও গৃহযুদ্ধের উসকানীদাতাদের, চোরাকারবারীদের, কালোবাজারী টাকার জোরে ফেঁপে ওঠা হঠাৎ-নেতাদের, দেশের পুঁজিপতিদের স্বার্থে বিদেশী পুঁজিপতিদের সঙ্গে গোপন রফাকারিদের বিরুদ্ধে তাঁদের হৃদয় ও দৃষ্টি, লেখনী ও তুলি কি আজ গর্জ্জে উঠবে না জ্বলে উঠবে না? গর্জ্জে যে উঠবেই, জ্বলে যে উঠবেই, আমাদের বাংলা সাহিত্যে এবং কিছু কিছু অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যেও তার প্রমাণ মেলা সুরু হয়েছে। ঝড়ঝাপটা সত্ত্বেও নব জীবনের বন্যা যে আসবেই, আসছেই,—নতুন সাহিত্য ও শিল্পকারদের নতুন মূল্যবোধ ও নতুন বনিয়াদের জন্য লড়াকু মনে তার নিশ্চিত আভাস ফুটে উঠছে, তাদের রচনায় তা বিকিরিত হচ্ছে। কিন্তু তারা আরও সচেতন হ'ন। ভারতের সাম্প্রতিক ঝড়ো হাওয়ার পুরো অর্থ এবং আসন্ন ভবিষ্যতে শ্রেণীস্বার্থের অনিবার্য্য সংঘাতে ভরা তীব্র সময়টাকে তাঁরা অনুভব করুন। তাঁদের দায়িত্ব পালনে তাঁরা প্রখরতর হ'ন, প্রবলতর হ'ন, ত্বরিততর হ'ন।

সাহিত্যের বিষয়বস্তু, দৃষ্টিভঙ্গী এমন কি আঙ্গিকেরও বৈপ্লবিক পরিবর্তন বর্তমানে যেন ঐতিহাসিক প্রয়োজনই হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ, সাহিত্যকে জীবন্ত ও গতিশীল রাখতে হ'লে কাল হতে কালান্তরে তার রূপ ও ঢংএর পরিবর্তন হ'তেই হ'বে, এই সাধারণ আর্টগত প্রয়োজন ছাড়া ও অন্যতর প্রয়োজনে। বড়লোক, অভিজাত সমাজ, বড়জোর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনকথা নিয়েই সব দেশে এ পর্য্যন্ত খুব বেশীর ভাগ সাহিত্য রচিত হয়েছে। মানবজাতির ভগ্নাংশমাত্র হ'য়ে দেশে দেশে যে অগণিত জনসাধারণ যুগের পর যুগ তাদের নগণ্য জীবনযাত্রার অগণ্যতায় আবৃত থেকে কোনমতে প্রাণধারণ করেছে, সাহিত্যে যাদের ছবি আঁকবার কথা কারও মনেই বড় একটা হয়নি, সেইসব শোষিত মানবমণ্ডলীর, সেইসব কৃষক মজুর নিম্নমধ্যবিত্ত এবং অত্যন্ত সাধারণদের সাধারণ জীবনের অসাধারণ কাহিনীকে সাহিত্যে রূপ দেওয়ার দায়িত্ব আজ সাহিত্যিকের। বাস্তব জীবনে যেমন তাদের অবহেলা ও অত্যাচার করার দিন শেষ হয়ে আসছে, সাহিত্যেও তেমনি আজ তারা নিজেদের কথা শুনতে চায়, নিজেদের দেখতে চায়। তাদের এ দাবী অত্যন্ত ন্যায্য। তাদের নিজেদের ইচ্ছার দিক্ থেকে, তথা সমাজের সামগ্রিক প্রয়োজনের দিক্ থেকে। সাহিত্যিক, কবি যখন জীবনের কোনো কিছুকে তুচ্ছ বলে সাহিত্যের সিংহদ্বার থেকে আর ফিরাতে পারেন না, এদের কথা তিনি, বিশেষ ক'রে আজিকার বিশেষ কালের পারিপ্রেক্ষিককে—ভুলবেন কি ক'রে? অবশ্য বলাই বাহুল্য, সাহিত্যে যখন এদের জীবনের সুখদুঃখ, আলোনন্দ, সমস্যাকে স্থান দেওয়া হ'বে তখন তাকে সাহিত্যরূপেই করা হ'বে,—প্রোপাগাণ্ডা বা অন্য কিছুরূপে নয় শুধু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর নয়, তথাকথিত ভদ্রশ্রেণীর নয়, পরন্তু সকল মানুষের মর্ম্মমুকুরই আজ হোক্ সাহিত্য। নবযুগের নব প্রাণশিখা সেখানে স্পন্দিত হোক্। এখানে লেনিনের একটা উক্তি স্মরণ করি:

"Art belongs to the people. It must let its roots go down deep into the very thick of the masses. It must unite the feeling, thought and will of the masses, uplift them. It must awaken the artists mong them and develop them. Must we provide fine cakes for a small minority while the masses of warkers and peasants still lack black bread?"

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অর্থনৈতিক বৈষম্যের চাপে নির্য্যাতিত হচ্ছিল যারা সেই সব নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণী, সেইসব শোষিত কৃষক ও শ্রমিকের অধিকার ও পূর্ণ মর্য্যাদা ফিরে পাওয়ার আন্দোলনের শেষ পর্ব্ব আরম্ভ হয়েছে দেশে দেশে,—অগ্রসরী শিল্প সাহিত্যেও সেই বিপ্লবের বহ্নিশিখা। সারা পৃথিবীতে যে ঝড় উঠেছে, এর পারে আছে নূতন

উলুখড়

নবেন্দু ঘোষ

আজিজ চুপ করেই রইল। জোহরাকে সে চেনে, সে জানে যে জোহরা যখন রেগে যায় তখন তাকে কিছু না বলাই ভাল, এমনকি সে যদি অন্যায় কথাও বলে তবু তা চুপচাপ শুনে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন দেখে যারা বড় হয় তারা দুঃখে, অভাবে, স্বপ্নশেষের ব্যর্থতায় মাথা ঠিক রাখতে পারে না। জোহরারও ঠিক সেই অবস্থা। শৈশবে, কৈশোরে সে লায়লা মজনুর কিংবা ফরহাদের কাহিনী পড়েছিল, পড়েছিল আরব্য-রজনী ও হাতেম-তাইএর কাহিনী, আর সেই সব কাহিনী পড়ে পড়ে সে মনের মধ্যে হাওয়াই কেল্লা তৈরী করেছিল, অনেক অসম্ভবকে তার জীবনে সম্ভব হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু বেচারা আজিজ, ট্রামের কন্‌ডাক্টর আজিজের সঙ্গে তার বিয়ে হওয়ার পর থেকে সেই হাওয়াই কেল্লা হাওয়াতেই মিলিয়ে গেছে, সেই সব বহুবিচিত্র স্বপ্ন আজ ধোঁয়ার মত কোথায় উড়ে গেছে।

তবু চলছিল। বাস্তব যতই রূঢ় হোক, অসহ্য হোক, বেঁচে থাকার একটা আনন্দ আছে। কঠিন পরিশ্রমের পর, বস্তীর একঠা স্বল্প-পরিসর নোংরা ঘরে, কেরোসিনের ডিবার ধোঁয়াটে অস্পষ্ট আলোতে জোহরার অতীত স্বপ্ন আজিজের চোখেই ঘনায়। আজিজ অবাক হয়ে যায়। একি স্বপ্ন দেখছে সে! জোহরা কি সেই সব বিচিত্র কাহিনীরই কোনো একটি নায়িকা! আর তার পাশে তার মেয়ে রাবেয়া যেন বেহেস্তের একটা ছদ্মবেশী পরী। আশ্চর্য্য! আর জোহরা! অবশ্য স্বপ্ন দেখে না সে, অল্প আয়ের সংসারে রথুঁটিনাটি তো আজিজ তার চেয়ে বেশী জানে না সে শুধু জোহরাই জানে যে তিনটি পেট চালাতে আজকাল-কার এই বাজারে কি বেগ্ পেতে হয়। তবু চলছিল, গড়িয়ে গড়িয়ে, থিতিয়ে থিতিয়ে, বেঁচে থাকাটাকেই একটা বড় ব্যাপার মনে করে, পরস্পরকে ভালবেসে।

কিন্তু হঠাৎ সেই বেঁচে থাকার ব্যাপারটাই সন্দেহজনক হয়ে উঠল এবং তা সন্দেহজনক হওয়ায় ভালবাসাটা পীড়াদায়ক হয়ে উঠল, মনে হল যে যাদের আজিজ ভালবাসবে তাদের সে যদি পেটভরে না খাওয়াতে পারে তাহলে সে ভালবাসা যেন একটা অপরাধ। কেন? ষ্ট্রাইক—ধর্ম্মঘট! ট্রাম কোম্পানীর শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করেছে। কোম্পানীর শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের গাফিলতী আর অবিচার আর সহ্য করা যায় না, আর সহ্য হয় না দীনভাবে তাদের হীন প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখা।

ধর্ম্মঘট চলছে। একদিন দু'দিন করে আজ দু'মাস অতিক্রান্ত হতে চলেছে। দিনের পর দিন কাটল, সঞ্চিত যা কিছু ছিল তা প্রায় ফুরিয়ে এল, অবশেষে দিন পনেরো বাদে পেটে টান পড়ল। তখন অনন্যোপায় হয়ে আজিজ একটা কাজ শুরু করল। যা কিছু শেষ সম্বল ছিল তাই দিয়ে সে কিছু মনিহারী জিনিষ কিনে শিয়ালদার মোড়ে গিয়ে ফুটপাথের ওপর বিছিয়ে বসল, হিসেব করে দেখলে যে দৈনিক টাকাখানিক লাভ হলেই তার চলে যাবে বেশ। তাছাড়া উপায় কি, ধর্ম্মঘট যে অনেকদিন চালাতে হবে তা তারা বুঝতে পারছে, তাছাড়া অন্যান্য সবাই

বিবির যাওয়ার ভঙ্গী দেখে নীরবে হাসল আজিজ। রাগ করতে সে পারল না, একটা কথা বলে জোহরার রাগকে আরো বাড়াবার মত দুঃসাহসও তার হল না। তাই সে শুধু হেসেই থেমে গেল। মেয়ের দিকে তাকিয়ে সে বলল "কি বেটি তোর পুতুলা কেমন আছে ?"

ঘাড় বাঁকিয়ে রাবেয়া গম্ভীরভাবে বলল "ভাল।"

মেয়ের দিকে পর্য্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে তাকাল আজিজ, পুতুলের মতই রাবেয়ার জামা আর পাজামাটা ছিঁড়ে গেছে, লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা রুক্ষ চুলগুলো দেখে বুকটা হুহু করে তার। ছোট একটা নথলাগানো ময়লা মুখটায় একজোড়া জলজল তারার মত দুটো চোখ। আর দুটো লালচে ঠোঁট। আজিজের দরিদ্র সংসারে একটামাত্র ঐশ্বর্য্য ঐ মেয়েটা। প্রথম যৌবনের সেই উচ্ছল রঙীন দিনগুলো আর নেই তখন জোহরাই ছিল সব। আজকাল রাবেয়াই সব। অথচ—

"বেটি—"

"আব্বাজান ?"

"তোর একটা নতুন পুতুল হলে বেশ হয়, তাই না ?"

"হ্যাঁ"—খুব মৃদুকণ্ঠে বলল রাবেয়া।

"দেব শিগগীরই এনে দেব তোকে। যেদিন আমাদের স্ট্রাইক থামবে সেদিন আমার প্রথম কাজ হবে তোকে একটা নতুন পুতুল এনে দেওয়া বুঝলি ?"

রাবেয়ার দু'চোখ উজ্জল হয়ে উঠল, বাপের গলা জড়িয়ে ধরে সে বলল "সত্যি ?"

"হাঁ বেটি সত্যি। আচ্ছা তখন এই পুরানো পুতুলটা দিয়ে কি করবি ? ফেলে দিবি ?"

রাবেয়া চট করে জবাব দিল না। সে তাকাল ছেঁড়া পুতুলটার দিকে একবার হাত বুলোল তার গায়ে, পরে মাথা নেড়ে বলল, "উঁহু নেহি। এও থাকবে, নতুনটাও থাকবে।"

এতদিনকার পুতুলটা—সুখদুঃখের কত মুহূর্তের সঙ্গী। আজ একটা নতুন পুতুল এলেই কি এর দাম কমে যাবে! উঁহু। রাবেয়া অকৃতজ্ঞ নয়। না পুরানোটাও থাকবে, নতুনটাও থাকবে।

"আচ্ছা বেটি—তুই খেলা কর, আমি একবার যাই।"

"কঁহা আব্বাজান ?"

"কুছ রুপি যোগাড়ের কা বন্দোবস্ত করনে"—তারপরে সে তার হারেমের গোসাঘর মানে সেই খুপরীর মত রান্নাঘরটার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, "আজি শুনতি হো ?"

জবাব এল "নেহি।"

"খাপা না হো বিবি—যাও চলনা—"

জবাব নেই

"শুনা জী—রাবেয়া কা বাপনে চলা আব—"

জবাব এল "যায় নেহি শুননি—"

আজিজ সশব্দে হেসে চলল "বাস বাস কাফি শুনি—অব যায় চলা।"

ঘরের কোণ থেকে ছোটো বড় পোঁটলা মত তুলে নিয়ে সে একবার মেয়ের চিবুকটা ধরে নেড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

আজ পেছন পেছন জোহরা এগিয়ে এল না কিন্তু পাঁচ বছরের রাবেয়া তার ছেঁড়া পুতুলটাকে বাঁহাতে দিয়ে বুকে চেপে ধরে এগিয়ে এল দরজা পর্যন্ত। দরজায় হেলান দিয়ে সে ঠিক মায়ের ভঙ্গীতেই তাকাল বাপের গমন পথের দিকে। তার কচি মুখে একটা গম্ভীর ভাব, যেন তার বয়স নেহাৎ কম নয় যেন মানুষের দুঃখ কষ্টের সমস্ত ইতিহাসই সে জেনে ফেলেছে।

চলতে চলতে একবার পিছন ফিরে তাকাল আজিজ। নেহাৎই অভ্যাস তাকিয়ে সে যা দেখল তাতে তার বুকটা ফুলে উঠল দুলে উঠল চোখে জল এল। তার আর দুঃখ করবার নেই। অনেক দুঃখ পেয়েছে সে অনেক লড়াই করেছে, হয়ত আরো দুঃখ পাবে, আরো লড়াই করতে হবে। কিন্তু সমস্ত দুঃখের মাঝে একটা অপরূপ ফুল ফুটেছে তার জীবনে। ঐ মেয়েটা। তার দেহেরই একটা অংশ।

কাঁটার বেদনাকে যেমন একটা রক্তগোলাপ ভুলিয়ে দেয় তেমনিভাবে এ মেয়েটা তার দুঃখদীর্ণ জীবনকে সার্থক করে তুলেছে। জোহরার পর আর একজন তবে দেখা দিয়েছে যে আজিজকে ভালবাসে, প্রাণ দিয়ে ভালবাসে।

শিয়ালদা আর বৌবাজারের মোড়ে গিয়ে বাঁদিককার ফুটপাথের একপাশে আজিজ বসল, পোটলাদুটোকে খুলে বিছোল, জিনিষপত্রগুলোকে সাজাল। পেন্সিল, ব্লেড, ন্যাপথালিন, ছুঁচ, বোতাম, খেলনা, বল, উর্দুতে লেখা ছোট ছোট গান আর গল্পের বই, চিরুণী, জুতোর কালি, জিভছোলা এমনি নানা জিনিষ। লাইসেন্স নেই তবে পাহারাদার পুলিশদের দু'এক আনা দিলেই সব ঠিক থাকে।

তার আশেপাশে আরো নানা রকমের বিক্রেতা। জুতো পালিশ করনেওয়ালা দু'জন, একজন [illegible] বিক্রেতা, দু'তিনজন কমলালেবু বিক্রি করছে, একজন একঝুড়ি ডাব নিয়ে বসেছে, এমনি আরো অনেকজন আছে। সারা জীবন ধরে, দিনের পর দিন ওরা এমনি ফুটপাথে বসে জিনিষ বিক্রি করে, সংসার চালাবার আর কোন জীবিকাকে অবলম্বন করে ওদের কোনো ঘর নেই মাথার ওপর নেই কোনো আচ্ছাদন, গ্রীষ্মের আগুন আর বর্ষার জল দেখে ওদের জীবন-সংগ্রাম থেমে যায় না। সমস্ত বাধা বিপত্তিকে অগ্রাহ্য করে, ভেঙ্গে চুরে, ওরা নিজেদের বাঁচিয়ে রাখে।

খেয়ে দেয়ে এসেছে আজিজ। একেবারে সন্ধ্যের সময় বাড়ী ফিরবে বলে ওপাট সে চুকিয়ে বেরিয়েছে। এখন অফিসটাইম। জনস্রোত দ্রুতগতিতে বয়ে চলেছে। মানুষের জীবন-নদীর এ এক বিচিত্র রূপ। বাসে ঝুলতে ঝুলতে চলেছে সবাই, জায়গায় কুলোচ্ছে না। সে অবস্থাতেও গেলে তো হোত কিন্তু তাই বা হচ্ছে কোথায়। বেশীর ভাগ লোকই হেঁটে যাচ্ছে। প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতেই বলা চলে। কেন? আগে তো এমন হোত না, শতকরা প্রায় নব্বইজন লোকই কোনো না কোনো কিছুতে চড়ে যেত। তবে? আজিজ তাকাল রাজপথের দিকে। ট্রামলাইন। দু'মাস আগে সেগুলো চকচক করত এ সময়টাতে, তার খাঁজে খাঁজে আজ ময়লা, আজ তার দীপ্তি অন্তর্হিত। আজিজ তার বুকের ওপর হাত রাখল। সেফটিপিনে আঁটা একটা লাল কাগজ—তাতে লেখা 'ধর্ম্মঘটী ট্রামশ্রমিক'। আজ ট্রাম চলছে না, দু'মাস ধরে চলছে না। লক্ষ লক্ষ নাগরিকের সেবা করেও তারা সসম্মানে বাঁচতে পাবছে না বলে আজ ট্রাম চলছে না। আজ ইলেকট্রিকের তারে বিদ্যুতের আগুন জ্বলছে না, পিচের পথ কাঁপছে না, শব্দ উঠছে না—ঘটাং ঘট্ ঘট্ ঘট্ ঘণ্টা বাজছে না—টং টং টং। আজ সব শান্ত, স্তব্ধ। শুধু বাসগুলো এক তাল সামলাতে গিয়ে ক্ষ্যাপার মত ছুটোছুটি করছে, রিকশা-ওয়ালারা গলদ্ঘর্ম্ম হচ্ছে, ঘোড়ারগাড়ী আর ট্যাক্সি যা ইচ্ছে তাই দর হাকছে। আজ সব নীরব। ট্রাম চলছে না। এবং তাদের সম্মান না করলে ট্রাম চলবেও না, একটাও না।

জিনিষপত্রের সামনে চুপ করে বসে থাকে আজিজ। বড় অদ্ভুত লাগে তার এই নতুন বৃত্তিটাকে। অন্যমনস্কভাবে সে তাকায় চারদিকে। অনতিদূরে শিয়ালদা ষ্টেশন, তার ওপরকার আকাশে কালো ধোঁয়া মিলিয়ে যাচ্ছে, একটা এঞ্জিনের তীক্ষ্ণ শব্দ। শিয়ালদা ট্রামডিপোর দেয়ালের পাশে একটা মস্ত বড় বিজ্ঞাপন—তাতে একটা সুদর্শনা নারীর মুখ। ও ফুটপাথের একজন ফলওয়ালা তার আপেলগুলোকে মুছচে। বেলা বাড়ছে। চৈত্রমাসের রোদ যেন উত্তপ্ত ছোরার মত।

"ওহে, পেন্‌সিলগুলো কত করে?"

আজিজের চমক ভাঙ্গল। একজন ক্রেতা।

এমনি আরো অনেকে আসে।

'ব্লেডের প্যাকগুলো কত করে—ঐগুলো?"

এক টাকা—"

"এক টাকা! বল কি হে—এঁ্যা?"

এমনি আরো অনেক ক্রেতা আসে। কেউ কেনে, কেউ কেনে না।

"খুব তকলীফ হচ্ছে ?"

"উহুঁ—"

"আচ্ছা বেটি, তোর পুতলা কোথায় ? বি করছে সে এখন ?"

"সে এখন নিদ যাচ্ছে, ওর ও ভবিয়ৎ খারাপ। আমার ভবিয়ৎ ঠিক না থাকলে তাবও খারাপ হয়ে যায়—"

আজিজ আর জোহরা হাসল।

মেয়ের একপাশে বসল আজিজ আর একপাশে বসল জোহরা। বসে বসে তারা অনেকক্ষণ ধয়ে কথাবার্তা বল্‌ল। সংসারের খুঁটিনাটিব কথা, অভাব অভিযোগের কথা।

হঠাৎ জোহরা এক সময়ে প্রশ্ন বরল, "তাহলে তুমি কাল কাজে যোগ দেবে না ?"

"না জোহরা"—আজিজ মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল।

"লেকিন্—"

আজিজ জোহরার একটা হাত চেপে ধরল, "জোহরা—'

জোহরা থেমে গেল, তারপরে মৃদু হাসল, বুঝেছি, কিছু মনে করো না, লোভী, বড লোভী আমি।"

জোহরার হাতে মৃদু একটা চাপ দিল আজিজ আর একটু হাসল।

"যাই, রুটি বানাইগে"—হঠাৎ জোহরার অসমাপ্ত কথার কথাটা মনে পড়ল।

"জোহরা—"

"কি ?"

"তুমি কি এখনো রাগ করে আছো ?"

"না।"

জোহরা চলে গেল, মেয়েকে কোলে নিয়ে চুপ করে বসে রইল আজিজ। জোহরার কথায় কিন্তু যুক্তি আছে। সাধারণের জীবন-দর্শন। কিন্তু সে কি করে জোহরাকে বোঝাবে যে আর সহ্য করা যায় না, পৃথিবীতে মুষ্টিমেয় স্বার্থবানেরা কোটি কোটি লোককে বঞ্চিত ও হতভাগ্য করে রাখছে। সে কি করে জোহরাকে বোঝাবে যে তারা সেই সব রাজা আর নবাব বাহাদুরদের, মালিক আর জমিদারদের ধ্বংস করবে।

পরদিন সকালে রাবেয়ার জ্বর কমল না, বরং বাড়ল। আজিজ দৌড়োল হাকিম নিজামুদ্দিনের কাছে। হাকিম তাকে আশ্বাস দিল যে ব্যাপার এমন কিছু নয়, ও সেবে যাবে। এক শিশি ওষুধ নিয়ে বাড়ী ফিরল আজিজ মেয়েকে খাওয়াল, তার পাশে এসে বসল, নানা কথায় মেয়ের মুখে সে হাসি ফুটিয়ে তুলল। তারপরে একসময়ে রান্নাঘরের দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল

'খাবে ?" জোহরা প্রশ্ন করল

"হুঁ—'

'বোস।"

খেতে বসল আজিজ।

"কোথায় যাবে এখন ?' আড়নয়নে তাকাল জোহরা। সে তার স্বামীকে চেনে। সে জানে কি জবাব দেবে সে, কোথায় যাবে আজিজ। তবু মুহূর্তের জন্য ভাবতে ভালো লাগল তার যে আজিজ হয়ত বলবে যে সে কাজে যোগ দেবে সে জোহরার উপদেশকেই মেনে চলবে আর তার এই আনুগত্য প্রকাশিত হলে জোহরার হৃদয়টা অদ্ভুত একট আত্ম-তৃপ্তিতে ভরে উঠবে, চোখে মুখে ঝলসে উঠবে বিজয়িনীর গর্ব।

কিন্তু আজিজ যা বলল তা এই, 'কোথায় যাব আবার, শিয়ালদার মোড়ে -আজ আবার কিছু কমলালেবুও বিক্রী করব—বেশ লাভ হয় ওতে। গরমের দিন, লোকে পিয়াসের জ্বালায় কিনবেই এক আধটা। কাল আমি করিম মিঞার সঙ্গে কথা বলেছি—একশ কমলালেবু সে আমায় বিক্রী করতে দেবে - জমা লাগবে না কিছুই।'

বল্‌তে বল্‌তে উৎসাহিত হ'য়ে উঠল আজিজ।

জোহরা তাকাল স্বামীব দিকে। সে কি নিরাশ হল ? স্বামী তার কথায় কান দিচ্ছে না বলে সে কি আবার রেগে যাবে আজ ? কিন্তু না, কোন জ্বালাই তো সে অনুভব করছে না। তার স্বামী সমস্ত বাধাকে জয় করে সৈনিকের

মত অবিচলিত রয়েছে জেনে, তার কাছে সে হার মানল না দেখে জোহরা হঠাৎ খুশীই হল। স্বামীকে হারাবার আত্মগর্ব্বের থেকে স্বামী যে অপরাজেয় এই স্বামী-গর্ব্বই তার যেন বেশী হল। নিজের মনকে দেখে খুসী হল জোহরা আশ্বস্ত হল। তবু তর্ক করার ঝোঁকটা সে এড়াতে পারে না সে।

সে বলল, "কিন্তু লীগের মন্ত্রীরা যে কথা বলেছেন তা কি মিথ্যে ?

আজিজ মুখ তুলল, উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, "সব মিথ্যে জোহরা সব ঝুটা। ওরা পাকিস্তান আর হিন্দুস্তানের কথা ভাবছে ভাবছে নিজেদের পেট মোটা করার কথা নিজেদের জবরদস্ত আর দৌলৎমন্দ করার কথা। পাকিস্তান কথাটা শোনায় ভালো, হলে ওদেরি লাভ, আমরা যে কে সেই থাকব। যখন মুসলমানেরা দেশের মালিক ছিল তখনো আমরা গরীব, এখনো তাই থাকব। তাই ওসবে ভুললে আমাদের দুঃখ কোনদিনই দূর হবে না জোহরা—"

"তাহলে তোমরা কি করবে ?"

"যা করছি—লড়াই। গরীবেরা এক জাত—তাতে হিন্দু মুসলমান নেই—"

জোহরা চুপ করে গেল।

খাওয়া শেষ করে উঠে গেল আজিজ।

পোঁটলা নিয়ে সে যখন বেরোবার উপক্রম করছিল এমনি সময়ে ডাকল রাবেয়া।

"আব্বা—"

"হাঁ বেটি—"

"শুনো—"

"হাঁ হাঁ বোলো বেটি"—রাবেয়ার পাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল আজিজ, "ক্যা বাৎ হ্যায় বেটি ?"

"বোলুঁ ?"

"বোলো—বোলো" -মমতায়, স্নেহে কণ্ঠ আর্দ্র হয়ে এল আজিজের। মেয়ের জ্বরোত্তপ্ত ললাটের ওপর হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সে।

রাবেয়া তাকালো, ক্ষীণ হাসি হেসে বলল, "নয়া পুৎলা আজ লাও গে ?"

"আজ বেটি—আজ ?"

"আজ না হোয় তো কাল ?"

"হাঁ হাঁ—লাউঙ্গা—"

আজিজ ছোট একটা চুমু এঁকে দিল মেয়ের ললাটে, তারপরে উঠে বলল, "আনব বেটি—এবার তুমি ঘুমোও, কেমন ?"

"আচ্ছা"—মাথা নাড়ল রাবেয়া। নতুন পুতুল আসবে, আর কি চাই। মুখে তার হাসির আভাস দেখা গেল দেখা গেল একটা চাপা উত্তেজনা।

জোহরা তাকিয়ে তাকিয়ে বাপ-মেয়ের এই ছবিটি দেখল। তার চোখ দুটো একটা অপরিচিত অনুভূতিতে জ্বালা করতে লাগল। ছোটবেলার রূপকথা তার জীবনে সত্য হয়েছে—হয়ত অন্যভাবে, তবু তা সত্যই হয়েছে। তার পুরুষ, তার ঐ ননীর মত, চাঁদের মত মেয়েটা—এরা কি কত ঐশ্বর্য্য। নয়, জোহরার দুঃখ করবার নেই।

আজিজ বেরিয়ে গেল।

চলতে চলতে সে তাকালো চারিদিকে। আবার সেই ছবি। অফিসমুখী জনতা। ভর্ত্তি রাস্। ব্যস্ত পদক্ষেপ। আর ওদিকে লোহার লাইনে চাকচিক্য নেই, তার খাঁজে খাজে ধুলো। বিদ্যুতের তারে আগুন জ্বলছে না, শব্দ হচ্ছে না ঘটাং ঘট্ ঘট্ ঘট্, বাজছে না টং টং টং। ট্রাম চলছে না। অন্যায়ের প্রতিবাদে সব থেমে গেছে। অন্যায় দূর হলেই আবার তা চলবে। লীগ ? মন্ত্রীসভা ? হাসল আজিজ। সে খুব চিনেছে তাদের। মানুষকে ঘৃণা করতে শেখাচ্ছে তারা নিজেদের স্বার্থ বাঁচাবার জন্য সাধারণ মুসলমানের হাতে তারা ধারালো ছোরা গুঁজে দিয়েছে। শুধু আজিজের মত শ্রমিকেরাই তাদের সেই ছোরাকে গ্রহণ করেনি, তারা জানে ওদের মৎলব কি। তাই ওসব ভাঁওতায়

তারা ভুলবে না। আজ কুড়ি তারিখ। কোম্পানীর নোটিশ। কিন্তু কার সাধ্য ট্রাম চালাবে? শেয়ালদার ট্রাম ডিপোতেই আজ আজিজের ডিউটি। সে তার জিনিষপত্র বিক্রি করবে আর লক্ষ্য রাখবে। যদি কেউ চালায় তবে বাধা দেবে। ইউনিয়নের নির্দ্দেশ সে কাল রাতে পেয়েছে। যদি দরকার হয় তবে গুন ঢালবে আজিজ। জানোয়ারের মত দিনের পর দিন বেঁচে থাকার চেয়ে বাহাদুরের মত গুন ঢালা ঢের ভালো।

খুব খুশী মনে বাড়ী ফিরল আজিজ। কুড়ি তারিখের সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরল সে। তারা জিতেছে আজ। সংগ্রাম শেষ হয়নি তবু আজ একটা যুদ্ধ-ক্ষেত্রে তারা তাদের ঝাণ্ডা উড়িয়েছে। আজ একটা ট্রামও চলতে পারেনি। একটা ও না সাধারণ মুসলমানদের দাঙ্গার নামে উস্কে তাদের ধর্ম্মঘটকে মাটি করতে চেয়েছিল সদাশয় দেশী সরকার—কিন্তু তা ও ব্যর্থ হয়েছে। আজ তারা আর এক ধাপ এগিয়ে গেল তাদের আসন্ন বিজয়ের দিকে।

কিন্তু বাড়ী ফিরে মনের আলোটা দপ করে নিভে গেল।

মুখ শুকনো করে রাবেয়ার পাশে বসে আছে জোহরা। স্বামীকে দেখে যেন স্পন্দন ফিরে পেল সে।

"কি হয়েছে বিবি—এঁ্যা?" আজিজ শঙ্কিতচিত্তে প্রশ্ন করল।

ঠোঁট নড়ল জোহরার, বলল, "রাবেয়া—"

মেয়ের দিকে তাকাল আজিজ। চোখ বুজে ঘুমের মত শুয়ে আছে রাবেয়া। বোধ হয় ঘুমোচ্ছে।

"কি হল রাবেয়ার—এখন জ্বর কি রকম?"

শুষ্ককণ্ঠে জোহরা বলল, "জ্বর আরো বেড়েছে, শির ধুইয়ে দিয়েছি তবু জ্বর ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে—"

"সকালের দিকে তো একটু কম ছিল—"

"হুঁ—"

"তাহলে—কি করি?"

"হাকিমের কাছে যাও—"

"তাই—তাই যাই—তুমি, তুমি ততক্ষণ একটু জল-পটি দাও ওর শিরে, কেমন?"

"আচ্ছা—"

উত্তেজিতভাবে আবার ঘর থেকে বেরোল আজিজ। হাকিম নিজামুদ্দিনের কাছে গেল। হাকিম আবার তাকে অভয় দিল। এমন কি ব্যাপার আজিজ, ঘবড়ো মৎ বেটা, ঠিক হো জায়েগা। আরো দুটো শিশি দিলে হাকিম। দাম এক টাকা। ট্যাকের সব কিছু বের করে দিয়ে খুয়ে রইল ছয় আনা। আজ লাভ হয়েছিল পাঁচ সিকা মত। কালকের দু'আনা ছিল। রাবেয়ার পুতুল কেনা এখন অসম্ভব। আহা বেচারী নিজে মুখ ফুটে চেয়েছিল। দিতে হবে কোনো মতে পরে, বুখারটা কমুক।

কিন্তু চার পাঁচদিন পরেও তা কমল না। সকালের দিকে জ্বর কম থাকে, আশা হয় যে একেবারেই ছেড়ে যাবে, কিন্তু যেই বেলা বাড়তে থাকে জ্বরও তেমনি ওপরে চড়তে থাকে।

হায়রাণ হয়ে পড়েছে আজিজ। মেয়ের এমন অসুখ কিন্তু পয়সা পায় কৈ? বাড়ীতে জোহরা একা ঘাবড়ে যায় কিন্তু থাকবার উপায় কৈ? পোঁটলা নিয়ে আর ঝুড়ি নিয়ে তাকে শেয়ালদার মোড়ে গিয়ে বসতে হল। মনিহারী জিনিষ আর কমলানেবু। এই বিক্রি করে তাকে সংসার চালাতে হবে, রাবেয়াকে সুস্থ করতে হবে, নিজেদের ধর্ম্মঘটকে চালু রাখতে হবে জিৎ না হওয়া পর্য্যন্ত।

সেই কমলানেবুওয়ালার মতই অভ্যস্তকণ্ঠে সেও হাঁকে—'দো দো আনা লে যানা—মিঠা কেঁওলা লে যা যানা—"

সেই লোকটা হাসে, বলে, "এ ইয়ার টেরাম কোম্পানী—"

ডান ফুটপাথে হিন্দুস্থান, বাঁ ফুটপাতে পাকিস্থান। খাঁ খাঁ করছে রাস্তাঘাট, থম্‌থম্‌ করছে সব। খর রৌদ্রতাপে আকাশ মরুভূমির মত, রাস্তা গরম তাওয়ার মত, বাতাস লু'এর মত। সেই বাতাসে টের পাওয়া যায় মানুষের বন্য হিংস্রতাকে, রক্তমাখা ছোরাকে দেখা যায় শূন্যতার দর্পণে। আর অদৃশ্য তুষার-স্রোতের মত নিরন্তর ভেসে আসছে কুৎসিত ভয়ের স্রোত, তার স্পর্শে চেতনায় সাইরেণের মত আর্ত্তনাদ উঠেছে, পা অসাড় হয়ে পড়েছে।

জোর করে তবু এগোল সে শিয়ালদার মোড়ে, বাঁদিক ঘেঁষে সে বসল। উত্তেজিত কোলাহল ভেসে এল রাজা-বাজার আর মাণিকতলার দিক থেকে। সশস্ত্র পুলিশ-বাহী লরি চলে গেল কয়েকটা। ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে তীরের মত একটা ফায়ার ব্রিগেড ডান দিকে চলে গেল। ডানদিকের একটা গলিতে তিনচারটে ছেলেমেয়ে তখনো খেলা করছে। আজকালকার ছেলেমেয়েগুলোর কোনো ভয়ডর নেই। রাবেয়ার অসুখ। একটা নতুন পুতুল চেয়েছিল মেয়েটা। কিন্তু কোত্থেকে দেবে সে? কোত্থেকে?

নাঃ, রাস্তা ক্রমশঃ আরো জনহীন হয়ে পড়ছে। কোলাহল। একটা মোটর ভ্যানে ঘোষণা করে গেল যে সন্ধ্যা ছ'টা থেকে সকাল আটটা পর্য্যন্ত কারফিউ জারী হোলো।

উঠল আজিজ। বাড়ী না ফিরে আর উপায় নেই। মোট বিক্রি হয়েছে দু'টাকা। লাভ আনা ছ'য়েক। মাথা ঘুরে যায় তার। যদি দাঙ্গা এমনি ভাবেই চলে তাহলেই হয়েছে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়। স্বার্থপর অন্ধদের কল্পনা। সাম্য-বিরোধী ধর্ম্মান্ধদের লড়াই। নিরীহের প্রাণহরণ করে তাদের সিংহাসনের বনিয়াদ তৈরী করছে। কিন্তু কতকাল? কতকাল?

বাড়ীর দিকে ফেরে আজিজ। চলতে চলতে এদিক ওদিক, সামনে পেছনে তাকায়। সন্দেহজনক কেউ নেই তো! চলতে চলতে বুকের ওপরকার সেইখানে হাত রাখে যথানে সেপটিপিন দিয়ে আঁটা লাল কাগজের ওপরে লেখা আছে, 'ধর্ম্মঘটী ট্রাম শ্রমিক'। যেন একটা অক্ষয়-কবচ ওটা, যেন ভূত প্রেত দৈত্য দানা আর তাদের মত অস্বাভাবিক মানুষেরা ওটাকে দেখেই পালিয়ে যাবে।

দু'দিন কাটল, জ্বর কমেনি রাবেয়ার। দু'দিন কেটেছে অথচ দাঙ্গা থামেনি। মনে হচ্ছে আরো বাড়বে, বাড়তে বাড়তে ষোলোই আগষ্টের পর্য্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে। দু'দিন কেটেছে আর এই দু'দিন আজিজ কিছুই উপার্জন করতে পারেনি। কেবল ঘরের মধ্যে নিষ্ফল হতাশায় পায়চারী করেছে, মেয়ের পাশে গিয়ে বসেছে, বস্তীর লোকদের উত্তেজিত ভাষায় গালিগালাজ দিয়ে সতর্ক করেছে যেন তারা ভুল না করে, জ্ঞান না হারায়। এই বস্তীর লোকেরা অপেক্ষাকৃত শান্ত। তার কথায়, আহ্‌সান আলির সদুপদেশে ফল ফলেছে, তারা কোনো গোলমালে যোগ দেয়নি।

কিন্তু মেয়েকে নিয়ে কি করবে আজিজ? ডাক্তার? ডাক্তারের কাছে যাবে কি করে?

বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে ভাবল আজিজ। রোগশয্যায় মিশিয়ে আছে রাবেয়া, তার পাঁচ বছরের চিরাগ, তার বেদনাকণ্টকিত জীবনের রক্ত-গোলাপ। পুতুল—একটা নতুন পুতুল চেয়েছিল মেয়েটা অথচ—না, ডাক্তারের কাছে যেতেই হবে কোনমতে।

একটা ধুতি পরে সে বেরিয়ে পড়ল।

দশ মিনিট বাদে, অতি সন্তর্পণে সে ডাঃ রায়ের বাইরের ঘরে ঢুকল।

ডাক্তার রায় চমকে উঠল, বলল, "তুমি!"

"জী—"

"কি চাই?"

"বেটীর অসুখ আরো বেড়েছে ডাক্তারবাবু—"

"বেড়েছে?"

"জী—ওকে বাঁচিয়ে তুলুন ডাগ্‌দারবাবু—দোহাই তো! চলতে চলতে বুকের ওপরকার সেইখানে হাত আপনার—"

"ছুঁ—দাঁড়াও—"

সব শুনে প্রেসক্রিপশন লিখল ডাক্তার রায়, তারপরে আজিজের দিকে তাকিয়ে বলল, "এবার তাড়াতাড়ি চলে যাও—এ পাড়ায় আসতে তোমার ভয় হোল না?"

"লেড়কির জন্য—ইয়ে—তাছাড়া আমি তো মজদুর ডাগদারবাবু"—ম্লানভাবে হেসে সে নিজের বুকের ওপর হাত রাখল।

ডাক্তার রায় হাসল, "ওসব কথা ভুলে যাও, এখন লোকেরা ওসব বাছবিচার করে না—"

ম্লানভাবে হাসল আজিজ, তারপরে এদিক ওদিক তাকিয়ে ডাক্তার রায়কে সেলাম জানিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘরের ভেতর থেকেই আজিজ শুনতে পাচ্ছিল ওদের আলোচনা। রাস্তায় ওরা জটলা পাকাচ্ছিল।

জোহরা বিবর্ণমুখে বলল, "এত লোক খুন জখম করেছে! এ্যাঁ! বস্তীতে আগুন ধরানো হচ্ছে?"

আজিজ শুষ্কস্বরে বলল, কুত্তাশালারা এইসব করছে—খুনের নেশা। সরাবের নেশার মত, নেশা না কাটলে কেউ বুঝতে পারবে না যে কি করছে ওরা। কিন্তু ওকথা থাক বিবি, এখন মেয়ের দিকে তাকাও—"

জোহরা নির্বাক হয়ে গেল, স্বামীর বেদনার্ত মুখের দিকে একবার তাকিয়ে সে মেয়ের দিকে দৃষ্টি ফেরাল। সত্যি, বড় রোগা হয়ে গেছে মেয়েটা।

মেয়ের রুক্ষ চুলগুলোর ওপর হাত বুলোতে বুলোতে আজিজের দু'চোখে জল এল। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে রাবেয়ার ছোট্ট দেহ, চোখ বুজে ক্লান্ত ভঙ্গীতে পড়ে আছে সে, একটা আহত পাখীর ছানা। তার দুচোখের কোলে কালো ছায়া, গলাটা একটু ভেঙ্গে গেছে, হাতপা-গুলো শীর্ণ। তার রুক্ষ চুলগুলোর ওপর হাত বুলোতে বুলোতে আজিজ কেঁদে ফেলল।

মেয়ের কাণের সামনে মুখটাকে নিয়ে সে ডাকল—"বেটি রাবেয়া—মেরা মাহ্—"

রাবেয়া চোখ মেলল, বাপকে দেখে শীর্ণ হাসি হাসল, বাপের চোখের জল দেখে অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, "রোতে কিউ আব্বাজান?"

জোহরা মুখ ঘুরিয়ে নিল, সে আর এদৃশ্য সহ্য করতে পারছে না, তারো বুক ঠেলে কান্না আসছে।

আজিজ মাথা নেড়ে জবাব দিল, "আঁখমে কুছ গিরা হোগা—আচ্ছা বেটা, ক্যায়সি হো আভি?"

মাথাটা বাঁ দিকে কাৎ করে ললাটের ওপর একবার হাত বুলিয়ে রাবেয়া বলল, "আচ্ছি হুঁ—"

তারপরে হঠাৎ কি মনে পড়ায় আবার হেসে বলল, "আব্বাজান—"

"হাঁ বেটি?"

"মেরা নয়া পুৎলা?"

লজ্জায় ফ্যাঁকাশে হয়ে সবেগে মাথা নাড়ল, "নাউঙ্গা—তুম্হারা নয়া পুৎলা আযাযগা বিটিয়া—"

'আচ্ছা"—আশ্বস্তা হয়ে রাবেয়া চোখ বুজল।

মেয়ের দিকে তাকাল আজিজ। একটা পুতুলের দাবীকে সে মেটাতে পারছে না। তার রাবেয়া, তার চিরাগ, তার দুঃখদীর্ণ জীবন-বৃক্ষের একটি মাত্র ফুল। যদি হঠাৎ রাবেয়া মরে যায়। ছিঃ—একি ভাবছে সে! কিন্তু সত্যি, যদি রাবেয়া তাকে ফাঁকি দিয়ে চলে যায় তাহলে তো তার এই নতুন পুতুলের সাধটা অপূর্ণই থেকে যাবে। তাই কি হবে, তাই কি হতে পারে কখনো?

সে উঠে দাঁড়াল।

"কোথায় যাচ্ছ?" জোহরা প্রশ্ন করল।

"আসছি।"

গেল সে আহ্সান আলির কাছে। কয়েকটা টাকা ধার করবার জন্য।

শিয়ালদয়ের মোড়ে কতকগুলি দোকানে দরজাগুলোকে একটু ফাঁক করে রেখেছিল। দু'একজন নিতান্ত অভাবে পড়ে জিনিষ পত্র কিনে নিয়ে যাচ্ছিল। তার মধ্যে একটা দোকানে গিয়ে সে একটা পুতুল চাইল। দোকানী তাকে দেখে সন্দেহের চোখে আড়নয়নে তাকাতে লাগল

পুতুল বের করতে করতে। নানা রকমের পুতুল। নানা দামের—তারি মধ্যে একটা মেয়ে-পুতুল সে দেড় টাকা দিয়ে কিনল, বেশ পছন্দ হল তার পুতুলটা। রাবেয়াও নিশ্চয় খুশী হবে। এর আগের পুতুলটার দাম ছিল মাত্র ছ'আনা, এর দেড় টাকা। আসমান-জমিন তফাৎ। পুতুলটা পেলে রাবেয়ার রোগশীর্ণ মুখটা কেমন জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠবে তাই কল্পনা করে খুশী হয়ে উঠল আজিজের মন। না, রাবেয়া ঠিক সেরে উঠবে। খোদা, তোমার দয়ার সীমা নেই, তুমি রাবেয়াকে সুস্থ কোরে তোলো।

সাবধানেই আসছিল। হঠাৎ যেন মনে হল যে, ওপাশের ফুটপাথ থেকে কে একজন এগিয়ে আসছে তার দিকে। সবেগে। থমকে সরে দাঁড়াবার আগেই ব্যাপারটা ঘটে গেল।

মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘটে গেল তা। আকস্মিক।

একটা ছোরা আমূল বসে গেছে আজিজের পিঠে, সেই অবস্থাতেই ছোরাটাকে ছেড়ে দিয়ে আততায়ীটি আবার দৌড়ে পালিয়ে গেল।

একটা ক্ষীণ আর্ত্তনাদ করলে আজিজ। দূরে যারা দেখতে পেয়েছিল তারা হৈহৈ করে উঠল। ত্রস্ত পদক্ষেপ।

ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে তাকাল আজিজ, পিঠে আর বুকে একটা প্রচণ্ড জ্বালা। বেদনা। পিঠে হাত দিতে গিয়ে হাতের পুতুলটা ছিট্‌কে পড়ে গেল। বেদনায়, যন্ত্রণায় থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে সে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল। পড়ে গিয়ে তাকাল পুতুলটির দিকে, এগিয়ে সেটাকে তুলবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। পুতুলটি ছিট্‌কে অনেকদূরে গিয়ে পড়েছে। হতাশ, ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে সে একবার পুতুলটার দিকে তাকিয়ে নিজের বুকের দিকে তাকাল, হাত রাখল সেই জায়গাটায় যেখানে সেফটিপিনে আঁটা লাল কাগজটার ওপর লেখা আছে 'ধর্ম্মঘটী গ্রাম শ্রমিক'।

যেন সে কিছু বলতে চাইল, কিন্তু পারল না। অসহ্য যন্ত্রনায় সব কিছু একেবারে অন্ধকার হবার আগে অস্পষ্ট গোঙানীর সঙ্গে সে একটু পাশ ফিরল আর বুকের উপর কার সেই লাল কাগজটা তার নিজেরি রক্তে আরো লাল হয়ে উঠল।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাবলী আলোচিত হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হয়।

প্রতিনিধিবর্গের অনেকেই জাতীয় এবং সামাজিক বিশিষ্ট পরিচ্ছদ পরিহিত থাকায় সভামঞ্চের দৃশ্য বহু বর্ণে বিচিত্র এবং মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিল।

এই ঐতিহাসিক জনতা দেখিয়া শরীর কণ্টকিত, মন কৌতূহলান্বিত এবং আত্মা জাগ্রত ও উন্নীত হইয়া উঠে। দৃশ্যের পর দৃশ্যে মুগ্ধ-চক্ষু যেন ক্যামেরার মত আলোক-চিত্র গ্রহণ করিয়া স্মৃতির পটে অবিস্মরণীয় চিত্রাবলী চিরদিনের জন্য মুদ্রিত করিয়া রাখে।

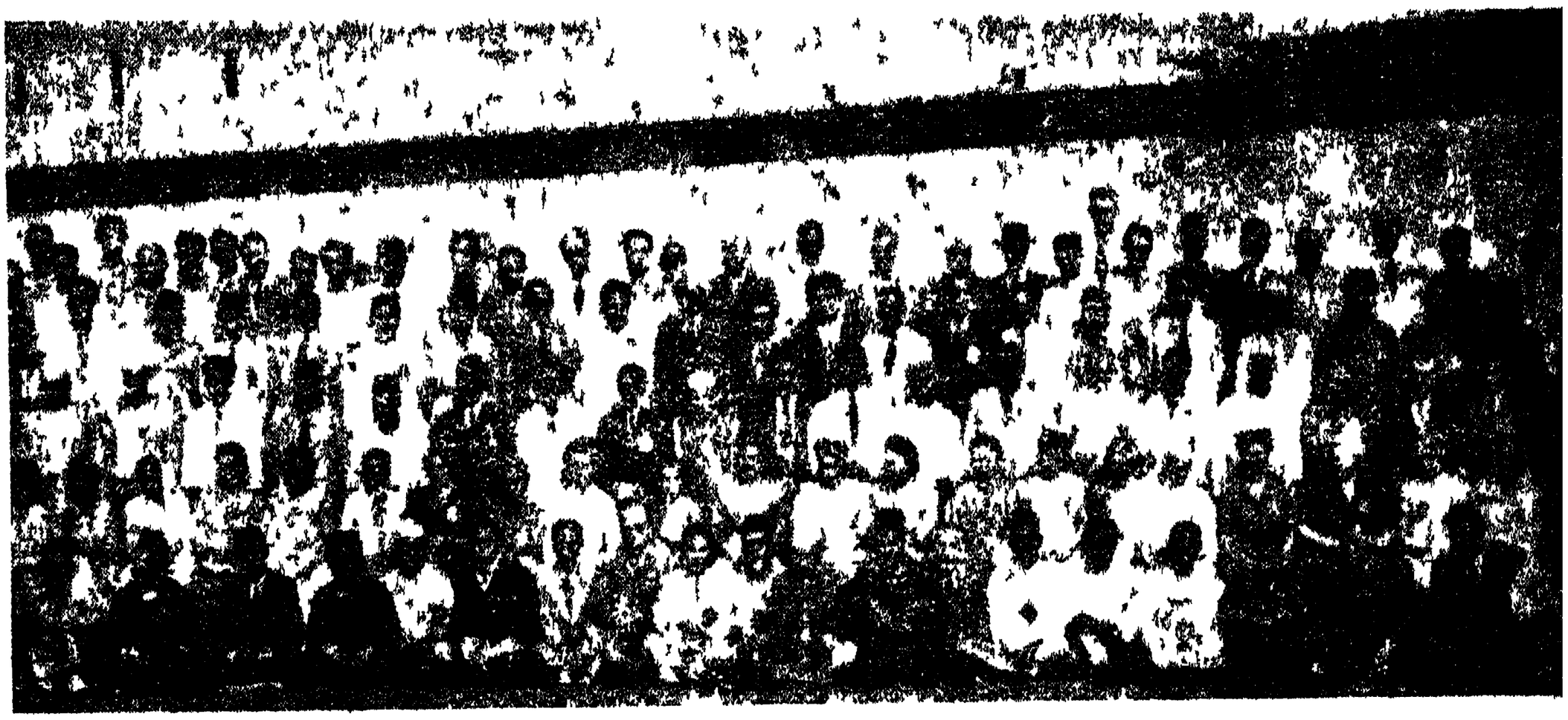

সম্মেলনে সমবেত বিভিন্ন দেশীয় প্রতিনিধিবৃন্দ।

সভা-মণ্ডপ

সভামণ্ডপের উচ্চ মঞ্চের উপর সভানেত্রীর উভয়পার্শ্বে এসিয়ার প্রধান প্রধান ১৮ টী দেশের প্রতিনিধি আসন গ্রহণ করিয়াছেন। এই ১৮ টী দেশের প্রতিনিধিবর্গের আসনের পশ্চাদ্ভাগে তত্তদ্দেশের ১৮টী বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত জাতীয়-পতাকা অলঙ্কিত থাকে। সভানেত্রীর দক্ষিণ দিকে ১। আফগানিস্থান ২। সিংহল ৩। মিশর ৪। ইরান ৫। মোঙ্গোলিয়া ৬। শ্যাম ৭। ভীটয়েনাম ৮। ইরাক ও ৯। সিরিয়া এবং তাঁহার বাম দিকে : ১। ব্রহ্ম ২। চীন ৩। ইন্দোনেসিয়া ৪। লেবানন্ ৫। ফিলিপাইন ৬। তুরস্ক ৭। সাউদি আরব ৮। ট্রান্স্-জর্ডানিয়া ও ৯। ইমেন থাকে

ইহাদের ঠিক একস্তর নিম্নে একদিকে আর্মেনিয়া, ভুটান, আজারবাইজান, তাজাকিস্থান, নেপাল এবং অপর দিকে—কোচিন-চায়না, কাজাকি-স্তান, মালয়, উজবেগিস্তান এবং তিব্বতের প্রতিনিধিবর্গের ৫ টী করিয়া ১০ টী আসন করা হয়।

মঞ্চের পটভূমির সর্ব্ব-পশ্চাতে এসিয়ার প্রকাণ্ড মানচিত্র এবং তাহার উপরে ইংরাজিতে A S I A নামটী নিও-লাইট আলোক-অক্ষরে ঝলমল করিতে থাকে

সম্মেলনের সভানেত্রী এবং প্রতিনিধিদলগুলির নেতৃবৃন্দকে লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হয় প্রথম দিন দ্বিপ্রহরেই এই সমিতির প্রথম অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে সম্মেলনের জন্যে গোলটেবিল গঠন ও বিশদরূপে কার্য্য-তালিকা নির্দ্ধারণ করা হয়।

জাতীয় আন্দোলন, লোক-বিনিময় ও জাতি-সমস্যা অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়, সাংস্কৃতিক সমস্যা এবং

অভিভূত আলোকের মূর্চ্ছাতুর ম্লান অসম্মান
দিগন্ত আছিল বাষ্পাকুল। যেন চেয়ে ভুমি পানে
অবসাদে অবনত ক্ষীণশ্বাস চির প্রাচীনতা
শুব্ধ হয়ে আছে বসে দীর্ঘকাল, ভুলে গেছে কথা
ক্লান্তি ভারে আঁখি পাতা বন্ধপ্রায়। শূন্যে হেন কালে
জয়শঙ্খ উঠিল বাজিয়া।

* * মনে ভাবি—

পুরাণোর দুর্গদ্বারে মৃত্যু যেন খুলে দিল চাবী
নূতন বাহিরি এল"।

এই প্রাচীনের জীর্ণ উত্তরীয় ত্যাগ করিয়া নূতনের বিজয়-কেতনের চীনাংশুক উড়াইয়া যে মুক্তি মন্ত্র তিনি গান করিয়াছিলেন সেদিন, তাহাতে নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে আজ **দিল্লীর পুরাণো দুর্গের দ্বারে**—এই অনাদি কালের জীবন্মৃতকে যে মুক্তিমন্ত্রে সঞ্জীবিত করা হইল তাহা প্রধানতঃ তাঁহারই তপস্যায়।

বিশ্বমানবের অন্তর জীবনকে বিচিত্রভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি করিবার সাধনায় তিনি সৃষ্টি করিলেন তাঁহার মহাকাব্য, তিনি গড়িয়া তুলিলেন তাঁহার বিশ্বভারতী (The International University) বিশ্বের সকল সংস্কৃতি একত্র করিয়া,—এবং তাঁহার সেই একত্রীকরণের স্বপ্ন সফল হইতে চলিল এতদিনে এই সাংস্কৃতিক মহা সম্মেলনে। তাঁহার বিশ্বভারতী তাঁহারই ভাষায়:—
"Represents India, where she has her wealth of mind which is for all. Visva Bharati acknowledges India's obligation to offer to others the hospitality of her best culture and India's right to accept from others their best."

দীর্ঘ নিদ্রা ও দীর্ঘসুপ্ততার জড়িমাযুক্ত এশিয়ায়—নবযুগের সূত্রপাত ও নূতন প্রাণ-স্পন্দন শুরু হইল মহাকবির তপস্যায় এবং ভারতবর্ষই এই মহা সম্মেলনের জাতিতে জাতিতে গৌরবময় কর্তব্যভার গ্রহণ করিল। যে কোন কারণেই হউক, মহাকবি সম্বন্ধে এই কথা সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ না করায়—দিল্লী সম্মেলনের এক মহান ত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রও ভিন্ন পথে ও ভিন্ন প্রণালীতে এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে এক সূত্রে বাঁধিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার অবদানও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা কর্তব্য ছিল

বর্তমান যুগে আন্তর্জাতিকতার আদর্শ হিসাবে বোধহয় রাজা রামমোহনের নাম উল্লেখ করা সর্বাগ্রেই কর্তব্য

কোরিয়ার প্রতিনিধি পণ্ডিত [illegible] দিচ্ছেন

ছিল এবং তাহার পরেই স্বামী বিবেকানন্দের ও তাঁহার পরে দেশবন্ধু ১৯২১ খৃষ্টাব্দে প্রথম Pan Asiatic Conference এর পরিকল্পনা করেন।

অন্যূন দ্বাদশ সহস্র প্রতিনিধি ও দর্শকের সম্মুখে সদ্য-নির্মিত সুন্দর ও সুসজ্জিত এক বিরাট প্যাণ্ডেলে অধিবেশনের কার্য আরম্ভ হয়।

সম্বর্দ্ধনা

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্যার শ্রীরাম সর্বপ্রথমে সকল প্রতিনিধি ও সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন ও সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন:

সমগ্র এসিয়ায় এক বিশাল কর্মক্ষেত্র রহিয়াছে। তাহার অন্তর্ভুক্ত দেশ ও জাতি সকলের অভাব অনটন, উদ্দেশ্য এবং বিধেয় অনেকটা একই রকমের সুতরাং সেই সকল জাতি ও দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ মৈত্রী স্থাপিত হইলে সকলের পক্ষেই কল্যাণকর হইবে ... এই সম্মেলন ভিন্ন ভিন্ন জাতির গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে সরকারীভাবে হইতেছে না পরন্তু এক অবিভক্ত মহাদেশের হিতৈষণায় তদ্দেশের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রজাপুঞ্জের সম্মিলিত ইচ্ছায় সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু বে-সরকারী ভাবে হইলেও এই সংঘবদ্ধ সম্মেলনের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত সকলকে সকল গভর্ণমেণ্টই সম্মান করিতে এবং সম্ভব হইলে কার্য্যে পরিণত করিতে বাধ্য হইবে।

পরিশেষে তিনি বিদেশীয় প্রতিনিধিবর্গকে সম্মেলনের কার্য্য শেষ করিয়া আরও কিছুদিন থাকিয়া এই দেশের শিল্পী, লেখক, দার্শনিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে ও দ্রষ্টব্য স্থান সকল পরিদর্শন করিতে অনুরোধ করেন।

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু

পণ্ডিত নেহেরু তাঁহার অভিভাষণ দান করিতে উঠিলে সমগ্র সভামণ্ডপের অনূ্যন দ্বাদশ সহস্র সদস্য এবং লোহিত সাগর হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত সমগ্র এশিয়ার প্রায় আড়াইশত প্রতিনিধিবৃন্দ তুমুল হর্ষধ্বনি করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থিত করেন।

তিনি তাঁহার ভাষণে বলেন :

বিজ্ঞানের এই মারাত্মক আণবিক বোমার যুগে শান্তিরক্ষার জন্য এশিয়াকে একযোগে এক সংঘবদ্ধ মৈত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্য করিতে হইবে।

পৃথিবীকে শান্তিপূর্ণ করিতে হইলে এশিয়াকে শান্তিপূর্ণ এবং ঐক্যবদ্ধ করিতে হইবে। পুরাতন সাম্রাজ্যবাদ শক্তি উঠিয়া যাইতেছে। যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহা দ্রুতবেগে ভাঙিয়া পড়িতেছে।

তিনি 'এক জগৎ' (One-World) এর আদর্শের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলেন :—

এই আদর্শকে আমাদিগকে বাস্তবে পরিণত করিয়া রূপ এবং অবয়ব দান করিতে হইবে। বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের সহিত এই আদর্শ ওতপ্রোত হইয়া আছে। তাহাকেই আমরা সমর্থন করি। আমরা সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ চাহি না। জাতীয় মুক্তি এবং স্বাধীনতা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত জাতীয়তাবাদের প্রয়োজনীয়তা প্রত্যেক দেশেরই অবশ্য স্বীকার্য্য হইলেও স্বাধীনতা লাভের পর ইহাকে আক্রমণশীল ও আন্তর্জাতিক উন্নতির পরিপন্থী হইতে দেওয়া চলিতে পারে না।

এশিয়ায় ইউরোপের প্রভুত্ব

এশিয়ার গৌরবময় ঐতিহ্যের উল্লেখ করিয়া পরে পণ্ডিত নেহেরু বলেন :

গত দুইশত বৎসরের মধ্যে এশিয়ার সর্ব্বত্র সাম্রাজ্যবাদের অভ্যুদয় হয় এবং সমগ্র এশিয়া বৈদেশিক শাসনতন্ত্রের অধীন হইয়া পড়িয়াছে। আমার মনে হয় ভারতবর্ষ এবং দক্ষিণ পূর্ব্বের দেশগুলির সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল তাহা ছিন্ন হইয়াছে এবং ভারতের সহিত এশিয়ার অন্যান্য দেশের সহিত তাহার আদান প্রদান বন্ধ হইয়াছে।

বর্ত্তমানে পুনরায় আমরা পূর্ব্বপার্শ্বের প্রাচীর ভাঙিয়া পড়িতেছে। আকাশপথে যাতায়াত এবং বিমান চলাচলের প্রসার হওয়ায় দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর আবার আমরা পুরাতন বন্ধুরূপে মিলিত হইবার সুযোগ পাইয়াছি। আমাদের গভীর মিলনাকাঙ্ক্ষা এই সম্মেলনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

শান্তি, অগ্রগতি ও সাংস্কৃতিক বিনিময়

সম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পণ্ডিতজি বলেন :

অন্য কোন দেশ বা মহাদেশের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রকাশ বা আক্রমণ আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কেহ কেহ সম্পূর্ণ ভুল বুঝিয়া এই সম্মেলনকে ইউরোপ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে এশিয়ার মিলিত আন্দোলন বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। কাহারও বিরুদ্ধে এরূপ কোনও দুরভিসন্ধি আমরা পোষণ করি না। আমরা চাই সমগ্র জগতে শান্তি ও প্রগতির পথ প্রশস্ত করিতে। ইহাই আমাদের আশা এবং আকাঙ্ক্ষা। আমরা চাই আত্মনির্ভরশীল হইতে। পাশ্চাত্য দেশের দরবারে আমরা বহুদিন ধরিয়া আবেদন নিবেদন করিয়া অরণ্যে রোদন করিয়া আসিয়াছি। আমরা চাই যে এখন হইতে ইহার অবসান হউক। আমাদের সহিত যাহারা সহযোগিতা করিতে ইচ্ছুক তাহাদের সহিত আমরা সহযোগিতা করিব—কিন্তু অন্যের ক্রীড়নক হইয়া আমরা আর থাকিব না। জগতের আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে—এশিয়া আর অন্যের কথায় উঠিতে বসিতে

চেন্ ইন্ ফান্—সিংহলের প্রতিনিধি মিঃ বন্দরনায়ক বক্তৃতা করিলে পর মিশরীয় প্রতিনিধি মিঃ মোস্তাফা মোমিন্ বলেন, এশিয়াই মানব সভ্যতার শৈশবের দোলনা স্বরূপ। তিনি ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এশিয়াকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে অনুরোধ করেন।

এই মহাসম্মেলনে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের পক্ষ হইতেও প্রেক্ষাকারী (Observer) উপস্থিত ছিলেন।

গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষ হইতে অধ্যাপক ক্যাটলিন এবং ডাঃ পি, এন্, এস্ মানসের্গ (লণ্ডনের Royal Institute of International Affairs হইতে) উপস্থিত ছিলেন। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের পক্ষে মিঃ ও মিসেস্ রিচার্ড শ্যাডলফ (Institute of Pacific Relations হইতে) উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম দিনের সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বেশভূষা, নরনারীর বিভিন্ন মুখাবয়ব, মহিলাদের বিচিত্র সাড়ী,—পশ্চাদ্ভাগে বিবিধ বর্ণালীসমন্বিত এশিয়ার সম্মিলিত দেশ সমূহের জাতীয় পতাকা,—তিব্বতের প্রবহমান পরিচ্ছদ, ব্রহ্মার শিরোপিধান প্রভৃতির সমবায়ে যে বিস্ময়কর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিলাম তাহাতে মনে হইল যে পৃথিবীর অন্য কোনও ভূভাগে এইরূপ কোনও মহতী সভা সমাহূত হইলে তাহাতে বেশভূষা, ভাষা এবং মুখাবয়বের এত বিভিন্নতার ও বৈসাদৃশ্যের মধ্যে—এত গভীর আন্তরিকতা, হৃদ্যতা ও চিন্তাধারার সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হওয়া বোধ হয় কোনমতেই সম্ভব হইত না। কারণ ইউরোপীয় সভ্যতা সকলকে একছাঁচে ঢালিয়া এক করিতে চায়। এসিয়ার সভ্যতা সর্ব্বপ্রকার আপাত বৈষম্য ও বিভিন্নতাকে মানিয়া লইয়া এক বিরাট কন্সার্ট পার্টির মত ঐকতান বাদন করে, যাহাতে প্রত্যেকের আপন আপন বৈশিষ্ট্য অটুট এবং অক্ষুণ্ণ থাকিলেও মানব-সভ্যতার মৈত্রীর মূল সুরটীর ছন্দ ও শ্রুতি-মাধুর্য্যের কোনও ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটে না।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন

মহা-সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে প্রথমে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু সভানেত্রীত্ব করেন। শরীর অসুস্থ বোধ করায় সভা শেষ হইবার প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণকে সভাপতির পদে বসাইয়া শ্রীযুক্তা নাইডু চলিয়া যান। পরে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু আসিলে স্যার রাধাকৃষ্ণণের অনুরোধে তিনি সভার কার্য্য পরিচালনা করেন।

উজবেগিস্তানের প্রতিনিধি, তাঁহাদের জাতীয় প্রথা অনুযায়ী, সভাপতি পণ্ডিত নেহরুকে একটী জমকালো লাল-সোনালি সিল্কের গাউন, একটী নীল সিল্কের উত্তরীয় ও একটী লাল সিল্কের টুপি (ইহাই উজবেগি জাতীয় পরিচ্ছদ) তাঁহার অনুমতি লইয়া তাঁহাকে পরাইয়া দিলে সভায় কৌতুক ও আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যায়।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে, যখন ইহুদি ও আরব প্রতিনিধিরা স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগরের মধ্যস্থতায় তাঁহাদের সভার কলহ সভাতেই মিটাইয়া লইয়া, পরস্পরের সহিত করমর্দ্দন করেন এবং পণ্ডিত নেহরু তাঁহাদিগকে অভিনন্দন জানান, তখন সভাস্থ সকলেই সভার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তুমুল হর্ষধ্বনি করেন।

আজ প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে প্রথমে, মিশরীয় মহিলা সম্মেলনের পক্ষ হইতে মিস্ করিমা সৈয়দ বলেন:

এই সম্মেলন প্রাচ্যদেশগুলির মধ্যে সংযোগিতা গড়িয়া তুলিবে। ভারত এবং মিশর জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং তন্নিবন্ধন রাজনৈতিক উৎপীড়নে পরস্পরের সহিত মৈত্রী ও সহানুভূতির দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ। তাহারা পাশাপাশি দাঁড়াইয়া পরস্পরের স্বাধীনতা লাভের জন্য একতাবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিবে এবং পাশ্চাত্য দেশগুলির নিকট তাহাদের যোগ্য মর্য্যাদা দাবী করিবে। মিশর এবং ভারতবর্ষের সাহায্য না পাইলে গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষে গত যুদ্ধের বিজয় গৌরব লাভকরা কদাপি সম্ভব হইত না।

ডাঃ তাই চি তাও (President of the Executive Yuan of China) পণ্ডিত নেহরুর নিকট যে বাণী

প্যালেষ্টাইন ইহুদীগণের প্রতিনিধি অধ্যাপক স্যামুয়েল বার্গম্যান বলেন যে তিনি প্রাচীন ইহুদী ধর্ম্মের এবং এশিয়ার এক প্রাচীনতম ভূখণ্ডের শুভেচ্ছা লইয়া আসিয়াছেন। প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দী পূর্ব্বে তাঁহারা আপন মাতৃভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন। হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদিগকে পাঠাইয়াছেন– এই সম্মেলনের বিবিধ বিচিত্র সমস্যা ও তাহাদের সমাধানের উপায় কৌশল অবগত হইয়া তাহা তাঁহাদের নিজ দেশে লইয়া যাইবার জন্য।

ইউরোপ বিভিন্ন দেশের মধ্যে মৈত্রী ও সদিচ্ছাপূর্ণ সহযোগিতা স্থাপন করিতে অক্ষম হইয়াছে। ইহুদীগণ সংখ্যা-লঘিষ্ঠ এবং সর্ব্বত্রই নির্য্যাতিত। বিগত যুদ্ধে তাহাদের বহুলক্ষ নরনারীকে গ্যাস চেম্বার প্রভৃতি পাশবিক উপায়ে হত্যা করা হইয়াছে। ইহুদীগণ তাহাদের বৈজ্ঞানিক ও যৌথ কৃষিশিল্পের বিশেষজ্ঞগণের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করিতে ইচ্ছুক। তাহারা তাহাদের প্রাচীন হিব্রু ভাষা আধুনিক প্রযোগপদ্ধতির উপযোগী করিয়া ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার দেশের আরও অন্যান্য রাজনৈতিক প্রসঙ্গের উল্লেখ করিবার সময় সভাপতি স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ তাঁহাকে সেই সমস্ত বিতর্কমূলক প্রসঙ্গ হইতে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করেন, কারণ তাহা এই সম্মেলনের বিষয়ীভূত নহে। অতঃপর উপসংহারে অধ্যাপক বার্গম্যান সম্মেলনের সর্ব্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করিয়া ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার বক্তৃতা সমাপ্ত করেন।

এই সময়ে ম্যাদাম করিমা এল্ সইয়দ (মিশরীয় প্রতিনিধি) সভাপতির অনুমতি লইয়া ইহুদী প্রতিনিধি অধ্যাপক বার্গম্যানের বিরুদ্ধে প্যালেষ্টাইনের ঘরোয়া বিতর্কমূলক কথা সম্মেলনে উপস্থিত করার প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, প্যালেষ্টাইনের ইহুদীগণের সহিত আরব-দের কোন বিরোধ নাই। দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহারা পরস্পরের সহিত প্যালেষ্টাইনে বন্ধুভাবে বাস করিতেছেন। তাঁহারা চাহেন না যে ইউরোপীয় ইহুদীগণ বৃটিশের বাহুবলে জোর করিয়া আসিয়া প্যালেষ্টাইনে বসবাস করেন। ইহাতে অধ্যাপক বার্গম্যান তাহার প্রত্যুক্তি করিতে চাহিলে সভাপতি তাঁহাকে অনুমতি দিতে অক্ষম হইয়া দুঃখ প্রকাশ করেন যে তাহা হইলে তর্কের জটিলতা বাড়িয়া যাইবে এবং সভার মূল উদ্দেশ্যে ব্যাঘাত ঘটিবে। ইহাতে অধ্যাপক বার্গম্যান মঞ্চ হইতে অবরোহণ করিয়া সভামণ্ডপ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তাহার দুই মিনিটকাল পরেই, স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর তাঁহার অনুসরণ করিয়া ও তাঁহাকে শিষ্ট বাক্যে বুঝাইয়া সহাস্যমুখে পুনরায় সভামণ্ডপে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হন। তখন আরব এবং ইহুদী প্রতিনিধিগণ হর্ষভরে পরস্পরের পাণিপীড়ন করিলে সভার এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত তুমুল হর্ষধ্বনিতে আলোড়িত হইয়া উঠে। প্রত্যেক দ্রষ্টার মনের মধ্যে তখন এই কথাই বিশেষভাবে প্রতীত হয় যে স্যার শান্তি-স্বরূপ ভাটনগর এই অপ্রীতিকর ব্যাপারের সুমীমাংসা করিয়া যে কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন তাহা না হইলে সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইত এবং প্রথম সম্মেলনের ইতিহাসে একটা দুঃখের এবং ক্ষোভের গভীর ক্ষত থাকিয়া যাইত। এই তুমুল হর্ষধ্বনি স্যার ভাটনগরের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিল।

প্যালেষ্টাইনের ইহুদী প্রতিনিধি অধ্যাপক বার্গম্যানের প্রতি নিরপেক্ষ ব্যবহার করা হয় নাই বলিয়া তিনি মনে করায় পণ্ডিত নেহরু দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন:

এশিয়ার বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক আলোচনা এড়াইয়া চলাই আমাদের অভিপ্রেত ছিল। সকলেই জানেন যে ভারতের জনসাধারণ গত বহু বৎসর ধরিয়া ইউরোপের এবং অন্যান্য স্থানের ইহুদীদের দুঃখদুর্দ্দশায় সহানুভূতি জানাইয়া আসিয়াছে। যখনই ক্ষেত্র উপস্থিত হইয়াছে তখনই ভারতবাসীগণ তাহাদের পক্ষসমর্থন করিয়াছে এবং তাহাদের দুঃখের অবসান কামনা করিয়াছে। সেই সঙ্গে বিতর্কের মনোভাব বর্জ্জন করিয়া আমাদিগকে ইহাও বলিতে হইবে যে নানা কারণে ভারতের জনসাধারণ সর্ব্বদাই মনে করে যে প্যালেষ্টাইন মূলতঃ আরব দেশ এবং আরববাসীদের সম্মতি না লইয়া কোনও সিদ্ধান্তই

করা চলিতে পারে না। আমরা বরাবর আশা করিয়াছি এবং এখনও আশা করিতেছি যে প্যালেষ্টাইন হইতে তৃতীয় পক্ষ যদি চলিয়া যায় অথবা অপসারিত হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট দলগুলির পক্ষে নিজেদের মধ্যে সকল সমস্যার মীমাংসা করা সহজসাধ্য হইবে।

তৃতীয় অধিবেশন

সম্মেলনের উপসংহার—শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর অনুরোধে ২রা এপ্রিল আন্তঃএশিয়া সম্মেলনে গান্ধীজী বক্তৃতা দিতে উঠিলে বিংশ সহস্রাধিক দর্শক, প্রতিনিধি ও পর্য্যবেক্ষকগণ তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত করেন। তিনি বলেন :

পশ্চিমে যাইয়া খৃষ্টধর্ম্ম বিকৃত হইয়া পড়ে। প্রাচ্যের বাণী প্রেমের বাণী সত্যের বাণী। আণবিক বোমা সৃষ্টি করিয়া পশ্চিম আজ হতাশ হইয়া পড়িতেছে। উহার ফলে শুধু পশ্চিম নহে সমস্ত পৃথিবীই ধ্বংস হইতে পারে। বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইলে শীঘ্রই মহাপ্লাবন হইবে। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যেন তাহা না হয়।

বক্তৃতার সময় হর্ষধ্বনি করা তিনি সমর্থন করেন না, তাহাতে বক্তৃতায় বাধা সৃষ্টি করা হয়। অখণ্ড বিশ্ব গড়িয়া তোলার তিনি পক্ষপাতী, সত্য ও প্রেমের বাণী প্রচার করিয়া তাহা সম্ভব করিতে হইবে।

২রা এপ্রিল, প্রাতে সম্মেলনের অধিবেশনে একটি স্থায়ী আন্তঃএশিয়া প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। উহার গঠন প্রস্তাব এই যে প্রতি দেশে একটী করিয়া জাতীয় ইউনিট থাকিবে। ঐ সকল ইউনিট কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবে। এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের একটী পরিষদ থাকিবে। প্রতি সদস্য-দেশের প্রতিনিধি লইয়া এই পরিষদটী গঠিত হইবে।

আন্তঃএশিয়া সম্মেলনের আগামী অধিবেশন ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে চীন দেশে হইবে স্থির হয়।

পরিচালনা-কমিটির পক্ষ হইতে ডাঃ ওয়েন উয়ান মিং প্রস্তাবটী উত্থাপন করেন। পণ্ডিত নেহরু ও রাণী রাজ-ওয়াদী উল্লিখিত অস্থায়ী পরিষদে ভারতীয় সদস্যরূপে থাকিবেন।

অপরাহ্নে আন্তঃ এশিয়া প্রতিষ্ঠানের অস্থায়ী সাধারণ পরিষদের যে সভা হয় তাহাতে পণ্ডিত নেহেরু সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েন। সম্মেলনে যোগদানকারী ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রতিনিধিসহ মোট ৮৫জন সদস্য লইয়া এই অস্থায়ী পরিষদ গঠিত হয়।

ভারতের প্রতিনিধি মিঃ বি, শিবরাও এবং চীনদেশের প্রতিনিধি মিঃ হ্যাম লিউ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হয়েন। যে-পর্য্যন্ত না একটী নিয়ম-তন্ত্র রচিত হয় সে পর্য্যন্ত সাময়িক ভাবে পরিষদের কার্য্যালয় পরিচালনের নির্দ্দেশ-নামার খসড়া প্রস্তুতের জন্য একটী সব-কমিটি গঠিত হয়।

সভাপতি, দুইজন সম্পাদক, এইচ, ই আলি আসগার হেকমৎ (ইরাণ) মিঃ বন্দর নায়েক (সিংহল) বিচারপতি মিঃ কাইয়ো মিন্থ্ (ব্রহ্ম) এবং ডাঃ আবু হানিফা (ইন্দোনেশিয়া) কে লইয়া এই সব-কমিটি গঠিত হয়।

কোরিয়া হইতে আগত মহিলা প্রতিনিধি, কোরিয়াবাসী স্ত্রীলোক ও বালিকাদের পক্ষ হইতে উপহারস্বরূপ প্রেরিত দুইটী পুতুল পণ্ডিত নেহেরু ও শ্রীযুক্তা নাইডুর হাতে অর্পণ করিলে সমবেত জনমণ্ডলী তুমুল হর্ষধ্বনি করেন।

ভিয়েৎনাম রিপাব্লিকের সভাপতি ডাঃ হো চি মিনের বাণী তথাকার প্রতিনিধি পাঠ করেন, সম্মেলনে উপস্থিত থাকিতে না পারায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া তিনি জানাইয়াছেন,—"সম্মেলনের অধিবেশনকালে আমার মন ও চিন্তাধারা আপনাদের সহিতই যুক্ত থাকিবে। সম্মেলনের সাফল্যে আমাদেরই জয় সূচিত হইবে। কারণ উহা এসিয়া-বাসী নরনারীর জয় ঘোষণা করিবে।"

উপসংহারে পণ্ডিত নেহরু বলেন :

মানবতার নিকট এশিয়ার শাশ্বত শান্তির বাণী বহা মূল্যবান। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সকল শক্তি করায়ত্ত থাকা সত্ত্বেও এই কল্যাণপূর্ণ শান্তির অভাব রহিয়াছে। তাই উক্ত সভ্যতাই আমাদিগকে পশুর স্তরে অবনমিত করিয়াছে। এশিয়ার অন্তর্নিহিত ভাবসত্তা ও প্রজ্ঞা এই অভাব পূরণ করিতে পারে।

এখন এশিয়ার স্বাধীনতা—শৈশবের দন্তোদ্গমের বয়স প্রাপ্ত হইযাছে মাত্র—আর একটু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই এশিয়া হইতে সাম্রাজ্যবাদের চরম অবসান ঘটিবে।

এশিযায় সামাজিক আদর্শ হইবে 'Casteless and Classless'. সর্ব্বপ্রকার ভেদ ও অসাম্য দূর করিয়া সে খৃষ্ট, বুদ্ধ মহাবীর, মহম্মদ, কনফ্যুসিয়াস ও শ্রীচৈতন্যের আদর্শকে জগতে স্থাপিত করিবে এবং অহঙ্কার, আত্মম্ভরিতা দ্বেষ, হিংসা, গৃধ্নুতা, পরস্বাপহারিতাকে বিদূরিত করিযা জগতের মানব সমাজে মনুষ্য সভ্যতার চরম এবং পরম আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

এশিয়ায় এই নব জাগরণ নূতন উদ্দীপনার সৃষ্টি করিবে। উহা পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করিবে। পাশ্চাত্ত্য জগৎ আজ গৃহ কলহে নিমজ্জিত। আণবিক বোমা দ্বারা জগৎকে ধ্বংস করিতে উদ্যত। পাশ্চাত্ত্যের আজ একান্ত প্রয়োজন প্রাচ্যের অধ্যাত্মবাদের মল্য উপলব্ধি করিতে পারা। এই মৈত্রী-সম্মেলন শুধু যে বিশ্বশান্তির অনুকূল তাহা নহে পরন্তু ইহা অখণ্ড বিশ্বশান্তির ভারবাহী স্তম্ভ-স্বরূপ। বিভেদ-জর্জ্জরিত পৃথিবী যখন আজ উন্মত্তবেগে ধ্বংসের দিকে ধাবমান হইতেছে, তখন যে সম্মেলনে পথিবীর অর্দ্ধাধিক লোক একত্র হইয়া শান্তি ও কল্যাণের হিতবাদ প্রচার করিতেছে তাহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব যে অতি বিপুল তাহা প্রশ্নের অতীত। পৃথিবীব উভয় গোলার্দ্ধ ইহার প্রভাবে প্রভাবিত হইবার সম্ভাবনা রহিযাছে। এই সম্মেলন এশিয়ার জাতিসমূহের সম্মুখে এক নূতন যুগ আনিয়াছে। বিশ্বমানবেব রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের ইতিহাসে ইহার বিববণ স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে ভারতবর্ষ অদ্যাপি স্বাধীনতালাভ না করা সত্ত্বেও এশিযার স্বাধীন জাতিসমূহ ভারতের নেতৃত্ব মানিয়া লইয়া ভারতের আধ্যাত্মিক গৌববকেই শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। তাই ভারতবর্ষের শান্তির মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করি :

পৃথিবী শান্তিরন্তরীক্ষং শান্তি শান্তিদ্যৌঃ শান্তিরাপঃ
শান্তিরোষযাঃ শান্তির্বনস্পতয়ঃ শান্তিবিশ্বেদেবাঃ
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিভিঃ।

>

বিফলমনোরথ হয়ে ফিরতে হয়েছে তার দ্বারদেশ থেকে। মনাভ্যন্তরে আসন গ্রহণ ত' দূরের কথা, তার গৃহাভ্যন্তরেও কোন পুরুষ কোনদিন পদার্পণ করতে পারেনি—ঘুণাক্ষরেও পারেনি তাব মনোরঞ্জন করতে। এমনকি কয়েকটি ক্ষেত্রে সে এরূপ ভাবও দেখিয়েছে যে, সে এখুনিই তার স্বামীর কাছে অভিযোগ করে এই দুষ্প্রবৃত্তির উপযুক্ত শাস্তি দেবে। ক্রমে এই অসাধারণ তরুণীর অদ্ভুত পাতিব্রত্যের কথা আযুদ্ধোর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।

কামঙ্গপতের রাজকন্যা-লিলাষা প্রেমবিস্তারকুশলা যুবকের পরীক্ষার জন্য মহাশপ মহাপাল উক্ত নারীর হৃদ রাজ্য জয়ের দ্বারা তার পাণিগ্রহণ করাই চাও চো-র উপযুক্ত ক্ষেত্র বলে স্থির করলেন।

নারী চরিত্র দুজ্ঞেয় কিন্তু পুরুষের প্রখর প্রতিভার কাছে তা প্রকট হতে সময় লাগে অল্পই। চাও চো রাজাজ্ঞা শিরোধার্য করে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'ল এবং প্রথমেই এই নারী সম্পর্কে কতকগুলি গোপনীয় তথ্য সংগ্রহ করল। তার জীবনের খুটিনাটি বিষয়, স্বামীর জীবদ্দশা ও বৈধব্যকালের বিভিন্ন অভ্যাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল হয়ে, পরবর্তী দ্বিতীয় পর্যায়ে হাত দিল সে। একটি নারীর করোটি ও সেই সঙ্গে বিবাহিত মহিলার পরিচ্ছদ, একজোড়া পুরাতন পাদুও ও পাহম জোগাড় করল সে। তারপর মহারাজ প্রদত্ত আশিটি টিকেলের (মুদ্রা) সাহায্যে একটি সেকেলে এক-দাঁড়ের সাম্পান ও তার নিজের প্রয়োজনীয় রান্নাবান্নার সামান্য আসবাবপত্র ও তরিতরকারি সংগ্রহ করে একদিন নদীপথে সেই পতিপ্রাণা বিধবা তরুণীর গৃহাভিমুখে যাত্রা করল।

নদীর পাড়েই সুন্দর প্রাচীন ধরণের একখানি বাড়ি। বাইরের ঢাকা বারান্দাটি নদীর উপর অনেকখানি প্রসারিত; তারই তলদেশ দিয়ে বয়ে চলেছে স্রোতস্বিনী। বারান্দার উপর দাঁড়ালে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়—প্রকৃতির অপূর্ব শোভা চক্ষুকে সার্থক করে।

শান্ত এই নদীর উপর দিয়েই একাকী দাঁড় বেয়ে চলেছিল চাও চো। অনেকটা পথই সে অতিক্রম করেছিল, কিন্তু হঠাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ঝড়ের প্রবল বেগ দেখা দিল—মুষলধারে বৃষ্টি নাবল। তাড়াতাড়ি আশ্রয়-লাভের আশায় দ্রুত দাঁড় টেনে চাও চো তার সাম্পান এনে বাঁধল ঐ তীর-সংলগ্ন বাড়িটির বারান্দার গায়ে। পরণে তার জীর্ণ মলিন বসন, কেশ-বিন্যাস অবিন্যস্ত। এখন তার দিকে তাকালে যে কোন লোকেরই করুণার উদ্রেক হয়—তার মধ্যে কোন দুরভিসন্ধি থাকতে পারে বলে বিশ্বাসই হয় না।

বারান্দায় যে অংশটুকু নদীর উপর বিস্তৃত হয়েছিল, তারই একটি থামের গায়ে ডিঙিটি বাঁধার সঙ্গে সঙ্গেই, সেই মুহূর্তেই, বারান্দার উপর থেকে একটি নারীকণ্ঠ চাও চো-কে প্রশ্ন করলে, 'কে হে তুমি, কি করা হচ্ছে এখানে?'

নিচের ডিঙি থেকে কৃতাঞ্জলিপুটে ও অত্যন্ত বিনীত ভাবে চাও চো মহিলাটির কথার উত্তর দিল, 'এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াটুকুর জন্য আমাকে একটু আশ্রয় দিন—ঝড় জল থেমে গেলেই আমি আমার গন্তব্যস্থানে চলে যাব।'

চাও চো-র আকৃতি প্রকৃতির মধ্যে আভিজাত্যের কোন লক্ষণ ছিল না। সাধারণ একজন দাঁড়বাহীর এই দুরবস্থা দেখে মহিলাটির মনে দয়ার উদ্রেক হ'ল এবং প্রসন্ন মনে তিনি চাও চো-কে ঝড়বৃষ্টি থেমে না যাওয়া পর্যন্ত বারান্দা তলদেশে নৌকা বেঁধে অবস্থান করার অনুমতি দিলেন।

ক্রমশঃ সন্ধ্যা হয়ে এলো, কিন্তু ঝড়বৃষ্টি থামার চিহ্নমাত্রও দেখা গেল না। চাও চো নৌকার উপর আলো জ্বেলে, তার সান্ধ্য-আহারের আয়োজন করতে লাগল। উপরে কাঠের বারান্দা, নিচে নৌকায় চাও চো। বারান্দার উপর থেকে, কাঠের ফাঁক দিয়ে নিচের সব নজরে পড়ে—লোক চলাচলের শব্দ সহজেই বোঝা যায়। চাও চো সতর্ক হয়েই ছিল। সাধারণতঃ পুরুষের চেয়ে

বিধবা গৃহেশ্বরী তরুণীটি তার শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় খানিকটা দয়াপরবশ হয়েই তাকে অনুমতি দিতে দ্বিধাবোধ করেন না।

ভোর হয়। প্রভাতের অরুণাভা নদীবক্ষে, পথে প্রান্তরে বিস্তৃতিলাভ করে; চতুর্দ্দিক আলোকিত হয়। কিন্তু চাও চো শয্যাত্যাগ করে না। অসুস্থতার ভাণ করে শুয়ে থাকে। বেলা বাড়ে, দুপুর হয়, রাত্রি আসে। একদিন যায়, দু'দিন যায়, তিনদিন যায়; অসুস্থতার জন্য চাও চো-র আর যাওয়া হয় না। প্রত্যহই আহারের সময় কৌতূহলী তরুণী মা পিয়ান নগ্নপদে নিঃশব্দে বারান্দায় পাটাতনের ফাঁক দিয়ে একইভাবে দেখতে থাকেন—স্ত্রীর প্রতি চাও চো র অদ্ভুত অনুরাগের নিদর্শন। শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও, নিজে না খেয়েও, চাও চো তার স্ত্রীর জন্য আহার প্রস্তুত করে; করোটিকে সম্মুখে রেখে নিত্যই দেখায় তার কর্তব্যনিষ্ঠা আর জানায় তার ভালোবাসার অপূর্ব্ব পরাকাষ্ঠা।

কয়েকদিন এইভাবে কাটবার পর, একদিন নিজেই মহিলাটি চাও চো-কে বারান্দার উপর থেকে জানান যে, 'যদি সে এখনও অসুস্থ বোধ করে, এবং যদি এখনও নৌকার দাঁড় টেনে তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব না হয়, তা'হলে উপরে বারান্দার গায়ের ছোট ঘরটিতে এসে সে থাকতে পারে। কারণ, নৌকায় থাকার চেয়ে এখানে অপেক্ষাকৃত আরামের মধ্যে শীঘ্রই সে সুস্থ হয়ে উঠবে।

চাও চো তার আংশিক কৃতকার্য্যতায় অপেক্ষাকৃত উৎফুল্ল হয়ে উঠলেও, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মহিলাটিকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়ে, নিজের পোঁটলা পুঁটলি সমেত সেই ঘরটিতে উঠে আসে। করোটি সম্বন্ধে কিন্তু বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করেই চলে সে এবং ব্যবহারের মাধুর্য্যে ও অসুস্থতার অভিনয়ে মা পিয়ান ঘুণাক্ষরেও তার শারীরিক অসুস্থতা যে দুরভিসন্ধির ছলনামাত্র তা বিশ্বাস করতেই পারেন না।

ক্রমশঃ দিনের পর দিন যায়, নারী-হৃদয়ের কোমল তন্ত্রীতে পত্নীপ্রাণ চাও চো বেখাপাত করে। স্ত্রীর করোটির প্রতি মিথ্যা গোপনীয়তার মধ্যে প্রণয়ের কৃত্রিম অভিনয় করে চলে। মা পিয়ান অবশ্য তার সমস্ত ছলনাকেই সত্য বলে গ্রহণ করেন এবং একদিন নিজেই তার শারীরিক অসুস্থতার কারণ অনুসন্ধান করে ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করে দেন। ক্রমে ক্রমে বাড়ির পরিচারিকাদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়, সকলেই তার কাছে আসে যায়, কথা বলে। গৃহকর্ত্রীর সম্মান ও শ্রদ্ধা যে অর্জ্জন করেছে, তার পক্ষে পরিচারিকাদের শ্রদ্ধা অর্জ্জন আর বেশি কথা কি! ক্রমান্বয়ে পতিহীনা তরুণা গৃহকর্ত্রী মা পিয়ানকেও গভীর সম্মান ও সোহার্দ্যের সুষমায় মুগ্ধ করে দেয় চাও চো। মা পিয়ানের মধ্যে মধ্যে বিহ্বল ভাবান্তর ঘটতে থাকে। তিনি চিন্তা করতে থাকেন: পৃথিবীতে একমাত্র তাঁর নিজের স্বামীরই ভালোবাসা ছিল এই দরিদ্র লোকটির অনুরূপ।—কি ভাগ্যবতী সেই স্ত্রী যার প্রাণবল্লভ মৃত্যুর পরও তা থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে, এমনি করেই তাকে হৃদয়েশ্বরী করে রেখেছে—জীবনের প্রতি পদক্ষেপে, চিন্তনে মননে মিশে রয়েছে তার সঙ্গে! কেমন একটা বিগলিত ভাব জাগে চাও চো-র প্রতি তাঁর। নিজের প্রধান পরিচারিকাকে তিনি তার কাছে পাঠিয়ে দেন পরিচর্য্যার জন্য। চাও চো-র আন্তরিক ও অমায়িক ব্যবহারে দাসীটিও তার অত্যন্ত অনুরাগী হয়ে ওঠে কয়েকদিনের মধ্যেই চাও চো-র কাছে সে প্রাণখুলে কথাবার্তা বলে—চাও চো-ও তার কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করে। এবং একদিন এই ষড়যন্ত্রের সাহায্যকারিণা হিসেবেই সেই পরিচারিকা এই মোহনীয় পুরুষের যাদুর কাছে বশ্যতা স্বীকার করে—চাও চো-র মন্ত্রগুপ্তির ফল ফলে।

সেদিন প্রত্যুষেই সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে চাও চো-র ঘুম ভাঙে। আজ তার মন অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল, পূর্ব্বের তুলনায় শরীরও সুস্থ। এ-সংবাদে গৃহকর্ত্রী অতিশয় আনন্দিত হন। এতদিন পরে তাঁর আশ্রয়ে থেকে তবু যে এই মৃতপত্নীক যুবক, সামলে উঠতে

করতে পারেন নি। হঠাৎ বাক্স থেকে দুটি করোটি তুলতে দেখেই তিনি যেন বজ্রাহত হয়ে যান। অপর করোটিটি যে তাঁরই হৃদয়বল্লভ পতি-দেবতার।

চাও চো ভাবী গলায় চোখ মুছতে মুছতে তখনও বলে চলে.—'শেষ পর্য্যন্ত তুমিই আমার আশ্রয়দাত্রী এই ভদ্র মহিলার স্বামীকে পাপাসক্ত, কুপথগামী করলে। এ যে অসহ্য। এ কি করে ক্ষমা করবে মানুষ। না, আর না, এখানেই আমাদের শেষ—এ নিয়ে আর এক তিলও এগুনো চলে না—তুমি তোমার নিজের পথ দেখ।' চাও চো-র গলা এবার ক্রমশই রুদ্ধ হতে থাকে, সে চেঁচিয়ে ওঠে—'দূর হও, দূর হও তোমার পণ্যটিকে নিয়ে যেখানে খুশি। আমার যা হবার হয়ে গেছে—তবে তোমার মত স্বৈরিণী ব্যাভিচারিণীর আর স্থান নেই এখানে....আজ থেকে তোমার সঙ্গে আর আমার স্ত্রীর পরিচয় নয়'....এই সব রূঢ় হৃদয়-বিদারক দুঃখের কথা বলতে বলতে চাও চো তার বিশ্বাস-ঘাতিনী স্ত্রী ও তার প্রেমিকের দুটি করোটি সামনে রেখে, ভগবানের কাছে শপথ করে যে, এর পর যদিও কোন স্ত্রীলোককেই জীবনে তার বিশ্বাস করা আর সম্ভব নয়, কিন্তু তবুও, যদি এমন সতীলক্ষ্মী কেউ থাকে, (যা সত্যিই পৃথিবীতে বিরল) যে সারা জীবন তার বিশ্বাসের, একমুখী প্রেমের মর্য্যাদা রক্ষা করবে, তা'হলে তারই পাণিগ্রহণ করবে সে—এ অবস্থায় তার আর গত্যন্তর নেই।' বলেই সে তার রন্ধনপাত্রের ভেতর থেকে একটি অস্ত্র বার করে, দুটি করোটিকেই চূর্ণবিচূর্ণ করে নদীর জলে ফেলে দেয়।

তরুণী মা পিয়ান এতক্ষণ তাঁর হৃদয়ের তলদেশে একটা নিদারুণ দাহ অনুভব করছিলেন। এ দাহ, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতার দাহ। বুকের ভেতরটা তাঁর জ্বলে যাচ্ছিল স্বামীর এই কল্পনাতীত ব্যবহারে। তবু একবার নিঃশব্দে তিনি নিজের ঘরে গিয়ে স্বামীর করোটির আধারটি দেখে নিলেন; তারপর রাগে দুঃখে অধীর হয়ে দূর করে সেটিকে ফেলে দিলেন নদীর জলে। শুধু সেটিকে নয়, জামা কাপড়, শয্যাদ্রব্য, চিত্রলিপি প্রভৃতি যা কিছু তাঁর স্বামীর স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে এতদিন তিনি পূত পবিত্র মনে করে আসছিলেন, সে সমস্তই। এতদিন যাকে তিনি তাঁর সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবেসে এসেছেন, যার জন্য এক মুহূর্ত্তও কোন পুরুষের দিকে তাকানো তিনি অপরাধ মনে করে এসেছেন, সেই কিনা এই কয়েকদিনের মধ্যেই একজন সামান্য অতিথির স্ত্রীর পতি আকৃষ্ট হ'ল। এর জন্য এই মতলবী লোকটিরই বা হ'ল কি শোচনীয় অবস্থা। এতো আর স্ত্রীলোকের দোষ নয়—এ দোষ সম্পূর্ণ তার স্বামীরই। পুরুষরাই ত' এ সব ব্যাপারে সর্ব্বত্র অগ্রণী। তার স্বামীই এই শ্রবণাপন্নের সর্ব্বনাশ করলে।

মনে মনে এই সব ভাবতে ভাবতে কোণে তাঁর চোখও অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। সমস্ত অন্তর দিয়েই তিনি সমর্থন করলেন চাও চো-র এই ব্যবস্থাকে—যাক তারা চুলোয় যাক—নিজে জন্মাক স্বামী-স্ত্রী হয়ে—আমি নিষ্কৃতি পেয়েছি। যে আর কোনদিনই আমার কাছে ধরা পড়ত না, চাও চো সেই মিথ্যার মুখোসটাকে খুলে দিয়েছে আমার কাছে। আমি এখন মুক্ত স্বাধীন—ইচ্ছে করলে এখন আমি আবার মনের মত লোকের সঙ্গে নতুন করে জীবনের সম্বন্ধ পাততে পারব—এই পাপাচারী পুরুষের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে বেঁচেই গেছি আমি।—কিন্তু কোথায় সেই সত্যিকার মনের মত পুরুষ। কোথায় পাবে সে তার উপযুক্ত সহধর্ম্মী, সম মনোভাবের একনিষ্ঠ মানুষ।

নিজের সম্বন্ধে এমনি সব বহু কথার আবর্ত্তের মধ্যে তার লম্পট, ব্যাভিচারী স্বামী ও পাশের ঘরের নিষ্কলুষ সচ্চরিত্র দরিদ্র যুবকটির তুলনা জাগতে থাকে মা পিয়ার মনে। মনে হতে থাকে অবস্থাপন্ন লোকেদের কথা। সাধারণত অবস্থাপন্ন লোকেদের স্বভাবেই এই দোষ দেখা যায় না কি? অবস্থার স্বাচ্ছল্যই তাদের এই পথে টেনে নিয়ে যায়—মনকে ক'রে তোলে বহু পত্নীমুখী—এক থাকতেও বহুর দিকে তারা আকৃষ্ট হয়, এবং সেই কারণেই পৃথিবীতে তারা অসুখী। অনেকে মনে করে শারীরিক

ও মানসিক স্বাধীনতাতেই সত্যিকার সুখ; আবার অনেকের ধারণা অর্থই সকল সুখের কারণ। কিন্তু তারও তো ধনৈশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য কম ছিল না, কিন্তু তবুও ত' সে সুখী নয়,—পারল না সুখী হতে। সত্যিকার ঐশ্বর্য্য ত' সে কোনোদিন চায়নি—সে চেয়েছিল, হৃদয়ের বিনিময়ে হৃদয়, আত্মসমর্পণের বিনিময়ে বিশ্বাস আর এমনি মানুষ যার প্রেমে সংশয়ের অবকাশ থাকবে না। ধনী লোকের মধ্যে সত্যিই এ ধরণের প্রেমিক পাওয়া শক্ত।

সারারাত্রির দুঃসহ চিন্তাধারার বিবর্তি ঘটল প্রত্যূষে। শেষ রাত্রেই সঙ্কল্প স্থির করে ফেলেছে মা পিয়ান। এই দরিদ্র পাশের ঘরের যুবকই তার পতিত্বের যোগ্য ব্যক্তি। সব দিক থেকে এর চেয়ে অনুকূল আবহাওয়া আর সে পাবে কোথায়—এখন শুধু একটি নৌকা নিয়ে স্রোতের মুখে ভেসে পড়া।

চাও চো প্রস্তুত হয়েই ছিল। কুটচক্রের জালে এই নারী-হৃদয়কে যে সে কি ভাবে আবিষ্ট করেছে, তার মনে যে কী দুর্দ্দমনীয় আবেগ জাগিয়ে তুলেছে, সে সম্বন্ধে তার সচেতনতা কম ছিল না। এতদিন ভদ্রতা ও বন্ধুত্বের মধ্যে যে ব্যবধান ও দূরত্ব বজায় ছিল, কয়েক দিনেই তা ঘুচে গিয়ে উভয়ের মধ্যে হৃদয়-বিনিময়ের গভীরতা সূচিত হ'ল—চুম্বকের প্রতি ইস্পাতের আকর্ষণের মত পরস্পরের প্রতি পরস্পরে তারা আকৃষ্ট হ'ল। তারপর একদিন শুভক্ষণে, পূর্ণিমা-নিশীথে নদীবক্ষে নৌকার উপরে উপযুক্ত অবসরে চাও তার সকাম বাসনা নিবেদন করল মা পিয়ানকে এবং মা পিয়ানও সমস্ত দ্বিধা সংকোচ দূর করে চাও চো-কে তার মর্য্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হ'ল না। পতি-পত্নীর অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হ'ল তারা উভয়ে।

মহাভূপ মহীপালের আদেশে চাও চো পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হয়ে তার লক্ষ্যে পৌঁছল বটে, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে তাদের দাম্পত্যজীবন সুখের হয়েছিল কিনা তা আর জানা যায়নি এবং সেটা এই গল্পের বিষয়বস্তুও নয়।*

* পায়ে মাসুত বাহন এর সংগৃহীত শ্যাম দেশীয় গল্প হইতে অনূদিত।

ভারতের পল্লী-পরিকল্পনা

তৃপ্তি চৌধুরী

মানুষের আদিম বসতি হল গ্রামে। কয়েকঘর চাষী কিংবা কয়েকঘর জেলে, ক্ষেতের ধারে বা নদীর পাড়ে বাঁধল তাদের বাসা। আঁকা বাঁকা আলের উপর দিয়ে সরু পায়ে-চলার পথে তাদের আনাগোনা। অতি সামান্য তাদের প্রয়োজনের দাবী, অতি সহজ সরল তাদের জীবনযাপনপ্রণালী। কালের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হতে লাগল পরিবার, উদ্ভব হল নব নব বৃত্তির, পরিবর্দ্ধিত হতে লাগল গ্রামের সীমারেখা।

লোকসংখ্যার সমৃদ্ধি ও নানা বৃত্তিজীবীর সমাবেশে সহজ সরল সামাজিক গ্রাম অবস্থান ভেদে, মানুষের চেষ্টায় সহরে পরিণত হল।

পশ্চিম জগতে গ্রামের চেয়ে সহরের সংখ্যাধিক্য হলেও ভারতে এখনও গ্রামের তুলনায় সহরের সংখ্যা নগণ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। ১৯৪১ সালের হিসাব মতে ভারতে সহরের সংখ্যা ৩,২০৯ ও গ্রামের সংখ্যা ৪,৬১,৭১১। সহরে বাস করে প্রায় ৫ কোটি লোক আর গ্রামে থাকে বাকী ৩৪ কোটি।

সুতরাং ভারতের সত্যকারের পরিকল্পনায় সহরের চেয়ে গ্রামেরই প্রাধান্য দান করতে হবে; তাহ'লেই সম্ভব হবে ভারতের জনসাধারণের প্রকৃতি উন্নতি।

পল্লীগ্রাম পরিকল্পনার প্রথম সোপান হল ভারতের গ্রামগুলির প্রকৃতি ও অবস্থান নির্ণয়। নীচের তালিকা থেকে এ সম্বন্ধে খানিকটা আভাস পাওয়া যাবে:—

প্রদেশ	লোকসংখ্যা			
	পাঁচশর কম	৫০০-১০০০	১০০০-২০০০	২০০০-৫০০০
যুক্ত প্রদেশ	৬৮,৮১০	২৩,৪৪৯	৮,১০	১,১২১
বাংলা	৫১,৫০৭	১৮,০৯২	৯,৬৯৬	৪ ৫৫১
বিহার	৪৭ ৯৩৬	১২,৮৩৭	৫,৮১৪	২,০৮১
মধ্য প্রদেশ	৩০,০৯৬	৬,৪৫৩	১,৯৬৯	৪৫৮
আসাম	২৭,৯৬৭	৪,০৯৮	,৭৪	২৫৯
উড়িষ্যা	২০,৬৮৫	৩,৫৯৭	১,০৭৫	১৯১
পাঞ্জাব	১৯ ১৬১	৯,০৬৯	৫,১৬৭	১,৭৫১
মাদ্রাজ	১২,৪৬৫	৯,২২৮	৮,২০৩	৪,৯২৯
বোম্বাই	১১,৪৮১	৫,৫৬২	৩,০৯৩	১,২১৭
সিন্ধু	৫,৮৮৫	১,৪৯৩	১৩২	৭০
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত	১,৪৯৮	৬১৮	৪৪৫	২৩৩
	২,৯৮,৪৯১	৯৪,৪৯৬	৪৫,৫৩৬	১৭৮৬১

উপরের তালিকার প্রথম ও দ্বিতীয় স্তম্ভের গ্রামগুলি একেবারে আদিম স্তরের বসতি; এতে বাস করে তারা, যাদের শ্রমশক্তির উপর নির্ভর করে সারা ভারতের খাদ্যশস্যের উৎপাদন। এই সকল কৃষিজীবীর গ্রামগুলি সংখ্যায় বিপুল হলেও এদের সমস্যা খুব জটিল নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রামের উন্নতির পরিকল্পনা আমাদের বিশেষ

রাস্তা চল্লিশ ফুট চওড়া শুনে মনে হবে যে পল্লীগ্রামগুলিকে সহরের ছাঁচে গ'ড়ে তোলাই বোধ হয় আমার আদর্শ। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে একথা ঠিক নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে—যে বর্তমান যুগ দ্রুত যানবাহন চলাচলের যুগ। পথগুলির প্রশস্ততা এমন হওয়া উচিত যাতে দুটী গাড়ী পাশাপাশি আসা যাওয়া করতে পারে এবং গাড়ীর জন্য জায়গা ছেড়ে পাদচারী পথিক নির্বিঘ্নে চলা ফেরা করতে পারে। দুটী চলমান গাড়ীর জন্য প্রয়োজন বিশ ফুট—এক একদিকে বাকী দশ ফুটে পাদচারীর চলাফেরা—পয়ঃপ্রণালী ও বৃক্ষরোপণ ব্যবস্থা। বাসগৃহগুলি পথ হতে বিশ ফুট দূরে নির্ম্মিত হবে।

সংরক্ষিত পুষ্করিণী পানীয় জল সরবরাহের জন্য প্রকৃষ্ট। দেশব্যাপী বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হ'লে সংরক্ষিত পুষ্করিণী থেকে নলের সাহায্যে প্রতিগৃহে জলের ব্যবস্থা করা বিশেষ শক্ত নয়।

বৃষ্টির জল নিষ্কাশনের জন্য পয়ঃপ্রণালী বানানোর ব্যবস্থাও একান্ত প্রয়োজন। রাস্তার বাঁধের মধ্যে মধ্যে জলনিকাশের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে খিলান নালীর ব্যবস্থা থাকবে।

মোটামুটীভাবে গ্রামের ব্যবস্থার মূলসূত্রগুলি নির্ণয় করার সঙ্গে সঙ্গে আসে গ্রামের বাসীন্দাদের প্রয়োজনের কথা।

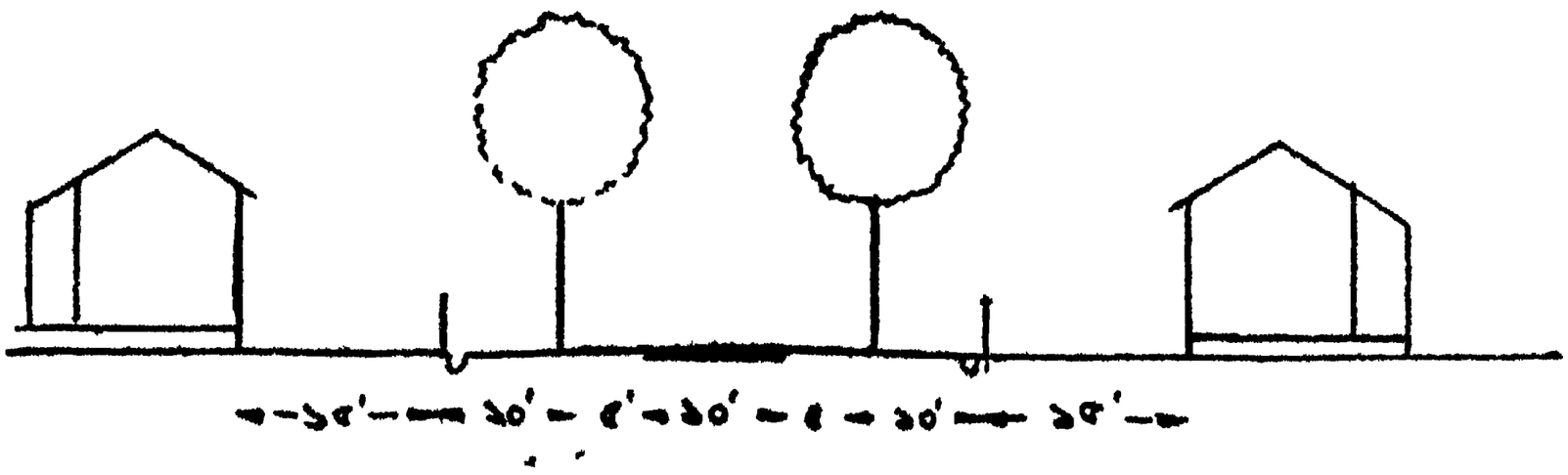

২নং—পল্লীর প্রধান পথের নমুনা। মাঝের মোটা কালো অংশ পাকা। রাস্তার দুধারে গাছ। জমির সীমানার জলের নালী। বাড়ীগুলি সীমানা থেকে পনের ফুট ভিতরে। এর ফলে রাস্তাগুলি খুব প্রশস্ত মনে হবে এবং বাড়ীগুলিতে রোদ বা হাওয়া চলাচলের কোনো বাধা থাকবে না।

আমাদের দেশের গ্রামের আর একটী বিশেষ অভাব পানীয় জলের। অনেকের ধারণা নলকূপের সাহায্যে এ সমস্যার সমাধান অতি সহজেই হতে পারে; কিন্তু এ ধারণা সর্বাংশে সত্য নয়। পানীয় জলের জন্য শুধু নলকূপের ওপর নির্ভর করা বিপজ্জনক। পাম্পের সাহায্য ছাড়া নলকূপের জল তোলা যায় না। সেই পাম্প একবার অচল হলে অল্প সময়ে তার মেরামত ব্যবস্থা নিতান্ত দুরূহ। আমার মনে হয় গভীর পাকা ইন্দারা ও

একটী গ্রামে সকলেই একশ্রেণী বা এক বৃত্তির লোক নয়। কয়েক ঘর কৃষিজীবী, কয়েকঘর ধীবর, কয়েকঘর তন্তুবায়, কয়েকঘর ব্যবসায়ী প্রভৃতির সমন্বয়ে একটী গ্রাম গঠিত। সভ্যতার আদিম অবস্থায় বসতি গড়ে উঠেছিল শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে। প্রাথমিক স্তরের পল্লীতে থাকত শুধু এক শ্রেণীর লোক। কালক্রমে উদ্ভব হল মাধ্যমিক স্তরের পল্লী যেখানে হল একাধিক জীবিকার অধিবাসীর সংমিশ্রণ এবং ব্যবসা সংক্রান্ত আদান প্রদানের ব্যবস্থা।

তারপর তৃতীয় বা যৌগিক স্তরের পল্লী—সেখানে আছে নানা বৃত্তিজীবীর সমাবেশ, ব্যবসা, শিল্পালয়, আমোদ-প্রমোদ, শিক্ষা ও শাসন পরিচালনার ব্যবস্থা, আমাদের আলোচ্য পল্লী দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের মাঝামাঝি। এদের মধ্যে কৃষিজীবীর সংখ্যাই বেশী। সুতরাং তাদের কথাই প্রথম আলোচ্য। বর্তমানে গৃহনির্ম্মানের ব্যয়বাহুল্যের ফলে এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে সাধারণ কৃষিজীবীর পক্ষে নিজ সঙ্গতিতে গৃহ নির্ম্মান করা সম্ভব নয় যদি না সরকারী ভাবে তাকে সাহায্য করা হয়। সরকারী সাহায্য বলতে আমি শুধু অর্থদানই বুঝিনা; অভিজ্ঞ স্থপতি, পূর্ত্তবিদ ও শিক্ষিত শ্রমিকের ব্যবস্থাও সরকারী সাহায্যের অন্তর্গত।

এতকাল সরকারী ব্যবস্থায় এক বিশেষ ত্রুটি লক্ষ্যীভূত

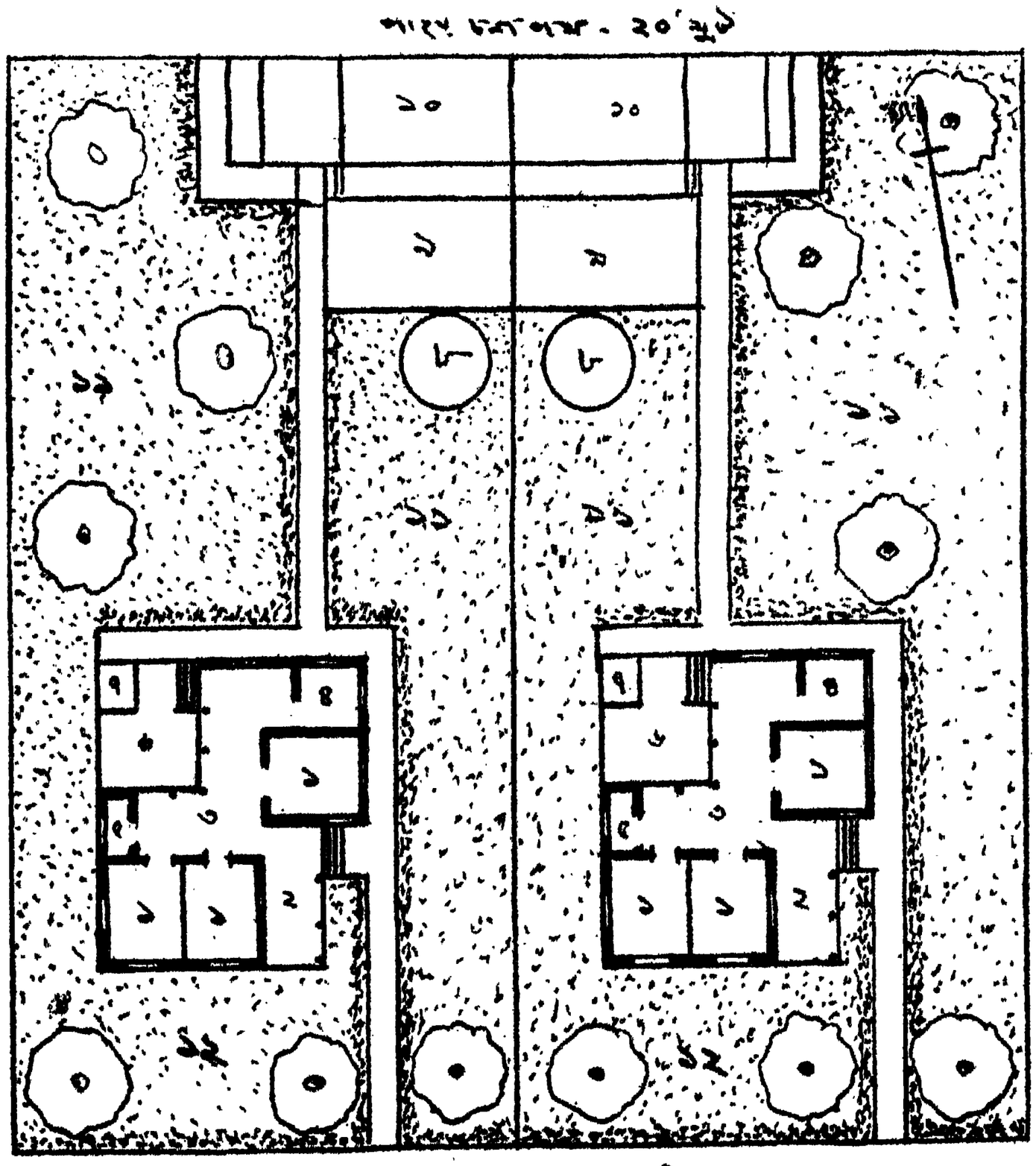

৩নং ছবি—পল্লী গৃহের নমুনা—তিনটী শোবার ঘর (১), বাইরের বারান্দা (২), খাবার ও মেয়েদের কাজ করবার জন্য ভিতরের বারান্দা (৩), রান্না ও ভাঁড়ার ঘর (৪), বাক্স ও পেঁটরা রাখবার ঘর মাদের ঘর (৫), ভিতরের উঠান (৬), পায়খানা (৭), ধানের গোলা (৮), পাকা আঙ্গিনা ধান বা চাল শুকাবার জন্য (৯), গরু, ছাগল রাখবার জন্য এবং কর্ম্মশালার জন্য চালা ঘর (১০), শাক সবজির বাগান (১১), সামনে ফুলের বাগান (১২), বাড়ীগুলির সামনে পাকা ৪০ ফুট চওড়া—পিছনে পায়ে চলা পথ ২০ ফুট চওড়া।

বেশ সঠিকভাবে সংগৃহীত হয়নি। ভারতের প্রদেশ হিসাবে এবং পরিবারের জন সংখ্যার উপর এই পরিকল্পনা নির্ভরশীল। তবে মোটামুটিভাবে বাংলাদেশের কৃষি-পরিবারের জন্য অন্ততঃ তিনটী ঘর একান্ত প্রয়োজন। এছাড়া রান্না ও ভাঁড়ারের জন্য একটী ঘর বসবার জন্য বাইরে এবং খাবার জন্য ভিতরে একটী দাওয়া বা বারান্দা একান্ত প্রয়োজন।

একটী কৃষি পরিবারের জনসংখ্যা অনেকটা এই ধরণের :—

পিতা ও মাতা	—২
প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র ও পুত্রবধূ	—২
অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র ও কন্যা	—৬
পোষ্য (একটী বা দুইটি)	—
	১০ জন

এই দশ জনের জন্য তিনটী ঘর মোটেই বেশী নয়। এখন ঘর ও বারান্দার একটা মোটামুটী বিবরণ এখানে উপস্থাপিত করা প্রয়োজন মনে করি।

প্রথম দুটী শোবার ঘর ১২০ বর্গফুট হওয়া উচিত, অর্থাৎ ১০´ ফুট লম্বা ও ১০´ ফুট চওড়া ঘর। তৃতীয় ঘরটী কিছু ছোট হলেও চলে—সেটীর মাপ ১০০ থেকে ১১০ বর্গফুট হলে চলতে পারে। রান্না ও ভাঁড়ার ঘরের মাপ হবে ৮০ বর্গফুট। বাইরের ও ভিতরের বারান্দার মাপও এর থেকে কম হলে চলবে না।

স্নান ও পায়খানার ব্যবস্থাও বর্তমান কালের উপযোগী ভাবে করতে হবে। দুটী বাড়ীর পায়খানা একত্র করে সেপটিক্ ট্যাঙ্কের প্রবর্ত্তন করাই সমীচীন। সেপ্‌টিক্ ট্যাঙ্কের নির্গত জল ক্ষেত ও সবজীর বাগানের কাজে বিশেষ উপযোগী।

গৃহের পোতা চার পাশের জমি থেকে অন্ততঃ দুই ফুট উঁচু হবে। দেয়ালের জন্য এক ইটের গাঁথুনি এখনও পর্য্যন্ত একার্য্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। প্রত্যেক ঘরে আলো ও হাওয়া চলাচলের জন্য দরজা ও জানালা মিলে অন্তত তিনটী থাকা উচিত। ছাদের আচ্ছাদন পাকা হলেই ভাল। অবস্থা বিশেষে ঢেউ খেলান এস্‌বেসটস সিমেণ্ট, দস্তার বা ভাল লোহার চাদর ব্যবহার করা চলবে। ঘরের মেঝে সিমেণ্টের হওয়া চাই। এই বিবরণ খুব উঁচু ধরণের নয়, কিন্তু এর চেয়ে নীচু মাপকাঠি কোনো ক্রমেই সন্তোষজনক বলা যায় না।

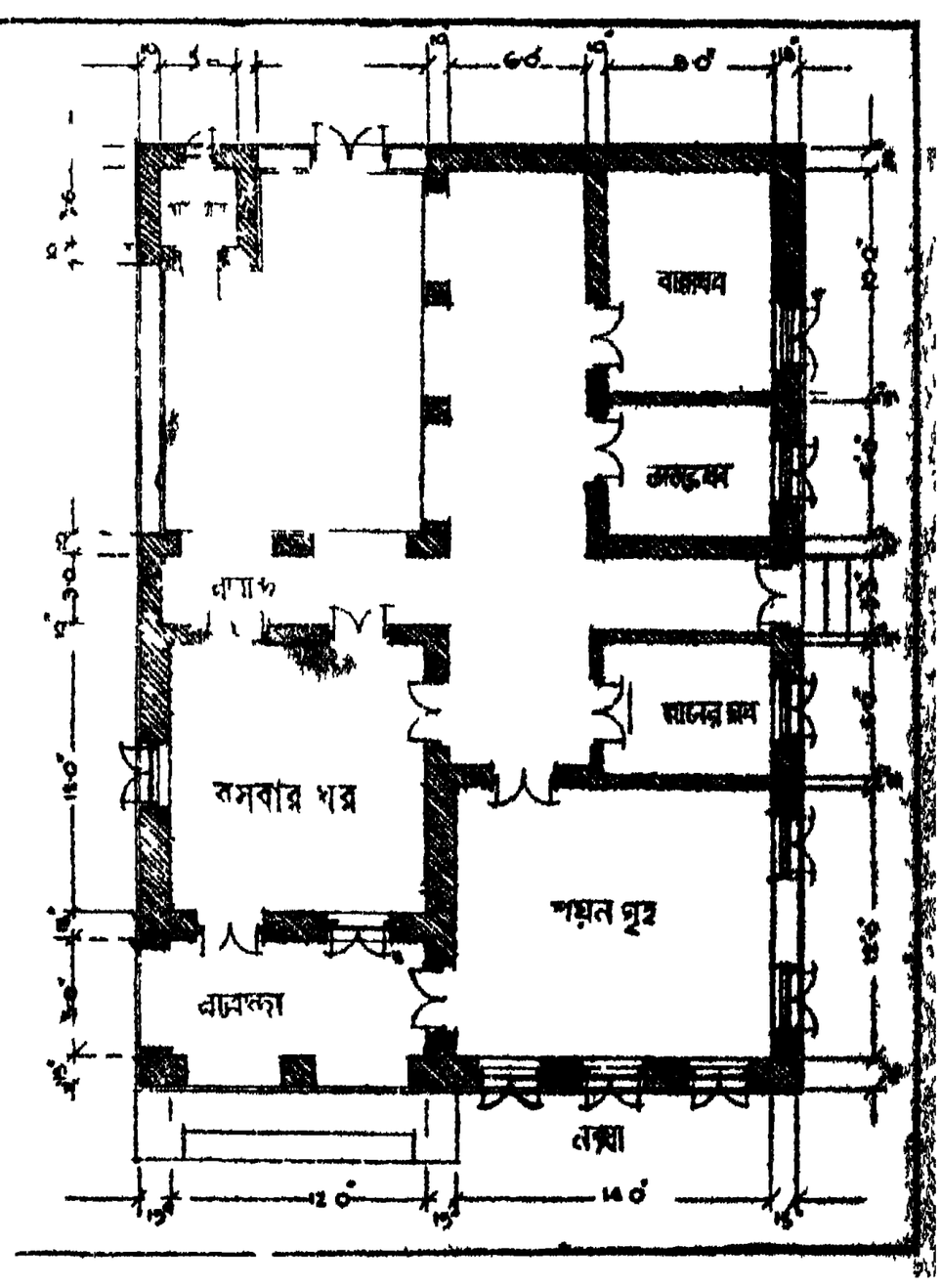

বাসগৃহের নক্সা—শ্রীযুক্ত প্রিয় গুহ অঙ্কিত

কৃষিজীবীর পরিজনের ভিতর গৃহপালিত গবাদি পশুরও একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। গরু, ছাগল, হাঁস, মুর্গী এবং চাষের যন্ত্রপাতি যথা লাঙ্গল, কোদাল, প্রভৃতি রাখবার জন্য একটা চালা ঘর বিশেষ প্রয়োজন। ধান

বাংলার মাছ

শ্রীকাশীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা দেশে মাছ খাদ্যের প্রধান অঙ্গ। মাছ বাঙালীর এত প্রিয় যে এর জন্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে তাকে কটূক্তি শুনতে হয়। যুক্তপ্রদেশ বা বিহারের দুধ, ঘি, গম, জোয়ার ও জলহাওয়ার মধ্যে যে প্রাণশক্তি সংগ্রহ করার সম্ভাবনা আছে, বাঙলার স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় মাছ খেয়ে তার কতকটা পূরণ করা যায়। কিন্তু আজ বাঙলার অন্নসমস্যার মত মাছের সমস্যাও তীব্র হ'য়ে উঠেছে।

মাছ বাংলার সম্পদ। বঙ্গোপসাগরের মাছ সংগ্রহের ক্ষেত্র পৃথিবীর মধ্যে লোভনীয় ও অর্থকরী। Barent Sea পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা মাছ উৎপাদন কেন্দ্র এবং তার পরেই স্থান পায় বঙ্গোপসাগর। তারপর নদীজলায় পূর্ণ বাঙলায় যে মাছের অফুরন্ত ভাণ্ডার রয়েছে, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু তবুও যে আজ বাঙলায় মাছের সঙ্কট দেখা দিয়েছে তার কারণ ভেবে দেখা উচিত।

যুদ্ধপূর্ব্ব সময়ে মাছের উৎপাদন বা সরবরাহের প্রতি যে নজর দেওয়া উচিত তা সরকার বা জনসাধারণ কোন পক্ষ থেকেই দেওয়া হয়নি। যেখানে বেশী মাছ পাওয়া সম্ভব সেখানে যথেষ্ট পরিমাণ মাছ ধরা হ'ত না। আবার কোন জায়গায় এত বেশী মাছ ধরা হ'ত যে ক্রমশ সেখান থেকে পরে মাছ পাওয়ার সম্ভাবনাই নষ্ট হ'য়ে যেত। কিম্বা চারা পোনা শুদ্ধ এমন ভাবে মাছ ধ'রে বাজারে ছেড়ে দেওয়া হ'ত যে মাছের উৎপাদনের যথেষ্ট ক্ষতি করা হ'ত। তারপর সরবরাহের ব্যবস্থায় এত ত্রুটি থাকৃত যে অনিচ্ছায় নিরামিষ খাওয়ার কৃচ্ছ্রতা কোন কোন অংশের লোককে বাধ্য হয়েই মেনে নিতে হ'ত। মৎস্যজীবিদের হাতেই এর সম্পূর্ণ ব্যাপক ব্যবস্থা ছেড়ে দেওয়া ছিল তাদের সংগঠনও কিছুই ছিল না, আবার সরবরাহ ব্যাপারে সর্ব্বগ্রাসী দাদন ব্যবস্থা, মহাজনী সুদ আর জলের মালিক বা জমিদারের চাপ এদের ঘাড়ে এমন জোয়াল চাপিয়ে রাখে যে, তা থেকে মুক্তি পাওয়া কোন সংগঠিত দৃঢ় সঙ্ঘশক্তির পক্ষেও খুব আশাপ্রদ মনে হয় না। অথচ মাছের বেসাতি বাঙালার চার লক্ষ জনগণের জীবিকার উপায়।

মৎস্যজীবীদের দুর্দ্দশা চরমে উঠল যুদ্ধের মধ্যে, ১৯৪২ সাল থেকে। দুর্দ্ধর্ষ জাপানের বাংলা অভিযান সফল বলে ধ'রে নিয়েই বাংলায় 'বঞ্চনা নীতির' পুরোপুরি তাণ্ডব সুরু ক'রে দেওয়া হয় পাছে নৌকাগুলি জাপানীদের কাজে লাগে তাই সেগুলি সরকারী হেফাজতে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করা হ'ল মৎস্যজীবিদের জীবিকার উপায় শেষ হ'য়ে গেল, জালের সূতো তাদের কাছে দুর্লভ হ'য়ে উঠ্‌ল আর ভূমিহীন এই সম্প্রদায়ের মাথা গুঁজে থাকার ব্যবস্থাও বানচাল হ'য়ে গেল, সরবরাহের ব্যবস্থা ত' গণ্ডগোল হ'য়েই ছিল। অসংগঠিত মৎস্যজীবীদের মেরুদণ্ডে এই আঘাতের ক্ষত আজও পূরণ হ'য়ে ওঠে নি।

অথচ এই মাছের চাষের সম্ভাবনা হিসাব ক'রে দেখলে আমরা অবাক্ হ'য়ে যাবো। সারা ভারতে প্রতিবছরে এক কোটি বাহান্ন লক্ষ সত্তর হাজার মণ মাছ ধরা হয়। সমুদ্রের অনেক মাছ শুঁটকি দেওয়া হয়, বা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরে কাজে লাগাবার জন্য তুলে রাখা হয়। বাষট্টি লক্ষ ষাট হাজার মণ মাছ বাজারে টাট্‌কা বিক্রি করা হয়। কলিকাতার বাজারে গড়ে বছরে ছয় লক্ষ পনের হাজার চারশ' পঁচিশ মণ

১৭

হবে কি না। অবশ্য এখনো অতটা নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়িনি - কেন না এখনো আশা আছে যে হিন্দু মুসলমানে - বা হয়ত একটা বোঝ পড়া হবে এবং আমরা আবার পূর্বের মত মিলে মিশে থাকতে পারবো। কিন্তু আমি দেখে'চ ইতিমধ্যেই আমাদের অনেক বন্ধু বাংলা দেশে ফিরে যাওয়ার প্রশ্নটাকে বাতিল ক'রে দিয়েচেন। বিশেষ ক'রে যাঁদের বাড়ি নোয়াখালি জেলায় এবং ঢাকা জেলায়। তাঁদেরও দোষ দিতে পারিনে। কেন না ইচ্ছে ক'রে কে আর ছেলে পুলে নিয়ে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়? বাংলা দেশের অনেক জেলার অবস্থা ঐ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের মত হ'য়ে আছে, এ কথাও অস্বীকার করা যায় না। অপর পক্ষে যেখানে আমরা বাস করি অর্থাৎ যুক্তপ্রদেশে, বিহারে, উড়িষ্যায় বা বোম্বাই প্রদেশে (এই সব প্রদেশেই বাঙালীর সংখ্যা সব চেয়ে বেশি), সেখানে কংগ্রেসের রাজত্ব। সুতরাং এ দেশে স্থায়ীভাবে বাস করার প্রলোভনও কম নয়। বিশেষ ক'রে স্বাস্থ্যকর জলহাওয়া এবং সস্তা জিনিষপত্র পাওয়ার সুবিধা ত আছেই কিন্তু তবু আমরা বাংলা দেশে ফিরে যাওয়ার প্রশ্নটাকে একেবারে মন থেকে তাড়িয়ে দিতে পারিনে। কারণ আমরা বিভূতি বাঁড়ুজ্যের 'পথের পাঁচালী' পড়েছি—বাংলা দেশের অস্বাস্থ্যকর বন জঙ্গল ঝোপ ঝাড়কেও আমরা ভালবাসি। কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের 'England, with all thy faults, I love thee still' পড়েছি। বাংলা দেশে আমরা জন্মেছি, তার অন্নজলে ঐতিহ্যে সংস্কৃতিতে আমরা পরিপুষ্ট হয়েচি—আমাদের পিতৃপুরুষের অস্থি মেদ মজ্জা ঐ বাংলা দেশের ধূলিতে মিশে আছে—তার গ্রামের পথে-ঘাটে, পাল-পার্বণে, চেনা লোকের মুখে আমাদের সহস্র স্মৃতি—তাকে কি 'যাও' বললে বুক থেকে বিদায় ক'রে দেওয়া যায়? প্রবাসে আসা আমাদের জীবিকা সমস্যা সমাধানের একটা উপায় মাত্র ছিল—তার দ্বারা আমরা বাংলার এবং বাঙালীর সংস্কৃতি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হই নি। ছুটি পেলেই বাংলা দেশে গিয়েছি এবং এই প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলা দেশের সাহিত্য এবং সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ রাখতে চেষ্টা করেচি। কিন্তু পাকিস্তানের দুঃস্বপ্ন দেখার ফলে আমাদের প্রশ্নটাকে আবার নূতন ক'রে ভেবে দেখতে হচ্চে। প্রবাসী বাঙালীর মনে বর্তমানে এই নিয়ে এক দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়েচে—এই দ্বন্দ্বের একটার background হচ্চে sentiment, আর একটার self-preservation. এই দোটানা অবস্থার মধ্যে প্রবাসী বাঙালী এখন অবস্থিত। কোন্‌টার জয় হয় দেখা যাক্। দুই দিকেই যুক্তি প্রচুর। বাংলা দেশে ফিরে যাওয়ার যুক্তিটার বনেদ হচ্চে sentiment—বাঙালী আজ বিপন্ন, বাংলার শিক্ষা, সুরুচি, সংস্কৃতি আজ বিপন্ন। এই হচ্চে এবারকার সাহিত্য সম্মেলনের বাণী। তাই এবারকার সাহিত্য সম্মেলনের সুর হ'ল রাজনৈতিক, সাহিত্যিক নয়। এই দিক দিয়েও মনে হয় যে আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ আজ বিপন্ন, তার শিক্ষা দীক্ষার উপর পাকিস্তানের খড়্গ উদ্যত—তাই ব'লে কি আমরা বিপন্ন মাকে ছেড়ে নিজেরা নিরাপদ স্থান খুঁজে নেব? সেটা কি আমাদের কৃতজ্ঞতার পরিচয় হবে? বাংলা মায়ের যদি কোন দিন সাহায্যের প্রয়োজন হ'য়ে থাকে তবে সে আজ। আজ কি তাঁর প্রবাসী ছেলেরা বিপদের সম্ভাবনা দেখে বিমুখ হ'য়ে থাকবে? মায়ের সাহায্যের জন্য ছুটে না গিয়ে নিজেদের বৃদ্ধ অকর্মণ্য হাড়পাঁজরাগুলো প্রবাসের নিরুপদ্রব ভাঙাটে বাড়িতে জিইয়ে রেখে দেবে?

অপর পক্ষে আত্ম-সংরক্ষণের (Self-preservation) নিয়মগুলোও কম কাজ করে না। বাংলা দেশের বাইরে থাকার ফলেও আমাদের অবস্থা ত্রিশঙ্কুর মত হয়েচে। বাংলাদেশে মেডিকেল কলেজে কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আমরা ছেলেপুলেদের ভর্তি করতে পারি নে- চাকরি পাওয়া ত অসম্ভব। আবার প্রবাসেও অনেক ক্ষেত্রে reservation আছে—যেমন বিহারে বিহারীদের জন্য,

যুক্তপ্রদেশে হিন্দুস্থানীদের জন্য, এই রকম। এই সব সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হবে আমাদের এই সম্মেলনকে।

সম্মেলনে এবার যে অনেকগুলি কার্য্যকরী প্রস্তাব গৃহীত হয়েচে তার মধ্যে একটি এই :

"যেহেতু মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হওয়ায় কয়েকটি প্রদেশে ইংরাজির পরিবর্তে স্থানীয় ভাষা শিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহৃত হইবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে সেইজন্য প্রবাসী বাঙালীরা দাবি করেন যে তাঁহাদিগের মাতৃভাষার সাহায্যে সমস্ত প্রদেশে তাঁহাদের সন্তানসন্ততিদের শিক্ষাদানের ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করার জন্য অচিরে ভারত ও প্রাদেশিক সরকারকে এই সম্মেলন অনুরোধ করিতেছেন।"

—আনন্দবাজার।

যদিও উপরের প্রস্তাবটি involved sentenceএর একটি উদাহরণ ব'লে গণ্য করা যেতে পারে, তবু মানেটা বোঝা যাচ্চে। সেটা হচ্চে এই যে প্রবাসী বাঙালীরা যে যে প্রদেশে বাস করেচেন সেখানে তাঁদের ছেলে পুলেদের বাংলা ভাষায় পড়ানোর এবং পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। বাংলা ভাষায় ছেলে মেয়েদের পড়ানো যে কতটা দরকারী আমি তার কিছু উদাহরণ দেব। কেন না আমি দেখেচি যে আমার অনেক বন্ধু মনে করেন যে বাড়িতে বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বললেই বাংলা ভাষার চর্চা থাকবে—আলাদা ক'রে বাংলা বই বা সাহিত্য না পড়ালেও চলে। আমি মনে করি যে আমাদের যে সন্তান সন্ততিরা তাদের বাল্যকালে এবং যৌবনে বাংলা দেশে থাকতে পায় নি তারা তাদের স্বাধিকার থেকে বঞ্চিত হ'য়ে অনেক জিনিষ হারিয়েচে—বাংলা দেশের বৈশিষ্ট্য যে শালীনতা এবং সুকুমারত্ব তা বাংলা দেশের বাইরেকার আবহাওয়ায় পুষ্ট হ'তে পারে না। তার উপর তারা যদি আবার বাংলা ভাষাটাও ভোলে তবে সেটাকে দুর্ভাগ্য ব'লেই গণ্য করতে হবে। আর শুধু বাড়িতে বাংলা কথা বল্লেই যে বাংলা ভাষা অধিগত হয় এ ধারণাও ভুল।

আমি স্বভাবতই আমার ছেলেমেয়ের বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলা সম্বন্ধে কান পেতে রাখি। কিন্তু তবু আমার কানকে অতিক্রম ক'রে কি ক'রে যে হিন্দি ভাষার ভেজাল সেখানে এসে অনধিকার প্রবেশ লাভ করে তার কারণ খুঁজে পাইনে। বোধ হয় হিন্দুস্থানী দেশের আকাশে বাতাসে তাদের ভাষা ছড়িয়ে আছে। যেমন [illegible] পেন্‌সিল দিয়ে কিছু লিখে তারা বলে, বাবা, এই[illegible] লেখাটা মিটিয়ে দিই? বলা বাহুল্য, বাংলা দেশে আ[illegible] বলতুম, পুঁছে ফেলি? আবার কাছে এসে কেউ [illegible] বলে—এই, হ'টে বোস্। অর্থাৎ কিনা স'রে বোস্। [illegible] কেউ ধাক্কা দেয় তবে কেঁদে মায়ের কাছে [illegible] নালিশ জানায়, মা, আমাকে ধেক্‌লে দিয়েছে। এগুলি যে হিন্দি শব্দেরই আক্রমণ এবং বাংলা [illegible] পরাজয়, এ কথা ব'লে বোঝানোর আশা করি প্রয়োজন নেই।

তাই আমার ধারণা বাংলা ভাষাকে এবং তার [illegible] বাংলা সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে হ'লে সক্রিয় চেষ্টা দরকার। কেবল সহানুভূতি নিয়ে ব'সে থাকলে হবে না। [illegible] সেই দিকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেচেন।

পঞ্চগ্রাম

[বাংলা দেশের প্রাণকেন্দ্র গ্রাম। নব্বই হাজার গ্রামের সঙ্গতির উপর সারা প্রদেশের সমৃদ্ধি নির্ভর করে। শতকরা নব্বই জনের উপর বাঙালীই গ্রামের অধিবাসী। অতীত ও বর্ত্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে এই গ্রামগুলির সংগঠন ও সংস্থাপন সম্বন্ধে চিন্তা করবার সময় এসেছে। গ্রামের সুখ দুঃখ এবং স্বতন্ত্র ও সমষ্টিগতভাবে তার সংস্কার ও সমাধানের প্রশ্ন নিয়ে এই স্তম্ভে সংক্ষেপে মতামত প্রকাশ করার জন্য গ্রামবাসীদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এই সম্পর্কে যে সব রচনা প্রকাশিত হবে তার মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন্। —সম্পাদক।]

মুড়াই

বীরভূম জেলার সদর সিউড়ী মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত ঐ শহরের উত্তর-সংলগ্ন মুড়াই গ্রাম পূর্ব্বে অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ছিল। কিন্তু কালের প্রভাবে মুড়াই প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। লোকের বাড়ীর অসংখ্য ভিটার চিহ্ন দেখিলে প্রাণে বেদনার সঞ্চার হয়। তবে ভগবানের কৃপায় এখন আবার গৃহস্থ লোকের বসতি হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মানবের মন হরণ করে। রাশি রাশি তাল ও খর্জ্জুর বৃক্ষ শির উত্তোলন করিয়া গ্রামের চতুর্দিকে দাঁড়াইয়া আছে। গ্রামের পূর্ব্ব এবং উত্তরেই ধানের ক্ষেত; মাত্র এক মাইল উত্তরে ময়ূরাক্ষী নদী এবং ইহার কয়েক মাইল উত্তর-পশ্চিমে দুমকার পর্ব্বতশ্রেণী অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কথিত আছে যে এই গ্রামের সদ্গোপ এবং বাগ্দী জাতি ডাকাতি করিত, লোক খুন করিত; অথচ তাহাদিগকে ধরাইয়া দিতে কেহ সাহায্য করিত না। একবার এক ব্যক্তি এই সমস্ত ডাকাতদিগকে ধরাইয়া দেয়। মনে হয় এই পাপের জন্যই গ্রামের অধিকাংশ লোক বিনষ্ট হয়।

গ্রামের একটি বহু প্রাচীন বংশের গৃহে শ্রীশ্রীদুর্গামাতার পূজা হয়। ইহাদের একটী শিব ঠাকুর ও তদীয় মন্দির আছে। শিবের নিত্য পূজা হয়। এখন ইহাদের অবস্থা নিরতিশয় হীন হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বের বিরাট বাড়ী ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হওয়ায় ইহারা নিকটস্থ মৃন্ময় কুটীরে কায়ক্লেশে দিনপাত করিতেছেন।

গ্রামের দক্ষিণে প্রবেশ-পথের বামপার্শ্বে কেবট (কেওট) দের মা মনসাদেবীর মৃন্ময় কুটীর।

ইহার সামান্য উত্তরেই রাস্তার ডান দিকে কালাচাঁদ ঠাকুরের মন্দির। এই স্থানটি অতিশয় মনোরম, ঠিক যেন একটী কুঞ্জবন। নানা-বৃক্ষ পরিশোভিত এই সুদৃশ্য স্থান সর্ব্বদা বিবিধ পক্ষীর কূজনে মুখরিত হইয়া আছে। দিনমানে শিবাগণের অবাধ গতিবিধি এবং তাহাদের উল্লাস দর্শকের মনে আনন্দ প্রদান করে। স্বর্গত রাধাবল্লভ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত বহু বৈষ্ণব পদ আছে। কালাচাঁদ বা কেলেচাঁদের সুবৃহৎ দারুমূর্ত্তি অতি সুন্দর। সিউড়ী শহরের ছয় মাইল পূর্ব্ববর্ত্তী কুন্নুড়ি গ্রামে ইনি ফাল্গুন মাসের ৯ই হইতে কার্ত্তিকের ১৫ই পর্য্যন্ত, মুড়াইএ ১৬ই কার্ত্তিক হইতে ৯ই পৌষ পর্য্যন্ত এবং বাকী সময় সিউড়ীর পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমবর্ত্তী রাউতাড়া গ্রামে থাকেন।

কুন্নুড়িতে ইহার দোল, রথ ও জন্মাষ্টমী,—মুড়াইএ নবান্ন, পঞ্চমদোল, বনভোজন ও রাজভোগ এবং রাউতাড়ায়

আজ এই হানাহানির পঙ্ককুণ্ডের মধ্যে দাঁড়িয়ে কবিগুরুকে স্মরণ করি, হে ঋষি, যে সত্য দীর্ঘজীবনের সাধনায় তুমি উপলব্ধি করেছিলে সেই সত্য তোমার দুর্গত স্বদেশবাসীর জীবনেও প্রতিভাত হোক,—তোমার আশীর্বাদে আমাদের চিত্ত নির্মল, দৃষ্টি উদার এবং মন ভয়শূন্য হোক। তোমার জীবনে জীবন লাভ করে সমস্ত দেশ জেগে উঠুক।

এই দাঙ্গা :

মাসখানেকের উর্ধ্বকাল হ'ল কলিকাতায় দাঙ্গার এই যে তৃতীয় পর্যায় আরম্ভ হয়েছে—এর শেষ কোথায় কেউ জানে না। ১৬ই আগষ্ট এর সূত্রপাত। সেই ভয়াবহ নরমেধ শেষ হয়ে গেলে অনেকেই আশা ক'রেছিলেন, এর বোধহয় আর পুনরাবৃত্তি হবে না। নরহত্যা, নারীহরণ, লুঠ, গৃহদাহ যে কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে পারে না সে শিক্ষা জাতির হয়ে গেল। এবারে শান্তভাবেই এরা বোধহয় নিজেদের মধ্যে আপোষে সত্যকার ও কল্পিত সমস্ত বিরোধ মিটিয়ে নেবে। কিন্তু সে-আশা মিথ্যা প্রমাণিত হ'ল। ম্যালেরিয়া জ্বরের মতো দাঙ্গা এখন থেকে-থেকে, কেঁপে-কেঁপে দেশের উপর জেঁকে বসলো। শুধু তাই নয়। যা আরম্ভ হয়েছিল কলিকাতা ও বোম্বাইতে, তা ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে লাগলো, কলিকাতা থেকে নোয়াখালি এবং সেখান থেকে বিহার, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, ভারতের পূর্বপ্রান্তবর্তী নোয়াখালি থেকে পশ্চিম প্রান্তবর্তী পেশোয়ার পর্যন্ত দাঙ্গার প্রক্রিয়া হুবহু একই রকমের : নরহত্যা, নারীহরণ, লুঠ, গৃহদাহ, ছোরা, বোমা, এসিড এবং বন্দুক। এর থেকে এই অনুমান করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে, একটি কেন্দ্রীয় শক্তি কোথাও থেকে গৃহযুদ্ধ (civil war) নামধেয় এই পৈশাচিক দাঙ্গা নিয়ন্ত্রিত করছে।

অনুমানের কারণ :

অনুমানের আরও একটা কারণ আছে। সিভিল ওয়ারের হুমকি আজকের নয়। পাকিস্তানের দাবীর সঙ্গে সঙ্গে এ হুমকিও অনেক দিন থেকেই দেওয়া হচ্ছিল। তখন হুমকিটাকে কেউ বড় একটা আমল দেয় নি,—রাজনৈতিক আতসবাজি ব'লেই গ্রহণ করেছিল। ইতি-মধ্যে মুসলিম লীগ ১৬ই আগষ্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' দিবস ঘোষণা করলে। কর্মপরিষদ (Council of Action) গঠিত হ'ল। ঘোষিত হ'ল, এ সংগ্রাম দেশবাসীর বিরুদ্ধে নয়, বৃটিশ শাসনশক্তির বিরুদ্ধে। বলা হ'ল, লীগ কংগ্রেসের মতো অহিংস থাকবে না, মুসলিম জনসাধারণকে এই দিন কি করতে হবে তা তারা জানে। লীগের ছোট-বড়-মাঝারি সমস্ত নেতাই এই একই সুরে হুমকি দিতে লাগলেন। অন্য জায়গার কথা জানি নে কিন্তু কলিকাতা শহরের মুসলমান পল্লীতে-পল্লীতে লীগ-বাহিনীর কুচ-কাওয়াজ এবং সংগ্রামের আয়োজন চলতে লাগলো। কিন্তু এত বড় কাণ্ডেও বৃটিশ সিংহকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হ'তে দেখা গেল না। কংগ্রেসের অহিংস আগষ্ট-প্রস্তাব গ্রহণের সঙ্গে-সঙ্গেই নেতৃবৃন্দকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু লীগের একটি চুনো-পুঁটিকেও এজন্য গ্রেপ্তার করা হ'ল না। ১৯৪২ সালে আগষ্ট-প্রস্তাব গ্রহণের আগেই বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল মন্ত্রিত্ব ত্যাগ ক'রেছিলেন। ১৯৪৬ সালে আগষ্ট-সংগ্রাম ঘোষণার আগে কোনো প্রদেশের লীগ মন্ত্রীমণ্ডলই মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করলেন না। গদীতে আসীন থেকে সংগ্রাম চালালে ফল আরও ভয়াবহ হ'তে পারে এমন অনুমান করা বৃটিশের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তথাপি তাঁরা নির্বিকারই রইলেন! বরং বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট থেকে বৃটিশ বণিক এবং বৃটিশ সংবাদপত্র পর্যন্ত ১৬ই আগষ্টের ধর্মঘটে পূর্ণ সহযোগিতা ক'রে অফিস বন্ধ রাখলেন! কার্যকালে দেখা গেল, তাঁরা ভুল করেন নি। এত বড় সংগ্রামের উন্মত্ততা বৃটিশ-সিংহের একগাছি কেশরও স্থানভ্রষ্ট করলে

তারিখেও ডেরা ইসমাইল খানে নরহত্যা, লুঠ ও অগ্নি-সংযোগের খবর পাওয়া যায়।

গান্ধীজীর মন্তব্য :

দিল্লীর প্রার্থনা-সভায় গান্ধীজি বিভিন্ন স্থানের দাঙ্গার প্রসঙ্গে গান্ধী-জিন্না আবেদনের উল্লেখ ক'রে বলেন :

'আবেদনের উদ্দেশ্য কার্যতঃ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। জিন্না সাহেব এ কথা বলতে পারেন না যে তাঁর অনুগামীগণ তাঁর আবেদনে কর্ণপাত করেন না। নিখিল ভারত মুসলিম লীগ মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরাট অংশের প্রতিনিধিত্ব দাবী করেন। জিন্নাসাহেব মুসলিম লীগের অবিসংবাদী সভাপতি। এখন তিনি যদি ও কথা বলেন তাহ'লে তাঁর দাবী আদৌ টিকতে পারে না।"

অর্থাৎ জিন্না সাহেবকে এর পরে হয় বলতে হবে, মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরাট অংশের প্রতিনিধি নয়, নয় তো স্বীকার করতে হবে তিনি অন্তরের সঙ্গে শান্তি কামনা করেন না। এর পর মহাত্মাজি প্রশ্ন তুলেছেন :

"বৃটিশ সরকার কি যুক্তি তর্কের পথ পরিত্যাগ ক'রে অস্ত্রবলের নিকট নতি স্বীকার করবেন?"

সীমান্ত মন্ত্রিসভা

গান্ধীজির এই প্রশ্নের সঙ্গতি ইতিমধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। দিল্লীতে গুজব, বড়লাট নাকি সীমান্তের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা ভেঙে দেবার সঙ্কল্প করেছেন। মুসলিম লীগ সীমান্তে নূতন নির্বাচন দাবী করেছে। সেই নির্বাচন যাতে স্বাধীনভাবে হতে পারে, সেই জন্যই কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলের অপসারণ। এই গুজব কতখানি সত্য জানি না। কিন্তু এমন কাণ্ড ইতিপূর্বে ঘটেছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের লীগ প্রীতিও সুবিদিত। সুতরাং গুজব সত্য হওয়া বিচিত্র নয়। লীগ দাবী করেছে, 'স্বাধীনভাবে' নির্বাচন পরিচালনার জন্য সীমান্ত মন্ত্রীমণ্ডলের অপসারণ। অথচ সিন্ধুপ্রদেশে ভোটের জোরে লীগ মন্ত্রীমণ্ডলের অপসারণ যখন অনিবার্য হয়ে উঠলো, তখন 'স্বাধীনভাবে' নির্বাচন পরিচালনার চিন্তামাত্র না ক'রেও সিন্ধুর গবর্ণর ওই মন্ত্রীমণ্ডলকেই 'কেয়ারটেকার' হিসাবে মন্ত্রীর গদীতে বহাল রাখলেন। সিন্ধু প্রদেশের কথা মুসলিম লীগ কি এত শীঘ্রই ভুলে গেল যে, সীমান্তে দল-গরিষ্ঠতার ন্যায়ের বলে সমাসীন কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলের অপসারণের আবদার জানাতে লজ্জাবোধ করলে না? গান্ধীজি প্রশ্ন ক'রেছেন : 'বৃটিশ সরকার কি যুক্তিতর্কের পথ পরিত্যাগ ক'রে অস্ত্রবলের নিকট নতিস্বীকার করবেন?" এ গুজব সত্য হ'লে বলব, অস্ত্রবলের নিকট নয়, লীগকে তোয়াজ করবার জন্যে লীগের আবদারের নিকট তাঁরা নতিস্বীকার করে যাচ্ছেন। অর্থাৎ লর্ড ওয়াভেল যা করেছেন, লর্ড মাউণ্টব্যাটেনও তাই করতে যাচ্ছেন।

বাদশা খানের আবেদন

দেখা যাচ্ছে, সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গফ্ফর খানও এই গুজব একেবারে উড়িয়ে দেননি। বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে তিনি নিরপেক্ষভাবে ন্যায়বিচার করবার জন্যে আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

'ভারতের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবার জন্যে বড়লাটকে পাঠানো হয়েছে। ছোটখাটো ব্যাপারের মধ্যে নামা তাঁর সঙ্গত হবে না। দলগত রাজনীতির উর্দ্ধে থাকাই তাঁর কর্ত্তব্য। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করবার জন্যে এখানকার সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের উপর রাজনৈতিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত নয়। কারণ মাত্র এক বৎসর আগে পাকিস্তানের প্রশ্নের উপর ভিত্তি করেই নির্বাচন হয়ে গেছে।'

সেই নির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেই কংগ্রেস দল মন্ত্রিসভা গঠন করেন। যতদিন না লীগদল জয়লাভ করছেন ততদিন প্রতি বৎসর একবার ক'রে নতুন নির্বাচন করতে হবে, এ আবদার ছাড়া আর কিছুই নয়। এর উত্তর দিয়েছেন সীমান্তের প্রধান মন্ত্রী ডক্টর খান সাহেব। তিনি বলেছেন :

"নির্বাচকমণ্ডলী যদি না চান তাহলে শাসনতন্ত্রবিরোধী পন্থায়

নোয়াখালি ও ত্রিপুরা

গত ১লা মে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস দলের ডেপুটি লীডার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্রসচিবের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী মিঃ কে নসরুল্লা জানান :

নোয়াখালিতে ৮৮১টি গৃহ ভস্মীভূত ও ২২৬৬টি গৃহ লুণ্ঠিত হয়; হাঙ্গামায় ১৭৮ জন এবং পুলিশ ও মিলিটারীর গুলিতে ৪২ জন নিহত হয়।

ত্রিপুরা জেলায় ১,৭১৮ টি গৃহ ও ৬৫২৬ টি কুটির ভস্মীভূত ও ২১৭০টি গৃহ লুণ্ঠিত হয়; হাঙ্গামায় ৪০ জন এবং পুলিশ ও মিলিটারীর গুলীতে ২৫ জন নিহত হয়।

বলপূর্বক কত লোককে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে তার উত্তরে মিঃ নসরুল্লা জানান ত্রিপুরায় এইরূপ ধর্মান্তরিতের সংখ্যা ৯,৮৯৫; নোয়াখালির হিসাব জানা যায় নি, তবে হাজার হাজার হবে। এই সম্পর্কে মিঃ সিম্পসন ও মিঃ আর, গুপ্ত কি রিপোর্ট দিয়েছেন বিরোধীপক্ষ তা জানতে চান। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তা জানাতে অস্বীকার করেন। মিঃ নসরুল্লা আরও জানিয়েছেন, নোয়াখালিতে এই সম্পর্কে ১,০৬১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়, তার মধ্যে ৯০৯ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে; আর ত্রিপুরায় ১,১৩৬ জনের মধ্যে ৯১২ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এদের কতক জামিনে ছাড়া পেয়েছে, কতক একেবারেই। কংগ্রেস-সদস্য হরিপদ চট্টোপাধ্যায় জানান, বেসরকারীসূত্রে পাওয়া হিসাবের সঙ্গে মিঃ নসরুল্লার হিসাব মেলে না।

হেনরী ওয়ালেস

হেনরী ওয়ালেস পদত্যাগ ক'রতে বাধ্য হয়েছেন। মার্কিনী নীতির ফলে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বেধে যেতে পারে, এই আশঙ্কা প্রকাশ করাই তাঁর অপরাধ। পদত্যাগের পূর্ব্বে তিনি আমেরিকার বাণিজ্য-সচিব ছিলেন। স্বর্গত প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের তিনি নিকটতম সহকর্মী ছিলেন। তাঁর পদত্যাগ ও আশঙ্কাপ্রকাশের গুরুত্ব আছে। আণবিক বোমা ও যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে ধনতান্ত্রিক মর্য্যাদা আমেরিকাকে মদমত্ত ক'রে তুলেছে। তাই রাশিয়ার নূতন ভাবধারার সঙ্গে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা পৃথিবীকে আবার সর্বনাশা যুদ্ধের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে পারে। শক্তির দম্ভেই রাশিয়াকে বাগ মানাবার চেষ্টা আমেরিকার নীতিতে দেখা দিয়েছে। তাই রণসম্ভার বৃদ্ধি তার পক্ষে জরুরী। এরই ফলে রাশিয়ার সঙ্গে তার বিরোধ ক্রমশ বাড়ছে। নিঃসহায় বৃটেন আমেরিকার নির্দেশ মাথায় ক'রে এই বিরোধের আগুনে ইন্ধন জোগাচ্ছে। এই নীতির বিরুদ্ধে ওয়ালেস প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বিশ্বের কল্যাণে এই দুই শক্তির মধ্যে মীমাংসা তিনি একান্ত প্রয়োজন ব'লে মনে করেন। এই মত প্রকাশের জন্য নিজের দেশে তাঁকে যথেষ্ট বাধা পেতে হয়েছে, সব দেশেই তিনি বাধা পেয়েছেন, কিন্তু দমেন নি। ইউরোপ ও আমেরিকায় তাঁর নির্ভীক ও বলিষ্ঠ প্রচারের ফলে একটি কথা স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। জবরদস্ত মার্কিনী নীতির বিরুদ্ধে বিশ্বকল্যাণমুখী জনমত আছে। এই জনমত ক্রমশ যে বলিষ্ঠ হ'য়ে উঠছে তার আভাসও পাওয়া গেছে। মীমাংসার সূত্র তিনি যা প্রস্তাব করেছেন ষ্ট্যালিনও তা সমর্থনের ইঙ্গিত দিয়েছেন এক সাংবাদিকের কাছে।

গ্রীস ও তুরস্কে মার্কিন সাহায্য

গত মার্চ্চ মাসে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ঘোষণা করেছেন, গ্রীস ও তুরস্ককে আমেরিকা সবরকমে সাহায্য ক'রবে। 'সাম্যবাদের অত্যাচার (?)' দমনের নামেই এই সাহায্যের প্রস্তাব। মার্কিন নৌবহর ভূমধ্যসাগরের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে তাই ট্রুম্যানের আবেগ ফুটে উঠেছে, 'মানুষের মনের উপর সবরকম অত্যাচারের বিরুদ্ধে চিরদিন শত্রুতা করার শপথ আমি নিয়েছি।'

দেখা যাচ্ছে, ইউরোপের হাঙ্গামা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবার মনোভাব আর আমেরিকার নেই। রণসম্ভার বৃদ্ধির জন্য তার বিরাট অর্থের প্রয়োজন। সেজন্য পৃথিবীর বাজারে তার অবাধ কর্তৃত্ব থাকা চাই। এই

পরিভ্রমণের
পরিপাটী রূপটী
ফুটিয়ে তুলবে
হিমানী

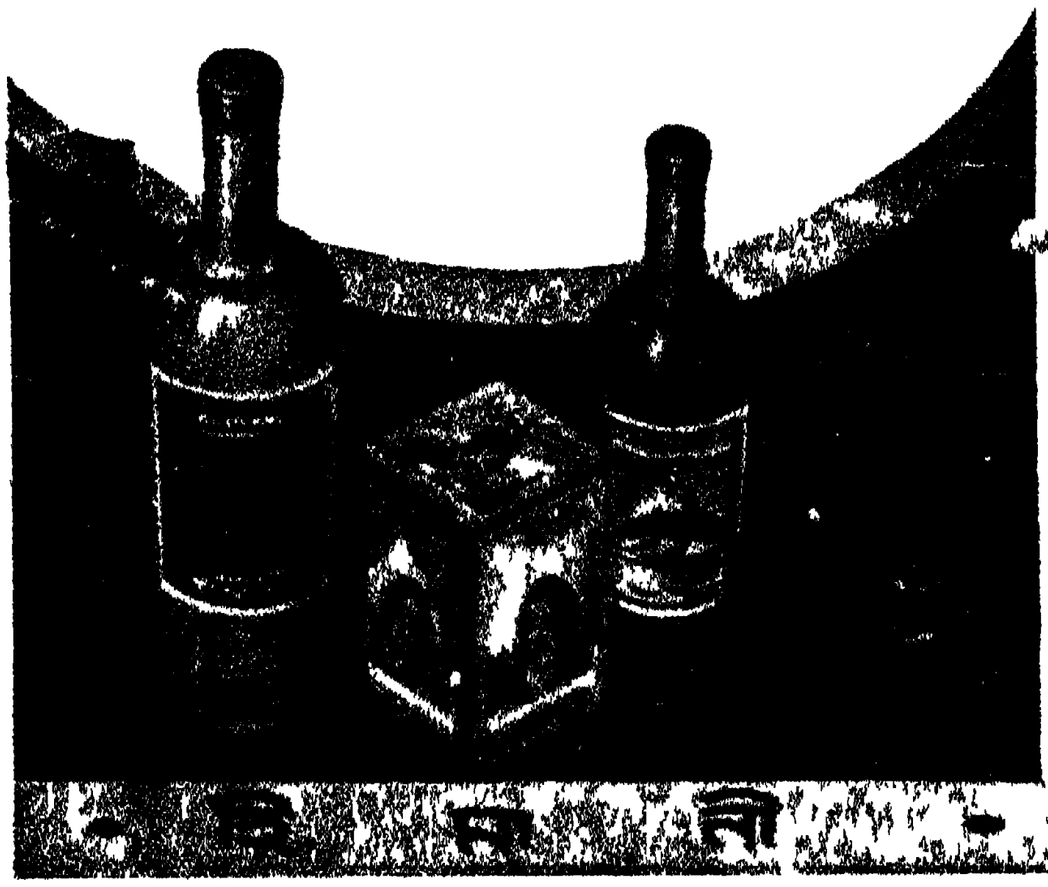

সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৬ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ক্যাস সার্টিফিকেট

৮॥৵০ তিন বছরে ১০৲ টাক
৮৬।০ „ „ ১০০৲ „
৮৬২॥০ „ „ ১০০০৲ „

আমানতকারী এক বৎসর পরে যে কোন সময়ে সুদসহ টাকা তুলে নিতে পারেন।

চেয়ারম্যান: মি জে, সি সরকার

ব্রাঞ্চ: শ্যামবাজার, বড়বাজার, ময়মনসিংহ মালদহ ও নারায়ণগঞ্জ।

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস:—ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস, মিশন রো, কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন…২ ০০,০০ ০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন · ৫০ ০০ ০০০৲ টাকা
রিজার্ভ ফাণ্ড … ২৩,০০,০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধে

অনিশ্চয়তার দিনে আপনার সঞ্চিত অর্থের নিরাপত্তাই আপনার প্রধান বিবেচ্য। ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ।

—: শাখা সমূহ :—

বাঙলা	**উড়িষ্যা**	**দিল্লী**
কলিকাতা:	কটক	চাঁদনী চক
বড়বাজার	**আসাম**	সদরবাজার
শ্যামবাজার	গৌহাটী	**পাঞ্জাব**
ক্যানিং ষ্ট্রীট	ডিব্রুগড়	লাহোর
হাইকোর্ট	**মধ্যপ্রদেশ ও বেরার**	রাওলপিণ্ডী
হাটখোলা	নাগপুর	অমৃতসর
কালীঘাট	ইটওয়ারী	**বোম্বাই**
ভবানীপুর	জব্বলপুর	ফোর্ট-বোম্বাই
বালীগঞ্জ	জব্বলপুর ক্যাণ্ট	স্যাণ্ডহার্ষ্ট রোড
ঢাকা	অমরাবতী	কল্বাদেবী
নারায়ণগঞ্জ	রায়পুর	সুরাট
ময়মনসিংহ	**মাদ্রাজ**	আহমেদাবাদ
চট্টগ্রাম	মাদ্রাজ	মস্কটি মার্কেট
ফরিদপুর	**যুক্তপ্রদেশ**	**উঃ পঃ সীমান্ত**
খুলনা	লক্ষ্ণৌ	**প্রদেশ**
বরিশাল	আমিনাবাদ	পেশোয়ার
জলপাইগুড়ি	কানপুর	**বেলুচিস্থান**
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	মেষ্টন রোড	কোয়েটা
আসানসোল	এলাহাবাদ	**রাজপুতানা**
বিহার	কাটরা	আজমীর
পাটনা	বেনারস	**সিন্ধু**
গয়া	আগ্রা	করাচী
মজঃফরপুর	বেরিলি	
	মীরাট	

লণ্ডন এজেণ্টস:—মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড

"ক্যালকাটা ন্যাশন্যালের" সেভিংস্ ব্যাঙ্ক একাউণ্টটি অতিশয় [illegible]

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

বরযাত্রী (৪ সং) ২৷৷০ বসন্তে (২সং) ৩৲ বর্ষায় (৩সং) ৩৲ শারদীয়া (২সং) ৫৲ হৈমন্তী ৩৲ চৈতালী ৩৲ দৈনন্দিন ২৷৷০ নীলাঙ্গুরীয় (৪সং) ৩৲ আগামী প্রভাত ৩৲ বিশেষ রজনী ১৲ ক্ষণ-অন্তঃপুরিকা ২৲ স্বর্গাদপি গরীয়সী প্রতি খণ্ড ৪৲

শ্রীমতী বাণী রায়ের

প্রেম ৩৲ পুনরাবৃত্তি ২৲

নং গোপাল দাস, আই সি-এস্-এর

নিঃসহ যৌবন ৩৲ তারা দুজন ২৷৷০ অনবগুণ্ঠিতা (২ সং) ৩৲ সাগর দোলায় ঢেউ ৩৲

রামপদ মুখোপাধ্যায়ের

মহানগরী ৪৲ দুঃস্বপ্ন ২৲

নন্দগোপাল সেনগুপ্তের

সমাজ ও যৌনসমস্যা ২৲ পায়ে চলার পথ ৩৲ অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ ২৷৷০

ভাস্করের রচনা

মজলিস ১৷৷০ শুভশ্রী ১৷৷০ কথিকা ১৷৷০ লেখা ৩৲

অমলেন্দু দাসগুপ্তের

ডেটিনিউ ২৲

কমল দাসগুপ্তের

পরিচিতা ৩৲

*** সদ্য প্রকাশিত ***

মোহিতলাল মজুমদারের

জয়তু নেতাজী ৩৲

প্রমথনাথ বিশীর

রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর ৩৲ কোপবতী (২ সং) ৩৲

ডাঃ সুশীলকুমার দের

ক্ষণ-দীপিকা ২৲

ডাঃ সুবোধ সেনগুপ্তের

আমাদের ইংরেজী শেখা ১৷৷০

কাজী আবদুল ওদুদের

কবিগুরু গ্যেটে ১ম খণ্ড ৫৲ ২য় খণ্ড ৪৲

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

ব্যক্তিগত ২৲

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ

অবধূত প্রণীত

ঈশোপনিষৎ ২৲

ডাঃ যজ্ঞেশ্বর ঘোষের

গীতা ও হিন্দুধর্ম্ম ৪৲

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর

কালো ঘোড়া ৩৲ বন্ধনী (২য় সং) ২৲ ক্ষুধা ২৷৷০ শৃঙ্খল (৩সং) ২৷৷০ মনের গহনে (২সং) ২৲ বসন্ত রজনী (২ সং) ১৷৷০, ঘরের ঠিকানা (২ সং) ২৷৷০ শতাব্দীর অভিশাপ (৩ সং) ২৷৷০ হালদার সাহেব ২

শ্রীমতী রেণু মিত্রের

রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ২৲ প্রাথমিক শিক্ষা ২৷৷০

পরিমল গোস্বামীর

মহামন্বন্তর ৩৲ ঘুঘু (২ সং) ২৲ দুষ্মন্তের বিচার (২ সং) ১৷০ ট্রামের সেই লোকটি (২ সং) ২৲ ব্ল্যাক মার্কেট ২৲

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

সেকেণ্ড হ্যাণ্ড ২৲ সঞ্চারী ১৲

আমিনুল হকের

টাইগার হিল ৩৲

শ্রীমতী আশালতা সিংহের

সমী ও দীপ্তি ১৲ সমর্পণ ১৷৷০ ভুলের ফসল ২৲ অন্তর্যামী ১৷৷০

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের

ময়ূখ ১৲ মরুশিখা ১৷০ কাব্য পরিমিতি ১৲

প্রমথনাথ বিশীর

গালি ও গল্প ১৷৷০ গল্পের মতো ৷৷০ মৌচাকে ঢিল (২ সং) ২৷৷০

অজিতকৃষ্ণ বসু (অ-কৃ-ব)

জীবন সাহারা ১৷০

রবীন্দ্রোত্তর শ্রেষ্ঠ কবি-সমালোচক

শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের

বাংলা কবিতার ছন্দ ৪৲ বাংলার নবযুগ ৪৲ আধুনিক বাংলা সাহিত্য (৩ সং) ৫৲ বিস্মরণী (৩ সং) ৪৲ স্মর-গরল ৪৲ কাব্য-মঞ্জুষা ৩৲

সু বী র শি শু গ্র ন্থ মা লা

মোহিতলাল মজুমদারের

রূপকথা (২ সং) ১৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ছেলেদের আরণ্যক ৩৲

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শিবাজী মহারাজ ১৲

নন্দগোপাল সেনগুপ্তের

বসন্তের রাণী ৷৷০

জে না রে ল প্রি ণ্টা স য়্যা ণ্ড পা ব লি শা র্স লিঃ

১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে পত্র লেখবার সময় দয়া ক'রে 'বর্ত্তমানের' নামোল্লেখ করবেন।

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্তের

—ঃ শেষের গান ঃ—

(কাব্য-কাহিনী)

মূল্য—১৷৹

অভিমত ঃ—

"চমৎকার কবিতা। সত্যিকারের কবিতা!! অতি সুন্দর। ভাষাও অনবদ্য—পড়িয়া খুব ভাল লাগিল। রবীন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথ ছাড়া কোন কবির এ বিষয়ে এত সুন্দর কবিতা পড়ি নাই।"

—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

প্রাপ্তিস্থান—বর্তমান লিমিটেড,
৩৩এ, মদন মিত্র লেন
ও
গ্রন্থকারের নিকট,
৪৫/১ বি, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নবপ্রকাশিত কয়েকখানি বই

শ্রীফাল্গুনি মুখোপাধ্যায় ঃ
স্বাধীনতা হীনতায় ৪

শ্রীসুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ
বন্দেমাতরম্ ৩৷৹
(ছায়াচিত্রে রূপায়িত)

শ্রীতারাপদ রাহা ঃ
রহস্যময়ী ২৷৹

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ
যুগের যাত্রী ২৷৹

শ্রীপ্রবোধ সরকার ঃ
জীবন সৈকত ২৮৹
(চিত্ররূপ—C. I. D.)

প্রকাশক ঃ সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে পত্র লেখবার সময় দয়া করে 'বর্তমান'-এর নামোল্লেখ করবেন

বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে পত্র লেখবার সময় দয়া ক'রে বর্তমানে'র নামোল্লেখ করবেন।

প্রত্যেকটী ছেলেমেয়েদের জন্য ভাল বই

হেমেন রায়

যক্ষপতির রত্নপুরী

গুপ্তধনের সন্ধানে যে সকল "এ্যাডভেঞ্চারের" বই বাজারে আছে, এটাই সবচেয়ে সেরা বই। মূল্য—১।০

সতীকুমার নাগঃ **কামালের গড়া দেশ** ৸৵০

তুর্কীবীর কামালের জীবনচরিত সরল ভাষায় লেখা

হেম চট্টোপাধ্যায়ঃ **ভণ্ডুলরামের দিগ্বিজয়** ১৲

একখানি প্রকৃত এ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু অনূদিত

চায়নার সেরা কাহিনী

শীঘ্রই বের হবে

কো-অপারেটিভ বুক ডিপো

৫৪, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

২য় খণ্ড (বাহির হইল) দাম—৫৲

বাংলা সাহিত্যে জাতীয়-আন্দোলনের প্রামাণিক তথ্যপূর্ণ এই প্রথম বই। সকল পত্রিকায় উচ্চপ্রশংসিত।

Dr. Hemendranath Dasgupta

INDIAN NATIONAL CONGRESS

Price Rs. 6/-

সাহিত্যের কথা

বাইশটি সুচিন্তিত সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধের সমষ্টি। দাম ৪৲

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

চক্রধারী (সুবৃহৎ রাজনৈতিক উপন্যাস) ৪৲

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু

ইতালীর সেরা গল্প (উচ্চপ্রশংসিত) ২৷৷০

পরিমল মুখোপাধ্যায়

দিল ডাক (উপন্যাস) ৩৲

শৈলবিহারী ঘোষ

জার্মাণীর সেরা গল্প ৩৲

বুক ষ্ট্যাণ্ড

১।১এ, বংকিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরীর

দুইখানি জনপ্রিয় উপন্যাস—অভিনব রূপ লইয়া প্রকাশিত হইয়াছে

ডাঃ সেন ১৲

ডাঃ সেন একজন স্বয়ংসিদ্ধ পুরুষ। এই শ্রেণীর জীবন্ত চিত্র চলমান জগতে অভিনব। সুখ দুঃখ হাসি কান্না বিজড়িত মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এ সংসারের চোখে পড়ে বলেই এত চিত্তাকর্ষক।

জীবন-মৃত্যু ১৷০

জীবন মৃত্যুর ভিতর দিয়ে মানব জীবনের নানা ঘটনার অভিনব আলেখ্য। দামোদরের তীরে চন্দনা গ্রামের বহু বিচিত্র নরনারীর অপরূপ কাহিনী নানা পরিবেশের মধ্য রূপায়িত।

অভিভাষণ—৷৷০ (বিভিন্ন সভাসমিতিতে প্রদত্ত ভাষণ সঙ্কলন—গভীর তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধের সমষ্টি) **অতুলচন্দ্র**—৷৷০

সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী পরিকল্পিত ও দ্বিজেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় অঙ্কিত উপন্যাস—

শনি-রবি-সোম ১৲

শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে

কর্জ্জনার মাঠ ২৲

কর্জ্জনার মাঠ অজয়ের বান বড়ডাঙ্গার মেলা হিজলের বিল নয়া পলাশী, কল্যাণপুরের শ্মশান, পাঁচুন্দির হাট রিলিফ-সেণ্টার প্রভৃতি গল্পসঙ্কলন।

সহর উপকণ্ঠে ৩৲

মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর কলিকাতা ও সহরতলীর বুকের উপর দিয়ে কি ভাবে চলেছে তারই কাহিনী। বিরাট পটভূমিকায় অভিনব আলেখ্য।

বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক

শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায়চৌধুরীর

শ্মশান ঘাট ২৲

জনপ্রিয় কথাশিল্পী

শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র মজুমদারের

মহামানব সঙ্ঘ ২৲

কংসনদীর তীরে ১৷৷০

রায় বাহাদুর খগেন্দ্র নাথ মিত্রের

মন্দাক্রান্তা— ৩৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মেঘমল্লার—৩৷৹

মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নির্ব্বাসিত রাজকন্যা—৩৲

দুর্গে দুর্গতি নাশিনী—৩৷৹

শিশির সেন গুপ্তের

সূর্য্যতপস্যা—৩৲

গিরিবালা দেবী সরস্বতীর

দান প্রতিদান—৪৷৹ কুড়ান মাণিক ৩৲ হিন্দুর মেয়ে ৩৲

মুকুট মণি ৩৷৹

অন্নপূর্ণা গোস্বামীর

স্রষ্টা—৩৲

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

রাতজাগা—২৷৹

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়ের

শেষ আশা—২৲

প্রতিজ্ঞান—৩৲

জগদীশ গুপ্তের

গতিহারা জাহ্নবী—৩৲

যথাক্রমে—৩৲

চারুদত্ত আই, সি এস

মায়া - ২৷৹ দেবারু—৩৷৹

মোহিত লাল চট্টোপাধ্যায়ের

সব্যসাচী — ২৷৹

শিশির সেনগুপ্ত ও বসন্ত ভাণ্ডারীর

গ্রেট হাঙ্গার (যন্ত্রস্থ)

কিসলিয়াকফ্ - ৩৷৹

পাওয়ার অফ্ লাই—৩৷৹

বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অনমিতা—৩৲

রমেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

অজানা পথে—৩৲

সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

জবাব—২৷৹ কিরণলেখা—১৷৹

তমাললতা বসুর

কথার দাম—১৸৹

প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ভাঙ্গাগড়া—৩৷৹

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের

সতীলক্ষ্মী—৩৷৹

নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের

বিদেশীফুল—২৷৹

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের

চৌ চোঁ—৩৲ মাটির স্বর্গ—৩৷৹

গৌরগোপাল সেনগুপ্ত

চিল্ড্রেন অফ নিউ ফাষ্ট—১৷৹

ধুসর পথে ধুলা—২৲

প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর

হৃদয়ের চাঁদ ৩৷৹

ব্যোমকেশ বন্দোপাধ্যায়ের

উদয়াচল ২ কারামুক্তি ৩৲

বুদ্ধদেব বসুর

শ্বেতপত্র—২৲

প্রেমের বিচিত্র গতি—২৷৹

সৌরীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মধুযামিনী—২৷৹

বিভূতিভূষণ মজুমদারের

হাতের নোয়া ২৷৹ দিশেহারা ২৷৹

স্বপ্ন পরিণীতা—২৷৹

স্নেহাশীষ —২৷৹

কেশবচন্দ্র গুপ্তের

একশ' সতের—৩৲

লাল ভুম্বা—২৷৹

মাস্কেভেঞ্জার সিরিজ

বনস্পতি সম্পাদিত

রমেন ও রেখা—২৲

রেখা কোথায়—২৲

ভোলানাথ কে —২৲

নীতীশ কেন—২৲

পিনাকীর জয়—২৲

গে রাজগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বুকের ঋণ—১৷৹

বরেন্দ্র লাইব্রেরী—২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ছাপার অক্ষরে ফুটে উঠে

ছবি

সাহিত্য ও শিল্পকে প্রকাশ করে

ছাপাখানা

জাতির সমৃদ্ধি ও ভাবধারার বাহন

ছাপাখানা

সুতরাং তার সমৃদ্ধি কামনা করে না কে?

ভাল ছাপা হয় বলেই এই ছাপাখানার এত নাম।

জ্যামিতি ও অঙ্কের কাজে স্পেশালিষ্ট

অন্নপূর্ণা প্রেস

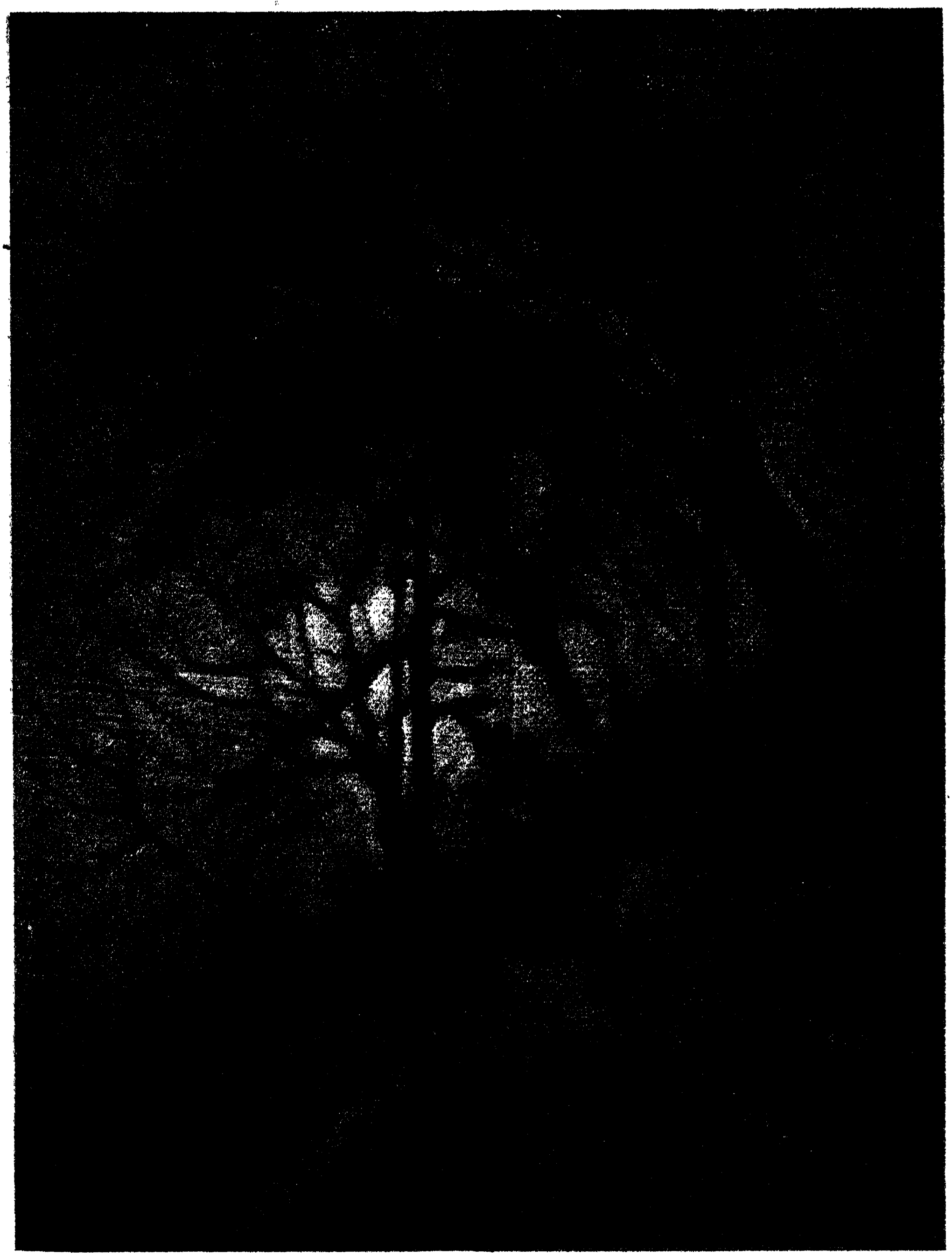

কুয়াসার মায়া — শিল্পী—কিশোরী রায়

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

জাতিকে যিনি অনেক কিছু দিয়েছেন, জাতি তাঁকে কি করে ভুলবে। একটা জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মহিমা তো প্রধানতঃ এই শ্রেণীর মানুষদের ঘিরেই গড়ে ওঠে;—এঁদের আদর্শই তো জাতিকে নবতর বৃহত্তর কর্মপ্রয়াসে উদ্বুদ্ধ করে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকেও তাই বাঙালীর পক্ষে কোনদিন ভোলা সম্ভব নয়। বছর ঘুরে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী আবার ফিরে এসেছে। প্রাচীন ভারতের আচার্যদের সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা ও বিশুদ্ধ জ্ঞানসাধনার সমন্বয় অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই যাঁর চরিত্রের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল,

সেই আচার্যদেবের উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি। যাঁর মধ্যে শিক্ষকতার আদর্শ একটি অপরূপ মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল, যাঁর হাতে-গড়া অসংখ্য ছাত্র আজ বাংলা তথা ভারতের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে উজ্জ্বল করেছে, তাঁকে স্মরণ করি। নব্য ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, ক্ষুরধার মনীষী, আদর্শবাদী সমাজসংস্কারক, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মশালবাহী, ব্যবসায়-বিমুখ চাকুরীপ্রিয় বাঙালী যুবককে ব্যবসায়মুখী করবার জন্য সারাজীবন অক্লান্ত প্রচারক ও কর্মী,—কতো বিচিত্র পরিচয় আমাদের আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের। বন্যায়, দুর্ভিক্ষে, দুর্গতত্রাণে প্রফুল্লচন্দ্রের বরাভয় মূর্তি আমরা দেখেছি,—সে সব ক্ষণে এক মুহূর্তে তিনি তাঁর ল্যাবরেটরি ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। 'মাধ্যমিক শিক্ষা বিলে'র নামে লীগ গবর্ণমেণ্টের সাম্প্রদায়িক স্বৈরাচারের খড়্গ যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর পড়তে উদ্যত হ'ল, তার বিরুদ্ধে আচার্যদেবের কণ্ঠকে আমরা গর্জে উঠতে শুনেছি। বাংলার জীবনের বহু ক্ষেত্রেই সহজ বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি, বিপুল জ্ঞান ও বিপুল কর্মের সুসমন্বয় করেছিলেন নিজ জীবনে। বাংলার যুবশক্তি বাংলার সাম্প্রতিক-অতীত ইতিহাসের এই সব বিরাট মহীরুহ থেকে কি জীবনী আহরণ করবে না?

কবি প্যারিমোহন

কবি প্যারিমোহন গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ ট্রাম থেকে নামতে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনার ফলে মারা যান। তাঁর কন্যার মৃত্যুর শোকে কিছুদিন আগেই তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ ঘটে। তাঁর মৃত্যুতে আমরা স্বজন বিয়োগ ব্যথা অনুভব করছি।

'মডার্ণ রিভিউ' ও 'প্রবাসী'তে তিনি বহুদিন সহ-সম্পাদকের দায়িত্বভার বহন করে গেছেন। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 'মেঘদূতের' সরল বাঙলা অনুবাদ সাহিত্য সমাজে আদর লাভ ক'রেছিল।

'বঙ্গবাসী' কলেজে অধ্যাপনাতেও তাঁর সুনাম প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল।

তাঁর প্রতিভাপূর্ণ জীবনের অন্তরালে নিরলস, সদা-হাস্যমুখ মানুষটিকে ভাল না বেসে পারা যেত না।

আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাচ্ছি।

২০শে জুন

ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে ২০শে জুন তারিখটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর ষড়যন্ত্রে সাম্রাজ্যরক্ষার স্বার্থে ভারতে যে সাম্প্রদায়িক বিভেদের ভিত্তি-পত্তন হয়, কৌশলী মিঃ জিন্না তারই উপর পাকি-স্তানের ইমারৎ তৈরি করলেন। মিথ্যা-বিভেদের বালুচরে, হিন্দু-মুসলমানের রক্তের মসলায়, বৃটিশ স্বার্থের ইঁটে তৈরি এই ইমারতের আয়ু যে দীর্ঘ হ'তে পারে না,—হওয়া উচিত নয়,—সে কথা দুর্দান্ত সাম্প্রদায়িকতাবাদী লীগ-নায়কেরাও

এখন বুঝতে আরম্ভ করেছেন। বলা যেতে পারে, ২০শে জুন থেকেই এই উপলব্ধির সূত্রপাত।

২০শে জুন ৫৮-২১ ভোটে বাংলা ভাগ হয়ে গেল।

বাংলার লীগপন্থীদের মনে মনে ধারণা হয়েছিল, ইংরেজ ভুক্ত রক্ষার যে স্বার্থে ভারতে সাম্প্রদায়িক বিভেদ রোপন ক'রেছিল, সেই স্বার্থেই যাবার বেলায় মসলিম লীগকে শক্তিশালী ক'রে দিয়ে যাবে। লীগের দাবী ছিল আসাম, বাংলা এবং পাঞ্জাব, সীমান্ত ও সিন্ধু তাব চাই। আসাম হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ। মিথ্যা অভিযোগে পূর্ব পাকিস্তান কিল্লা গ'ড়ে ঝুটা সমরায়োজনের হুমকিতে আসামকে কব্জিগত কবাব একটা ব্যর্থ আয়োজনও হয়েছিল। কিন্তু বরদলুই গবর্ণমেণ্টের শক্তির পরিচয় পেয়ে লীগ আসামের লোভ ছেড়ে দিলে। তবু তাব মনে ভরসা ছিল, সমগ্র বাংলা এবং সমগ্র পাঞ্জাব লীগের হাতে আসবেই। কিন্তু বড়লাট যখন ফতোয়া দিলেন, পশ্চিম বাংলা এবং পূর্ব পাঞ্জাব ইচ্ছা করলে পাকিস্তানে যোগ না দিয়ে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিতে পারে, এবং মিঃ জিন্না তা মেনে নিলেন, বাংলার লীগপন্থীরা তখন থেকেই প্রমাদ গণতে আরম্ভ করলেন। তাঁদের সুর গেল বদলে।

নির্লজ্জের ভাঁড়ামি

যাঁদের নীতি হোল হিন্দু মুসলমান দুই পৃথক জাতি, আচারে, ব্যবহারে, সংস্কৃতিতে তারা সম্পূর্ণ পৃথক, এবং সেই নীতিতেই ভারতকে দুই ভাগে ভাগ করার দাবী— তাঁরাই রাতারাতি ভোল বদলে বলতে লাগলেন, এ কি একটা কথা হ'ল। বাংলা কখনও ভাগ হয়? হিন্দু মুসলমান যে দুই ভাই,—এক বৃন্তে দুটি ফুল। হিন্দুরা প্রশ্ন করলে, তাই যদি হয়, তাহ'লে আর ভারত-বিভাগ কেন? ভারতীয় ইউনিয়নেই আমরা একবৃন্তে দুটি ফুলের মতো মলয় হাওয়ায় দুলতে থাকি। লীগের তাতে মত নেই। ভারত-বিভাগ হবে। পাকিস্তান চাই-ই। সেই পাকিস্তানের কাটা-ডালে বাংলার হিন্দু-মুসলমানকে একবৃন্তে দুটি ফুলের মতো দুলতে হবে। লীগ বললে, তোমরা করছ কি? বিড়লা-ডালমিয়ার গোলামী করবার জন্যে হিন্দুস্থানে যোগ দেবে? পাকিস্তানে যোগ দেওয়াই যে হিন্দুদের স্বার্থের অনুকূল এত বড় দাঙ্গার পরে এবং লীগ মন্ত্রীমণ্ডলের গত দশ বৎসরের সুশাসনেও কি বুঝতে পারছ না? চেয়ে দেখ, সিন্ধু প্রদেশের দিকে। কি রকম ন্যায় এবং সুবিচারের সঙ্গে মিঃ গোলাম হোসেন হেদায়েতুল্লা সেখানে 'শরিয়তের শাসন' চালু করেছেন। শিক্ষাক্ষেত্র থেকে হিন্দুরা বহিষ্কৃত। ভূমিসত্ব আইনে তাদের জমি কি সুকৌশলে মুসলমানের হাতে চলে যাচ্ছে। এমনিতেই সেখানে হিন্দুদের স্থান সংকীর্ণ হয়ে এসেছে,—আগে বিহারের আশ্রয়প্রার্থী মুসলমান, তারপরে সিন্ধী মুসলমান, তারপরেও যদি বাড়ী থাকে তাহ'লে তা সিন্ধুর হিন্দুরা পেতে পারে,—এর উপর আবার জনাব জিন্নার পাকিস্তানী বাহিনীর স্থান সংকলানের জন্যে করাচী শহরের হিন্দু-অঞ্চল বন্দর রোড ও আর্টিলারী ময়দানে যে ক'খানা বাড়ী হিন্দুদের আছে, তাও বুঝি যায়। সবদিকে মার খাবার এই আনন্দ ছেড়ে বাংলার হিন্দুরা যে হিন্দুস্থানে যোগ দিতে চলেছে, তার জন্যে বাংলার লীগপন্থী কাগজগুলিতে প্রত্যহ চোখে সাঁতার-পানি বইছে। নির্লজ্জের এই ভাঁড়ামি যে হিন্দুরা খুবই উপভোগ করছে তা বলাই বাহুল্য।

ব্যবচ্ছেদের খতিয়ান

বলা অনাবশ্যক, ভারত অথবা প্রদেশ ব্যবচ্ছেদে কোনো হিন্দুই খুসি হতে পারেনি। গত শতাব্দীকাল ধরে সে অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখে এসেছে। এরই জন্যে সে জেলে গেছে, দ্বীপান্তরে গেছে, ফাঁসিকাঠে ঝুলেছে। এরই জন্যে কত হিন্দু-গৃহে সুখের নীড় ভেঙ্গে গেছে, কত পরিবার ছন্নছাড়া, সর্বস্বান্ত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তার বিনিময়ে কী পেলে তারা। আর লীগ,—দেশসেবার প্রেরণা যারা কোনোদিন অনুভব করলেনা, পাকিস্তানের আহ্বানেও

একসঙ্গে বাস করতে পারছে না। মাতৃভূমি ভাগ হয়ে গেল হিন্দুস্থান আর পাকিস্তানে। তবু তাদের পাশাপাশি বাস করতেই হবে,—কিন্তু আগের মতো শান্তিতে বোধ হয় আর নয়, নবার্জিত তিক্ততার সঙ্গেই হয় তো।

অথ বিভাগ পর্ব

তিক্ততার এই তো সূত্রপাত। এর পরে আসছে সীমানা কমিশন। সাম্প্রদায়িক সংখ্যার অনুপাত হিসাবে তাঁরা পশ্চিম ও পূর্ব বাংলাকে ভাগ ক'রে দেবেন। বঙ্গ বিভাগ কাউন্সিলে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করবেন শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এবং ধীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায় আর মুসলিম লীগের প্রতিনিধিত্ব করবেন মিঃ এইচ, এস, সুরাবর্দি ও খাজা নাজিমুদ্দিন।

লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ঘোষণায় আপাততঃ কলিকাতা, সমগ্র বর্ধমান বিভাগ (অর্থাৎ বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলী), প্রেসিডেন্সী বিভাগের খুলনা ও ২৪ পরগণা জেলা এবং জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলা হিন্দুপ্রধান অঞ্চলের মধ্যে, অবশিষ্টাংশ মুসলমানপ্রধান অঞ্চলের মধ্যে পড়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের বাইরে পড়েছে। শ্রীহট্ট সম্ভবতঃ আসামের মধ্যে যাবে। কিন্তু বলাই হয়েছে, এই বিভাগ চূড়ান্ত নয়। বাংলা বিভাগের সময় সীমানা কমিশন শুধু সংখ্যানুপাতই বিবেচনা করবেন না, 'অন্যান্য বিষয়ও' বিবেচনা করবেন। সেই 'অন্যান্য বিষয়' যে ঠিক কি কি, তা এখন বলা শক্ত। তবে সাংবাদিক সম্মেলনে বড়লাট স্পষ্ট ক'রেই ব'লেছেন, "এই অস্থায়ী বিভাগের সঙ্গে চূড়ান্ত বিভাগ হুবহু এক হবে না।" আরও পরিষ্কার ক'রে বোঝাবার জন্যে তিনি পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার এবং বাংলার দিনাজপুর জেলার উল্লেখ করেছেন। গুরুদাসপুরে মুসলিম জনসংখ্যাহার শতকরা ৫০·৪, আর অমুসলমানের শতকরা ৪৯·৬। অস্থায়ী বিভাগে গুরুদাসপুরকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে ধরা হলেও চূড়ান্ত বিভাগে নিশ্চয়ই তার সমগ্র অংশ মুসলিম-পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

বাংলার অবস্থা

সাময়িক বিভাগে বাংলার কয়েকটি জেলাকেও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন মুর্শিদাবাদ, যশোহর, নদীয়া, দিনাজপুর, মালদহ, ফরিদপুর, ও রাজশাহী। এই সমস্ত জেলার কোনোটাই সমগ্রভাবে পাকিস্তান-বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে না। এই সমস্ত জেলার কতক অংশ হিন্দুপ্রধান এবং হিন্দুবঙ্গেরই সংলগ্ন। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমা হিন্দুপ্রধান। অন্যান্য মহকুমার অন্তর্গত বেলডাঙ্গা, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, নবগ্রাম, ও সাগরদীঘি থানাও হিন্দুপ্রধান। তাছাড়া মুর্শিদাবাদ জেলার প্রধান সহর বহরমপুরও একান্তভাবে হিন্দুপ্রধান। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর ও রাণাঘাট মহকুমা এবং যশোহর জেলার অভয়নগর, সালিখা, নড়াইল ও কালিয়া থানাও হিন্দুপ্রধান এবং হিন্দুবঙ্গের সংলগ্ন। দিনাজপুর জেলায় হিন্দু ও মুসলমানের শতকরা হার সমান-সমান। এবং এর পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমের সামান্য অংশ বাদ দিলে সমস্তটাই হিন্দু-প্রধান। মালদহের ও দিনাজপুরের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে পদ্মার ধার পর্যন্ত সমস্ত মধ্যাংশই হিন্দু প্রধান। এরই সঙ্গে রাজশাহীর দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের হিন্দুপ্রধান অঞ্চল সংযুক্ত করা যেতে পারে।

অন্যান্য বিবেচ্য বিষয়

এ তো গেল জনসংখ্যার দিক দিয়ে। কিন্তু জনসংখ্যাই বঙ্গবিভাগের একমাত্র ভিত্তি হতে পারে না। বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন 'অন্যান্য বিবেচ্য বিষয়ের' উল্লেখ করেছেন। তার অর্থ যাই হোক, ঐতিহাসিক, ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক দিক যে এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বিবেচনা করবার বিষয় তাতে আর সন্দেহ নেই। হিন্দু বঙ্গের প্রাক্‌বৃটিশ যুগের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল নবদ্বীপ

ও কৃষ্ণনগর এবং প্রতাপাদিত্যের যশোহর। ঐতিহাসিক এবং ভৌগলিক দিক দিয়েও মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং যশোহর প্রায় দুই শতাব্দীকাল প্রেসিডেন্সি বিভাগের সঙ্গে সম্বদ্ধ। জনসংখ্যার উপর ভিত্তি ক'রে ওই জেলা-গুলির কিয়দংশকেও বিচ্ছিন্ন ক'রে পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া কিছুতেই সঙ্গত হ'তে পারে না।

কিন্তু এ সবের চেয়েও গুরুতর বিবেচনার বিষয় আছে। সীমানা কমিশনকে সর্বদাই মনে রাখতে হবে, কি অবস্থায় এই বিভাগ হচ্ছে। ভারত এক এবং অবিভাজ্য, এই ছিল চিরন্তন ধারণা। এই ভারতে এতকাল ধ'রে হিন্দু ও মুসলমান, শিখ ও পার্শী, বৌদ্ধ জৈন ও খৃষ্টান একসঙ্গে এক জাতি হিসাবে পাশাপাশি শান্তিতে বাস ক'রে এসেছে। ইংরেজের সাম্রাজ্য-স্বার্থের সঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ মিশিয়ে মিঃ জিন্না দুই নেশনের থিওরী প্রচার করলেন। এবং এরা যে একসঙ্গে বাস করতে পারে না, তা প্রমাণ করবার জন্যে এমন এক ভয়াবহ দাঙ্গা বাধানো হ'ল ইতিহাসে যার তুলনা মেলে না। দাঙ্গা বাধানো কঠিন কিছুই নয়। দুটি কয়েক গুণ্ডা ভাড়া করে যদি খুন-খারাপি আরম্ভ করা যায়, অনতিবিলম্বেই তা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রূপ নিতে বাধ্য। এর পিছনে যদি একটা সাম্প্রদায়িক মন্ত্রীসভার প্রশ্রয় থাকে তাহ'লে তো কথাই নেই।

সাময়িক দিক

ভারত তথা প্রদেশ-বিভাগের এই পটভূমিকা সীমানা কমিশন কিছুতেই বিস্মৃত হতে পারেন না। বিভাগের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্বেষ-বিধ্বস্ত দেশে শান্তির প্রস্রবণ ঝর ঝর ঝরে আসবে, এ ব'লে যারা মনকে প্রবোধ দিতে চায় তারা দিক। কিন্তু বাস্তব সত্যকে উপেক্ষা করা রাজ-নীতিকের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ। পশ্চিম বাংলা স্বাধীন হিন্দুস্থানের পূর্বসীমানা। সীমানা কমিশনকে সর্বদাই মনে রাখতে হবে, দুটি স্বতন্ত্র, স্বাধীন রাষ্ট্রের সীমারেখা নির্দেশ করার দায়িত্ব তাঁরা গ্রহণ করেছেন। এ বিভাগ এক কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন দুটি প্রদেশ বিভাগ নয়। গোপন ক'রে লাভ নেই, এই দুইটি রাষ্ট্র পরস্পর বন্ধুভাবাপন্নও নয়। যদি হত, তাহ'লেও রাষ্ট্র ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব কখন ছিঁড়ে যায় কেউ বলতে পারে না। এরকম ক্ষেত্রে সীমানা এমনভাবে নির্দেশ করতে হবে যাতে উভয়ের মধ্যে বিরোধের অবকাশ অল্প থাকে।

সেই বিভাগ জনসংখ্যার অনুপাতেও সর্বক্ষেত্রে হবে না, —জেলা অথবা থানা হিসাবে ভাগ ক'রেও না। তার জন্যে শরণ নিতে হবে সুপ্রশস্ত পদ্মা নদীর। নোয়াখালির পশ্চিম প্রান্ত থেকে রাজশাহী পর্যন্ত পদ্মানদীর এবং রাজসাহী থেকে দিনাজপুরের উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত আত্রাই নদীর উপর নির্ভর করা যেতে পারে। এই সীমানা নির্দিষ্ট হ'লে দুটি রাষ্ট্র নিশ্চিন্তে নিরাপদে এবং শান্তিতে নিজের নিজের সংস্কৃতির চর্চায় ও জনকল্যাণকর কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে। অন্যথা ভারতে যে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে, এমন ভরসা করবার আমরা সাহস খুঁজে পাচ্ছি না। শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই যদি ভারত বিভাগের প্রয়োজন হয়ে থাকে; তাহ'লে সেই শান্তিকে নিরঙ্কুশ এবং সুপ্রতিষ্ঠ করবার জন্যেই বাঙ্গলাকে পদ্মা বরাবর বিভাগ করার প্রয়োজন অনস্বীকার্য হবে।

বঙ্গ বিভাগের প্রবর্তক

এই প্রসঙ্গে বঙ্গবিভাগের প্রবর্তক হিসাবে 'বসুমতী'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। একদা বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করবার জন্যে যিনি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন, বঙ্গ-ভঙ্গের বাণী প্রথম তাঁরই রসসিক্ত কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হয়েছিল। ১৯৪৬ সালের ভয়াবহ ১৬ই আগষ্টের আগে তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন, মুসলমানেরা যখন কিছুতেই হিন্দুদের সঙ্গে অখণ্ড ভারতে থাকতে রাজি নয়, তখন তাদের

জন্যে সীমান্তে গণভোট গ্রহণ করা হবে। গণভোটে বেলুচিস্থান লীগ-গণপরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সীমান্তের গবর্ণর স্যার ওলাফ ক্যারোর উপর কংগ্রেসী পাঠানদের আস্থা না থাকায় বড়লাট নিরপেক্ষ গণভোট পরিচালনার জন্যে ব্রিগেডিয়ার বুথকে নিযুক্ত করেছেন। মনের দুঃখে স্যার ওলাফ দু'মাসের ছুটি নিয়েছেন। কিন্তু সেটা নিতান্তই মুখরক্ষার জন্যে। সীমান্তে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লীগকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী করবার জন্যে যা কিছু করার দরকার তার কিছুই তিনি বাকি রাখেননি।

বাদশাখানের আপত্তি

এই গণভোটে খান আব্দুল গফুর খানের প্রবল আপত্তি। তিনি জানেন, এই গণভোটের অর্থ সীমান্তে পাঠানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হবে, এবং উভয় পক্ষেরই পাঠানের রক্তে সীমান্ত প্লাবিত হবে। মুসলমানের জীবন-মৃত্যু নিয়ে মিঃ জিন্না খেলা করতে পারেন, কিন্তু সীমান্ত গান্ধী বাদশা খান তা পারেন না। তিনি বলেন, হিন্দুস্থান নয়, পাকিস্তানও নয়, পাঠানের স্বপ্ন স্বাধীন পাঠানীস্থানের প্রশ্নে যদি গণভোট হয় তাঁর আপত্তি নেই; কিন্তু যদি হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের প্রশ্নে গণভোট নেওয়া হয়, তাহ'লে তিনি তা বর্জন করবেন। সেই সিদ্ধান্তই তিনি বড়লাটকে জানিয়েছেন।

বড়লাট তাতে রাজি হননি। অর্থাৎ সীমান্তে গণভোট হবেই। এবং বাদশা খান ও তাঁর অনুগামী সহস্র সহস্র লাল-কোর্তা ও অন্যান্য কংগ্রেসপন্থী তাতে অংশ গ্রহণ করবেন না। এর ফল যে ভালো হবে না, তা বলাই বাহুল্য। বাদশা খান সীমান্তের মুকুটহীন রাজা। পাঠানদের উপর অসামান্য তাঁর প্রভাব। তাঁকে বাদ দিয়ে ফাঁকির referendumএ জিতে সীমান্তকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ক'রে দিলে সীমান্ত পাকিস্তানের দেহে কাঁটার মতো বিঁধতে থাকবে, যতক্ষণ না সে পাকিস্তানের কবল থেকে নিজেকে ছিনিয়ে বের ক'রে আনতে পারবে। সীমান্তের উপজাতি অঞ্চল নিয়ে দুর্ধর্ষ ইংরেজরাজ দুই শতাব্দী ভুগেছেন, পাকিস্তানকেও ভুগতে হবে,—তবে অবশ্য অল্প কালের জন্যে।

দেশীয় রাজ্য

এর পরের সমস্যা দেশীয় রাজ্য নিয়ে। অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যই হিন্দুস্থানে যোগ দিয়েছে। শুধু হায়দারাবাদ আর ত্রিবাঙ্কুর স্থির করেছে, ১৯৪৮ সালের জুনে ভারত বিভাগ ক'রে ইংরাজ দু'টি ডোমিনিয়নের হাতে শাসন ক্ষমতা অর্পণ ক'রে যখন চ'লে যাবে, তখন তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করবে। কংগ্রেসের ক্ষমতা খর্ব হবে, এই আনন্দে লীগ তাতে সম্মতি দিয়েছে। ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান স্যার সি, পি, রামস্বামী আয়ার মিঃ জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে লীগ দরবারে প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থাও ক'রে এসেছেন। কংগ্রেস যে এ ব্যবস্থা মেনে নেবে না তা সুনিশ্চিত। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু আগেই ব'লেছেন, দেশীয় নৃপতিদের সামনে দু'টি মাত্র রাস্তা খোলা আছে,—হয় বর্তমান গণপরিষদে যোগদান, নয় পাকিস্তান গণপরিষদে যোগদান। এ ছাড়া আর তৃতীয় কোনো পন্থা নেই। তাঁরা স্বাধীনতা ঘোষণা করলে, ভারতীয় ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক তাঁদের 'বিদ্রোহী' ব'লে গণ্য করা হবে, এবং অন্য কোনো বৈদেশিক শক্তি যাতে তাঁদের স্বাধীনতা স্বীকার ক'রে না নেন তারও ব্যবস্থা করা হবে।

এই উক্তিতে স্বাধীনতাকামী দেশীয় রাজন্যদের উষ্মা হয়েছে। তাঁরা নির্বিকার চিত্তে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের চোখ-রাঙানী সহ্য করতে পারেন, কিন্তু দেশীয় গভর্ণমেণ্টের অনুরোধ-উপরোধও নয়।

তাঁদের যুক্তি

দেশীয় রাজন্যদের যুক্তি হচ্ছে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসে ইংরেজ চ'লে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সার্বভৌমত্ব

(Sovereignty) তাঁদের কাছেই ফিরে আসবে। এর পরে তাঁরা ইচ্ছা করলে কোনো একটি গণপরিষদে যোগ দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন,—নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারেন।

এর উত্তর হচ্ছে, ইংরেজ এদেশের শাসনভার গ্রহণ করার পূর্বে এঁরা কেউই স্বাধীন ছিলেন না, মোগল সম্রাটের অধীন ছিলেন। অনেকের সে সময় অস্তিত্বও ছিল না। তাঁরা ইংরেজ-রাজের সৃষ্টি। এবং দিল্লী কেন্দ্র থেকে বড়লাট ইংলণ্ড-রাজের প্রতিনিধিরূপে তাঁদের সকলকেই শাসন ও পরিচালন ক'রে এসেছেন। আজ ইংলণ্ড-রাজের শাসন-শক্তি ভারতের দুটি ডোমিনিয়নের কাছে হস্তান্তরিত হতে চলেছে। সুতরাং যে সার্বভৌমত্ব তাঁদের কোনোকালে ছিল না, তা তাঁদের কাছে ফিরে আসার প্রশ্ন উঠতে পারে না। দুটি ডোমিনিয়নের একটির নেতৃত্ব মেনে নেওয়া ছাড়া আর তৃতীয় কোনো পন্থাও তাঁদের থাকতে পারে না।

তাঁদের আরও একটা যুক্তি হচ্ছে, কংগ্রেস যখন সীমান্তের পাঠানদের স্বাধীনতালাভের অধিকার মেনে নিতে প্রস্তুত, তখন দেশীয় রাজন্যদের স্বাধীনতাই বা মেনে নেবেন না কেন? এর উত্তর স্বয়ং মহাত্মাজি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

> "ত্রিবাঙ্কুরের স্বাধীনতা ঘোষণার দাবীর সঙ্গে সীমান্তে পাঠানীস্থান গঠনের আন্দোলনের কোনো তুলনা হয় না। আব্দুল গফুর খান পাঠানীস্থান দাবী করেছেন কারণ পাঠানদের তিনি সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত করতে চান না। তাঁদের শাসনতন্ত্র তাঁরাই তৈরি করবেন এবং পরে নিজেদের ইচ্ছামত ভারতীয় ইউনিয়ন অথবা পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দেবেন। তৃতীয় আর একটি রাষ্ট্রগঠনের অভিপ্রায় তাঁদের নেই। ভিন্ন প্রদেশবাসীর হস্তক্ষেপ সহ্য করতে তাঁরা প্রস্তুত নন। আব্দুল গফুর খান যদি এর থেকে ভিন্ন অন্য কিছু দাবী ক'রে থাকেন, তাহ'লে আমি তাঁর সঙ্গে একমত নই। রামস্বামী চান পাকিস্তান অথবা ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্কহীন তৃতীয় আর একটি রাজ্য গঠন করতে।"

প্রজাদের দাবী

এ সম্পর্কে সব চেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে দেশীয় প্রজাদের দাবী কি? তারা কি চায়? হায়দারাবাদ এবং ত্রিবাঙ্কুরের প্রজামণ্ডল সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছে, তারা ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে পৃথক একটি স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের পক্ষপাতী নয়। তাদের দাবীই থাকবে। মিঃ জিন্না তাঁর নিজের স্বার্থে (অথবা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে কংগ্রেসের ক্ষমতা খর্ব করার স্বার্থে) এই সমস্ত ক্ষুদে 'জার'দের (Czar) স্বীকার করে নিলেও, গণতন্ত্র কখনই স্বীকার করবে না, সার্বভৌমত্ব প্রজাদের হাতে নয়, রাজার হাতে। লক্ষ লক্ষ প্রজার দাবীকে উপেক্ষা ক'রে কোনো স্বৈর শাসক স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারেন না। তার বিপদও আছে। চতুর্দিকে ভারতীয় ইউনিয়ন কর্তৃক বেষ্টিত এই সমস্ত রাষ্ট্র কতক্ষণ প্রবল প্রজা আন্দোলন ঠেকিয়ে রাখতে সমর্থ হবে? এখন যদি এঁরা সেকথা উপলব্ধি করতে না পারেন, তাহ'লে পরে যে মূল্যে তা উপলব্ধি করতে হবে তা প্রীতিকর হবে না।

ইংরাজের কর্তব্য

এই ব্যাপারে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টেরও কর্তব্য আছে। তাঁরা সে কর্তব্য পালন করবেন কি না জানি না। ইতিমধ্যে অনেকের মনেই সন্দেহ উঠেছে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট শেষ পর্যন্ত বুঝিবা মিঃ চার্চ্চিলের মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ করতে চলেছেন। লর্ড ম্যাউণ্টব্যাটেনের ৩রা জুনের সিদ্ধান্ত মেনে নিলেও এতে কেউই খুশি হননি,—না কংগ্রেস, না জাতীয়তাবাদী মুসলমান; না শিখ, না লীগ।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে 'গৃহযুদ্ধের' গালভরা নামে যা চলছে, আসলে তা গুণ্ডামী ছাড়া আর কিছুই নয়। মার্কিন সংবাদপত্রগুলি একে Gangsterism বলেই অভিহিত করেছেন। যে কোনো গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই এ দমন করতে এক সপ্তাহের বেশি সময় লাগবার কথা নয়। আসামে এ গুণ্ডামি দমিত হয়েছে। স্যার ওলাফ ক্যারোর চক্রান্ত সত্ত্বেও

'আমরা মুসলীম লীগের বহু গুণ্ডামি সহ্য করেছি এবং সহ্যের শেষ সীমায় এসে পৌছেচি। এখন তাদের জানা দরকার আমরাও কড়ায় গণ্ডায় গুণ্ডামীর প্রতিশোধ নিতে পারি। লীগপন্থীরা মাউণ্টব্যাটেনের পরিকল্পনায় খুশি হতে পারেন, কিন্তু আমরা খুশি হইনি।"

শ্রীহট্টে গণভোট

আগামী ৫ই ও ৬ই জুলাই শ্রীহট্টের ভাগ্য নির্ধারিত হবে। শ্রীহট্ট পূর্ব পাকিস্তানে সংযুক্ত হবে কি না, এই সম্পর্কে শ্রীহট্টবাসীদের মতামত গ্রহণ করা হবে।

শ্রীহট্ট বাঙালীপ্রধান। আগে বাঙলার অন্তর্গতই ছিল। ১৮৭৪ সালে আসামকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য বাঙলা থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে আসামের সঙ্গে তাকে জুড়ে দেওয়া হয়। বাংলার শ্রীহট্ট বাংলায় ফিরে আসবে, এ সম্ভাবনা দেখা দিলে বাঙালীর আনন্দ হওয়াই স্বাভাবিক ছ'ত। কিন্তু সে বাংলা আর নেই। খণ্ডিত বাংলার অন্য অংশ আর বাংলা দেশ নয়, পূর্ব পাকিস্তান। এই ইস্‌লামীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার প্রশ্নে বাঙালীমাত্রেই আজ বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠেছে।

শ্রীহট্টের অধিবাসীর সংখ্যা ৩১ লক্ষ। শতকরা ৫৬ জন মুসলমান। এক এক বর্গমাইলে ৫৭২ জন লোকের বাস। মুসলমানের সংখ্যা বেশী হওয়ায় গণভোটের ফলাফল সম্বন্ধে আতঙ্ক ও উদ্বেগ দেখা যায়।

চুন, সিমেণ্ট প্রভৃতি শিল্প শ্রীহট্টে বেশ উন্নত হয়েছে। শ্রীহট্টের এই শ্রীবৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে হবে। তার জন্য শ্রীহট্টের পক্ষে যখন পশ্চিমবঙ্গে চ'লে আসা সম্ভব নয়, তখন ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে তাকে সংযুক্ত থাকতেই হবে। আসামের চা, জঙ্গল প্রভৃতি শিল্প-সম্ভাবনার মধ্যে চালের উৎপাদনকেন্দ্র শ্রীহট্টের বিকাশলাভের যথেষ্ট অবকাশ আছে। আর আসাম হবে প্রগতিশীল ভারতীয় ইউনিয়নের অংশ। কাজেই সারা ভারতের সঙ্গে যুক্ত থেকে শ্রীহট্টের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে। মুসলমানদের সংখ্যা বেশী হ'তে পারে। কিন্তু শতকরা ৪৪ জন হিন্দু আসামের সঙ্গে সংযোগে একমত হবে। আর তাছাড়া জাতীয়তাবাদী মুসলমান অনেকেই আসামে আছেন। আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি তাযেবুল্লা সাহেবের প্রভাব মুসলমানদের উপরে কম নয়। পূর্বপাকিস্তান কিল্লার সমরায়োজনের হাস্যকর পরিণামের কারণ খুঁজলে তাযেবুল্লা সাহেবের মত বিশিষ্ট মুসলমানদের প্রভাব দেখতে পাওয়া যাবে। আমরা আশা করি, হিন্দু মুসলমানের শ্রীহট্ট জাতীয় সত্তার ঐক্য প্রতিষ্ঠার দিকেই মত দেবে, ভারতীয় ইউনিয়নে সংযুক্ত থাকার জন্য আসামের সঙ্গেই যোগ দেবে।

ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ প্রভৃতি

জুন মাসের প্রথমে লেঃ কর্ণেল ডিয়নের নেতৃত্বে একটি মার্কিন সামরিক মিশন ওলন্দাজ সামরিকবাহিনী পরিদর্শন করেন এবং ইন্দোনেশিয়ার অবস্থাও পর্যবেক্ষণ করেন। গত মে মাসে ওলন্দাজ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের প্রধান শাসনকর্তা ডক্টর ভ্যান মুক ওলন্দাজদের পক্ষ থেকে ঋণ পাবার আশায় আমেরিকা গিয়েছিলেন। বর্তমানে ইন্দোনেশিয় গণতন্ত্র ও ওলন্দাজদের মধ্যে যে আলাপ আলোচনা চলছে, তাতে এই দুই সংবাদের বেশ তাৎপর্য আছে। ওলন্দাজদের শেষ আপোষ প্রস্তাবে মুদ্রানিয়ন্ত্রণ, বাণিজ্য, আইন ও শৃঙ্খলা, আমদানি রপ্তানি ও কাঁচা মাল সংগ্রহে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে ওলন্দাজদের যুক্ত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতায় সম্মত হ'তে হবে বলা হয়েছে। আগেকার সমস্ত চুক্তির কথা যেন ভুলেই যাওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক এক চুক্তি অনুসারে সমস্ত ওলন্দাজ সৈন্য অপসারণ করার পরিবর্তে সেখানে ১ লক্ষ ৮০ হাজার ওলন্দাজ সৈন্য আছে এবং আরও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। হঠাৎ ওলন্দাজদের এরকম উদ্ধত আচরণের কারণ কি? ইন্দোনেশিয়ায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে, দুর্বল হলেও সেখানে তার সাম্রাজ্যিক অধিকার বজায় রাখতে পারে না, এমন কি প্রচ্ছন্ন বৃটিশ সাহায্যও তাদের অনুকূলে কিছু করতে পারেনি। বরং

পদাবলীর গোড়ার কথা

শ্রীকালিদাস রায়

আমাদের বাংলাদেশে সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের যে ধারা চলিয়া আসিতেছিল, কালক্রমে তাহা ক্ষীণ হইয়া পড়িল। সংস্কৃতে রচিত বৈষ্ণব সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিলে ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার নাটকই বঙ্গদেশে শেষ উল্লেখযোগ্য নাটক, গোবর্ধনাচার্যের আর্যা সপ্তশতী ও ধোয়ী সেনের পবনদূতই শেষ রসকাব্য এবং সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত শেষ ঐতিহাসিক কাব্য। সেন রাজাদের রাজত্বকালে বাংলাদেশের কাব্যসাহিত্যের ধারা অন্য পথে প্রবাহিত হইল। সঙ্গীতের আমন্ত্রণে ও প্রয়োজনে এই নূতন কাব্যধারার সৃষ্টি ও পুষ্টি। সংস্কৃত ভাষাকে অবলম্বন করিয়া জয়দেবের গীতগোবিন্দ আর বাংলাভাষাকে অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যদের চর্যাপদে এই ধারার সূত্রপাত হইল। এই ধারা একাধারে সঙ্গীত, ধর্ম ও কাব্যসাহিত্যকে পুষ্টিদান করিয়াছে।

জয়দেব যে ধারার প্রবর্তন করিলেন তাহাই পদাবলীর ধারা। জয়দেবের এই 'ললিতকান্ত কোমল পদাবলী' রাধাকৃষ্ণের মধুর রসের বৃন্দাবনলীলা অবলম্বনে রচিত ও রাগতালসংযোগে গেয়। বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাস জয়দেবের অনুসরণে যে পদগুলি রচনা করেন সেইগুলিই বাংলা ভাষার প্রথম পদাবলী। পদকর্তাদের গুরু জয়দেব। জয়দেবের পদাবলীর ছন্দ, বিষয়বস্তু, গঠনভঙ্গী, পদবিন্যাস, আলঙ্কারিকতা, ভাবভঙ্গী সমস্তেরই অনুসরণ করিয়াছেন বাংলার পদকর্তারা। কেবল তাহার সঙ্গে সে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাবের কথা মাঝে মাঝে আছে, বড়ু চণ্ডীদাস ছাড়া অন্য কোন পদকর্তা তাহার অনুসরণ করেন নাই।

পদকর্তারা জয়দেবের পদবিন্যাস অনেক পদে অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন—জয়দেবের কোন কোন শ্লোককে ও পদের আকার দান করিয়াছেন। জয়দেবের আলঙ্কারিক চাতুর্যের সবটুকুই পদকর্তাদের রচনায় বিকীর্ণ হইয়া আছে। জয়দেবের পদগুলি বাংলা ও ব্রজবুলির পদগুলির তুলনায় দীর্ঘ। গীতগোবিন্দে রাধার পূর্বরাগ, মাথুর, ভাবসম্মেলন ইত্যাদি নাই। এইগুলির সূত্রপাত হইয়াছে বিদ্যাপতি হইতে। গীতগোবিন্দে রাধা খণ্ডিতা মানিনীরূপে প্রধানতঃ চিত্রিতা হইয়াছেন। ভণিতায় জয়দেব হরি-স্মরণে যাহাদের মনঃ সরস এবং বিলাসকলায় যাহাদের কুতূহল আছে তাহাদের হর্ষবৃদ্ধি ও ভক্তিসঞ্চারের কামনা করিয়াছেন—পদকর্তারা নিজেদের শ্রীমতীর সখীস্থানীয় বলিয়া কল্পনা করিয়া শ্রীমতীকে আশ্বাস, উপদেশ, সমবেদনা ইত্যাদি জানাইয়াছেন কখনও কখনও তিরস্কারও করিয়াছেন। এই প্রথা শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। সেজন্য চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত যে সকল পদে এই সখীস্থানীয়তা আছে—সে সকল পদকে শ্রীচৈতন্যের পরবর্তী কোন চণ্ডীদাসের এবং যেগুলিকে তাহা নাই সেগুলিকে চৈতন্যের পূর্ববর্তী অন্য চণ্ডীদাসের রচনা মনে করা হয়।

জয়দেবের আগে প্রাকৃত ভাষায় পদ রচনার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। প্রাকৃত পিঙ্গলের ছন্দের গ্রন্থে দুচারটির নিদর্শন পাওয়া যায়। জয়দেব যে সকল ছন্দে পদগুলি রচনা করিয়াছেন সে সকল ছন্দ প্রাকৃত ভাষারই ছন্দ। এইগুলির নাম—মরহট্টা, রত্তনরেন্দ্র, ঢোউইআ, দোহা, চচরী ইত্যাদি। প্রাকৃতভাষা ক্রমে কথিত ভাষা হইয়া চলিত না—দেশের বিদ্বৎসংঘও প্রাকৃতভাষায় রচনার বিশেষ আদর করেন

বঙ্গীয় পদকর্তাদের গুরুস্থানীয় বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতি শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার বিবিধ স্তরের এবং বিবিধ অঙ্গের পদ রচনা করিয়াছিলেন। অবশ্য রূপ গোস্বামী ও কবিকর্ণপুর তাঁহাদের রস শাস্ত্রের গ্রন্থে লীলা-বিলাসের এমন বহু নবনব অঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন, যেগুলি বিদ্যাপতির অজ্ঞাত ছিল। তবু বলিতে হয় পদকর্তারা বিশেষতঃ চৈতন্যোত্তর পদকর্তারা প্রায় সকলেই বিদ্যাপতির অনুকারক। বিদ্যাপতির প্রধানশিষ্য গোবিন্দদাস। গোবিন্দদাস নিজেই বলিয়াছেন—

বিদ্যাপতি পদ যুগল সরোরুহ নিন্দিত মকরন্দে।
তছু মঝু মানস মাতল মধুকর পিবইতে করু অনুবন্ধে।
হরিহরি আর কিয়ে মঙ্গল হোয।
রসিক শিরোমণি নাগর নাগরী লীলা স্ফুরব কি মোয়।

সেযুগে মিথিলার সঙ্গে বাংলার বিদ্যাজ্ঞানের আদানপ্রদানের পথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। বিদ্যাপতির পদাবলী শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্বেই বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। বিদ্যাপতি কবিতা রচনার জন্য মৈথিলীর একটা অপভ্রষ্ট রূপ অবহঠ্ঠা নামে একটি ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার পদগুলি এই ভাষাতেই রচিত। এই অবহঠ্ঠাই বাংলায় বাংলাশব্দের প্রচুর মিশ্রণে ব্রজবুলির নাম রূপ ধারণ করে। ইহাই কোন কোন মনীষীর মত। অন্য মতও আছে—কেহ কেহ বলেন—ইহার জন্ম কোথায় তাহা বলা যায় না। আসামের শঙ্করদেবের পদ, উড়িষ্যার রামানন্দ রায়ের পদ, নেপালের কোন কোন সঙ্গীত, প্রায় একই সময়ে ব্রজবুলিতে রচিত হয়। অতএব বঙ্গদেশে ইহার জন্ম না-ও হইতে পারে।

বাংলায় ব্রজবুলির প্রথম পদ যশোরাজখাঁর, তার পর উড়িষ্যার রামানন্দ রায়ের বিখ্যাত পদ "পহিল হি রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল"। শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে বাংলায় ব্রজবুলিতে পদরচনার পদ্ধতি বিশেষরূপে প্রচলিত হয় নাই। শ্রীচৈতন্য-দেবের তিরোধানের অনেক পরে ব্রজবুলির পদরচনার ধুম পড়িয়া যায়। খেতুরীর উৎসবের সময়ে ব্রজবুলির পদ—লীলা-কীর্তনের প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রজবুলিতে কোন গ্রন্থ রচিত হয় নাই, ব্রজবুলি কখনো কথিত ভাষাও ছিল না, ইহা একটা কৃত্রিম ভাষা। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এই ভাষায় পদ রচনার সার্থকতা কি?

১। প্রথম সার্থকতা মনে হয়—এই ভাষা লালিত্য-পূর্ণ, প্রেমগীতিরচনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী—এবং এমন উদার, যে ইহার মধ্যে যে কোন ভাষার শব্দ সহজে সামঞ্জস্য লাভ করে।

২। দ্বিতীয়তঃ ব্রজবুলির সঙ্গে কবিরা প্রাকৃত ভাষার বিবিধ সুললিত ছন্দ পাইয়া গিয়াছেন। এই ছন্দগুলি দীর্ঘহ্রস্ব স্বরের সমাবেশে হিল্লোলিত। সেকালেই বাংলা ভাষায় দীর্ঘ স্বর তাহার গুরুত্ব ও দীর্ঘতা হারাইয়াছিল—বাংলায় যুক্তাক্ষরের পূর্বস্বর দীর্ঘ উচ্চারিত হয়—অন্যত্র দীর্ঘস্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ করিতে গেলে অস্বাভাবিক হইয়া উঠে। কিন্তু ব্রজবুলিতে তাহা হইত না। ছন্দোহিল্লোল পাওয়ার সুযোগের জন্য কবিরা ব্রজবুলিকে আশ্রয় করিয়াছিলেন।

৩। শ্রীচৈতন্যদেবের সময় হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সমগ্র আর্যাবর্তে প্রচারিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ বৃন্দাবন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের কেন্দ্রস্থল হওয়ায় আর্যাবর্তে বঙ্গীয় পদাবলী-সাহিত্যের প্রচারের প্রয়োজন হইয়াছিল। আর্যাবর্তের বহু ভক্ত বৈষ্ণব এই সাহিত্য উপভোগের জন্য উন্মুখ হইয়াছিলেন। সেজন্য কবিরা এমন ভাষার আশ্রয় লইলেন যাহা আর্যাবর্তের সকল লোকেরই অল্প আয়াসেই বোধগম্য হইতে পারে।

৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরস সাধনার সহায়ক একটি স্বতন্ত্র নিজস্ব ভাষা প্রচলিত থাকে সম্ভবতঃ কবিদের ইহা অভিপ্রেত ছিল।—এই স্বাতন্ত্র্য-গৌরব বঙ্গীয় বৈষ্ণবসমাজেরও উদ্দিষ্ট হইতে পারে।

৫। পূর্বেই বলিয়াছি প্রেমলীলা বর্ণনার পক্ষে এই ভাষা সম্পূর্ণ উপযোগী। বিশেষতঃ এই ভাষায় বিদ্যাপতির প্রেমকবিতা রচনার অসাধারণ সাফল্য কবিগণের মনে এ

ধারণা বদ্ধমূল করিয়াছিল। পরে এই ভাষায় অন্য রসের কবিতারচনার চেষ্টা হইয়াছে—কিন্তু সে কবিতা সমাদর লাভ করে নাই, তুলসীপত্র দিয়া যেন শক্তিপূজা বলিয়া মনে হইয়াছে। যাহাই হউক এই ব্রজবুলির জন্য পদকর্তারা বিদ্যাপতির কাছে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ঋণী।

চৈতন্যোত্তর পদকর্তারা সব চেয়ে বেশি অনুপ্রাণনা পাইয়াছিলেন—রূপ, সনাতন, জীব গোস্বামী, কবিকর্ণপুর, রায় রামানন্দ ইত্যাদি বৈষ্ণবাচার্যগণের রচনা হইতে। ইঁহারা সংস্কৃতে কাব্য, নাট্য ও পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের লক্ষ্য ছিল সমগ্র ভারতবর্ষ। কেবল লীলাতত্ত্বের জন্য নয়, এই সকল রচনার সাহিত্যিক ঐশ্বর্যের জন্যও ইঁহাদের কাছে পদকর্তারা বিশেষভাবে ঋণী। শ্রীচৈতন্যের সময়ে বৃন্দাবন হইতে বৈষ্ণবাচার্যগণের রচনাসমূহ সম্ভবতঃ বঙ্গদেশে আসিয়া পৌঁছে নাই, অথবা সকল গ্রন্থ তখনও রচিত হয় নাই। সেজন্য এইগুলির প্রভাব সমসাময়িক পদকর্তাদের রচনায় বিশেষরূপ দৃষ্ট হয় না। শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পঞ্চাশ বৎসর পরে এইগুলি বাংলার বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত হয়। তাহার ফলে ঐ সকল বৈষ্ণব-গুরুদের রচনার ভাবসম্পুট চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলীর পুষ্টি সাধন করিয়াছে। বহু পদ তাঁহাদের রচিত শ্লোকের মর্মানুবাদ অথবা বিস্তৃত ব্যাখ্যান মাত্র।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন শ্রীচৈতন্যের সময়ে এবং তৎপরবর্তী কালে অপরিচিত ছিল না। এই পুস্তকের দান-খণ্ড, নৌকা-খণ্ড ইত্যাদির পদগুলি অমার্জিত ও রসাভাসদুষ্ট হইলেও পদকর্তাদের বিষয়বস্তু ও রচনাভঙ্গী যোগাইয়াছিল। বিশেষতঃ কৃষ্ণকীর্তনের রাধা-বিরহেই বঙ্গদেশে বঙ্গভাষায় পদরচনার সূত্রপাত হইয়াছে বলিতে পারা যায়। কৃষ্ণ-কীর্তনের শ্রীকৃষ্ণ আর পদাবলীর শ্রীকৃষ্ণ এক নহেন, কৃষ্ণ-কীর্তনের গোবিন্দ গোঁয়ারগোবিন্দ, পদাবলীর শ্রীকৃষ্ণ বিদগ্ধমাধব—রসিক চূড়ামণি। তবে রাধার সম্বন্ধে কথা স্বতন্ত্র। কৃষ্ণকীর্তনের রাধাই যেন রূপান্তরিত হইয়া পদাবলীর রাধারূপ ধরিয়াছে। কৃষ্ণ-কীর্তনের Realistic রাধা, পদাবলীতে Idealised হইয়াছে। বিরহের অনলে রাধার বাস্তবতা যেন গলিয়া 'কালিনী নইজলে' মিশিয়া গিয়াছে। বৃন্দাবনখণ্ড হইতেই রাধার রূপান্তরের সূত্রপাত হইয়াছে—কৃষ্ণকীর্তনের বিরহার্তা রাধার মুখের বচনগুলি, ব্রজবুলিতে না হউক খাঁটি বাংলা ভাষার পদগুলিতে বিকীর্ণ হইয়া আছে। কৃষ্ণকীর্তনের দূতী জরতী বড়ায়ি (বড়+আয়ী); কৃষ্ণকীর্তনের বাস্তব পটভূমিকায় বড়ায়ি অসমঞ্জস নয়। পদাবলীর সৌন্দর্যঘন রসলোকের পটভূমিকায় বড়ায়ি অচল হইয়াছে—তাহার স্থলে আসিয়াছে বিশাখা, ললিতা, বৃন্দা ইত্যাদি তরুণী সখীগণ।

বিদ্যাপতি কবি ছিলেন, সাধক ছিলেন কিনা সন্দেহ। তিনি কেবল রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার গান লেখেন নাই, তিনি অনেক বিষয়ে কাব্য ও কবিতা লিখিয়াছিলেন। নরনারীর প্রাকৃত প্রেমের গানও তিনি লিখিয়াছিলেন অনেক, সেগুলিতে রাধাকৃষ্ণের নাম নাই, এমন কি বৃন্দাবনের পটভূমিকাও নাই। সেগুলিকেও আধুনিক সংগ্রাহকগণ বৈষ্ণব পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। বাংলার পদকর্তারা সকলেই সাধক কবি—তাঁহারা জানিতেন —দুর্লভ কবিশক্তিকে শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কাহাকেও নিবেদন, বা ব্রজলীলা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে বিনিয়োগ করা স্বধর্ম-চ্যুতি। তাই তাঁহাদের কানু বিনা গীত নাই।

গানমধ্যে কোন গান জীবের নিজধর্ম্ম ?
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যে গীতের মর্ম্ম।

ইহাই ছিল তাঁহাদের বিশ্বাস। তাই তাঁহারা তাঁহাদের দুর্লভ কবিশক্তিকে বিষয়ান্তরে বিনিয়োগ করেন নাই। ইহাতে বঙ্গসাহিত্যের কাব্যের বিষয়বৈচিত্র্যের দিক হইতে হয়ত ক্ষতি হইয়াছে—কিন্তু পদাবলীসাহিত্যের অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছে।

গোবিন্দদাস ছিলেন একজন মহাকবি। তিনি প্রথম জীবনে ছিলেন শাক্ত, তাই তিনি হরগৌরীর স্তবও লিখিয়াছিলেন, তিনি যদি বৈষ্ণব না হইতেন তাহা হইলে হয়ত নানা বিষয়ের কবিতাই আমরা তাঁহার লেখনী

সর্পশিশু

আশাপূর্ণা দেবী

জন্ম ইতিহাসটা অজ্ঞাত।

সদ্যোজাত একটা শিশু ডোবার ধারে না বাঁশবাগানের কানাচে পড়িয়া ক্ষীণকণ্ঠে পৃথিবীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতেছিল; হয়তো—এক সময় নিস্তব্ধ হইয়া যাইত সেই নিষ্ফল প্রতিবাদের ক্ষীণস্বর, গ্রামের বিরিঞ্চি পাগলা তাকে কুড়াইয়া আনিয়া একেবারে বামুনবাড়ীর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

গারদে দিবার মত উন্মাদ পাগল নয় বিরিঞ্চি, আগে মজুরী খাটিয়া খাইত, যা' কিছু গোলমাল ছিল কেবল পয়সার হিসাব লইয়া। জগতের লোক যে শুধু ঠকাইবার জন্যই ব্যগ্র হইয়া আছে এই রহস্যটা যেন বড় বেশী ফাঁস হইয়া গিয়াছিল বিরিঞ্চির কাছে। তাই একবাড়ীর মজুরির পয়সা লইয়া গ্রামসুদ্ধ সকলের কাছে হিসাব বুঝিতে যাইত।

এখন আর সে বালাই নাই। পাঁচবাড়ী চাহিয়া চিন্তিয়া—পেটের ব্যবস্থাটা বজায় রাখে, আর একমুখ দাড়ি গোঁফ লইয়া কোথা হইতে সংগ্রহ করা একটা পুরণো চটের থলি হাতে সারাটা দিন ছেঁড়া ন্যাকড়া, পচা কাগজ, ভাঙ্গা কাঁচ, আর টিনের টুকরা কুড়াইয়া বেড়ায়। পৃথিবীর কোনো জিনিষ নাকি অপচয় হইতে দিতে রাজী নয় সে।

আঁস্তাকুড় মানেনা, ময়লার বিচার করেনা, অব্যাহত গতিতে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। তা' নয় তো ভদ্রলোকে বা সুস্থ কোনো লোকে কোন্ কাজে সারাগ্রামের 'ওঁচলা' জঞ্জালফেলা এই অখদ্দে জায়গাটায় উঁকি দিতে আসিত?

মেয়েটাকে যে ফেলিয়া গিয়াছিল—সে বোধকরি মনুষ্যত্বের শেষ অবশিষ্টটুকুর প্রমাণ দিতে নিতান্ত নিরা-

বরণ ভাবে না ফেলিয়া দিয়া অনেকগুলি কাপড়ে চোপড়ে মুড়িয়া যত্নের ভান করিয়া শোয়াইয়া রাখিয়া গিয়াছিল, ছেঁড়া ন্যাকড়ার লোভে আকৃষ্ট বিরিঞ্চি ছুটিয়া আসিয়া একেবারে তাজ্জব বনিয়া গেল।

পরবর্তী কর্তব্য স্থির করিতে অবশ্য এক সেকেণ্ডও সময় লাগে নাই বিরিঞ্চির, লাগিবেই বা কেন? আস্ত একটা এতবড় বস্তুকে তো অপচয় হইতে দিতে পারে না সে? পাগল বলিয়াই হয়তো আদর্শচ্যুত হয় না, অথবা আদর্শচ্যুত হইতে পারেনা বলিয়াই পাগল।

কিন্তু বামুনগিন্নী তো পাগল নয়?

বিরিঞ্চির মুখে ভাতের বদলে দুধের আবদার শুনিয়া 'মার মার' করিয়া উঠিলেন—দুগ্‌গা দুগ্‌গা সকাল বেলা একি পাপ! বেরো হতচ্ছাড়া আমার বাড়ী থেকে। কোন্ চুলো থেকে পেলি ওকে? কি আপদ!

বিরিঞ্চি মুখের ভাব যথাসাধ্য করুণ করিবার চেষ্টা করিয়া বলে—ডোবার ধারে পড়ে কাঁদতেছিল বড়োমা। তা—একটুকুন দুধ তো এরে দিতে হয়, কেষ্টর জীবটা অনাহারে হত্যে হ'তে পারেনা তো?

—মরে যাইরে—ওই কেষ্টর জীবটাকে দুধ খাইয়ে জীইয়ে তুলে কোন সগ্‌গে বাতি দেবে রে আমার? বলি গাঁয়ে কি আর বাড়ী খুঁজে পেলিনে মুখপোড়া, তাই আমার হাড় জ্বালাতে এলি?

—তোমার ঘরে যে দুধের সাঁতার পাথার বড়োমা, গোয়াল ভর্তি গরু। কেঁড়ে ধোয়া জল এক ছিটে দিলেও ছুঁড়ির জীবনটা রক্ষে হয়।

বামুনগিন্নী ঈষৎ নরম হইয়া বলেন—তা' যেন রক্ষে হ'ল, কিন্তু রক্ষে হয়ে কি হবে শুনি? কার উপকারে লাগবে?

বিরিঞ্চি দার্শনিক উদারতায় গম্ভীরভাবে বলে—উপগারের কথা ছেড়ে দাও বাপু, বিরিঞ্চি পাগলা কার উপগারে লাগছে? মুখের গোড়ায় ভাত পাথরটা দিচ্ছ তো ধরে নিত্যি, না কি দিচ্ছনা? ন্যাও এখন তক্কাতক্কি রেখে একখুরি দুধ বের করো দিকিন।

বামুনগিন্নী হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া বলেন—দুধ যেন দিলাম, খাওয়াতে পারবি?

বিরিঞ্চি একগাল হাসিয়া বলে—মদ্দমানুষ তাই কি পারে? তোমার তো এখনো 'ছ্যান' হয়নি—ঘাটে যাবার আগে—

বামুনগিন্নী ক্ষণপূর্বের কৌতুক বিস্মৃত হইয়া এবার যথার্থই প্রবল রোষে চীৎকার করিয়া ওঠেন—বেরো লক্ষ্মী-ছাড়া, বোরো আমার উঠোন থেকে। ওই আঁস্তাকুড়ের জঞ্জালকে কোলে নিয়ে দুধ খাওয়াতে বসবো আমি?

কিন্তু গালাগালি দিয়া ভূত ভাগানো বরং সম্ভব কিন্তু পাগল ভাগানো সহজ নয়। বিরিঞ্চি ন্যাকড়া-কানি-সমেত সেই আঁস্তাকুড়ের জঞ্জালটাকে প্রায় বামুনগিন্নীর পায়ের কাছে নামাইয়া দিয়া বেশ একটু বাহাদুরীর হাসি হাসিয়া বলে—বেশ, এই রইল হেথায় পড়ে, ন্যাও এখন কি করবে করো। বিচেরে হয় এক ফোঁটা দুধ দিয়ে বাঁচাবে—না হয় গলাটা টিপে শেষ করে দেবে। ব্যস এই সোজা কথা।

বামুনগিন্নী বিপদ গণিয়া ডাক দেন—বৌমা, বৌমা, এই দেখ এসে তোমার আদরের খোকার কাণ্ড। নিত্যি ভাত দিয়ে দিয়ে আস্কারা বাড়িয়ে দিয়েছ, এখন পাগলের উপদ্রব পোহাও।

কথাটা মিথ্যা নয়, বৌমার প্রশ্রয়েই মাসের মধ্যে পনেরদিনের ভাত বিরিঞ্চির এই একটা বাড়ীতেই জোটে। বামুনগিন্নী ঝাপঝাল করেন বটে, তবে অতবড় বৌয়ের ইচ্ছাটাকে একেবারে ফেল্‌না করিতেও পারেন না।... কিন্তু ফেলাছড়ার সংসারে দুটি ভাত দেওয়া এক, আর এহেন অভিনব উপদ্রব সহ্য করা আলাদা।

ডাক শুনিয়া বৌমা আসিয়া দাঁড়ায়। অবশ্য অবাক হইল না—দোতলার জানালা হইতে দেখিতেছিল সবই, শুধু শাশুড়ীর ভয়ে এতক্ষণ নীচে নামে নাই।

নীচে নামিয়া আসিয়া ভালোমানুষের মতো অবাক ভঙ্গীতে বলে—এ আবার কি?

—ওই দেখ গেরো! নাও এখন এই পাগলকে সামলাও। এ কি পাপ বাড়ীর ভেতর এনে ঢোকানো!

—বড়োমার এক কথা! বলে 'শিশু নারায়ণ', ওইটুকু অবোধ শিশুর আবার পাপপুণ্যি কি?...তোমার শাশুড়ীর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে ছোট মা, যাক গে—ঝট্ করে দুধ এক ফোঁটা খাইয়ে দাও দিকিন ওটাকে। বলে বলে মুখ ব্যথা হয়ে গেল বাবা! বেরালে কুকুরে কত সামিগ্রী খাচ্ছে আর এতো মনিষ্যির সন্তান।

নীহার একবার শঙ্কিতভাবে শাশুড়ীর মুখপানে চাহিয়া বিরক্তির ভাণে বলে—পাগল বলে কি তুই একেবারে পাগল বিরিঞ্চি? আমি কখনো ওকে ছুঁতে পারি? স্নান করে নারায়ণের ভোগ রাঁধতে যাচ্ছি যে—তুই বরং পলতে করে খাইয়ে দে।

বিরিঞ্চি ঈষৎ শান্তস্বরে বলে—তবে তাই আনো তোমার পলতে-মলতে, আর কলকৌশলটাও অমনি শিখিয়ে দিয়ে যাও। নারায়ণ তো তোমার গলা শুকিয়ে মরে যাচ্ছেনা—ভোগের ভাত বরং দু'দণ্ড পরে রাঁধলে চলবে।

গোড়ার ইতিহাসটা এই।

অতঃপর কেমন করিয়া যে সেই 'মনিষ্যির সন্তানটা' মানুষ হইয়া উঠিতে লাগিল সেই এক রহস্য। বোধকরি—পথের কুকুর বিড়ালগুলা যেমন বাঁচিয়া থাকে, যথানিয়মে বাড়িয়াও ওঠে—তেমনি ভাবে বাড়িতে লাগিল 'ফেলি'।

তা' 'ফেলি' ছাড়া আর কি ভালো নাম জুটিবে তার—জন্মদাত্রী মা যাহাকে জন্মমাত্র ফেলিয়া গিয়াছে ?.. বামুন-গিন্নীই এই উপযুক্ত নামটা দিয়াছেন তাকে।

নীহার নাকি কবে যেন বলিয়াছিল—'করুণা' বলিয়া ডাকিলে হয় মেয়েটাকে, পৃথিবীর করুণা কুড়াইয়াই তো টিঁকিয়া থাকিতে হইবে বেচারাকে—হাসির খোরাক হিসাবে এখনো মাঝে মাঝে ওঠে কথাটা ফেলির বিষয়ে বিরক্তিকর কোনো কথা উঠিলেই বামুনগিন্নী ব্যঙ্গহাস্যে বলেন—বেশী বলবোনা বাবা, উটী আবার বৌমার পুষ্যি কন্যে কিনা। কি যেন নাম রেখেছিলে বৌমা—ললিতলবঙ্গলতা নাকি ?....

প্রতিবেশিনীরা এমন হাসিয়া ওঠেন যে, নীহার মুখ লুকাইবার পথ পায় না।

বছর পাঁচেক বয়স পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে বিরিঞ্চি ছিল হয়ত নিতান্ত মেয়েটার পরমায়ুর জোর ছিল বলিয়াই পাগলার এতো ঝোঁক চাপিয়াছিল তার উপর। অনভ্যস্ত হাতে পলিতা ধরিয়া আর শামুকের খোলার ঝিনুকে দুধ খাওয়ানো হইতে সুরু করিয়া নিজের পাতের মাখাভাতের ভাগ দিয়া দিয়া পাঁচবছরেরটী করিয়া তুলিয়াছিল বিরিঞ্চি, কিন্তু আর টিকিল না।

গ্রামের মধ্যে নিজের জায়গায় ফেলিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়া বিরিঞ্চি একদিন চৈত্রের ঝড়ে গাছ চাপা পড়িয়া মারা গেল।

বিরিঞ্চির মতই ফেলিও হইল বারোয়ারী।

বিরিঞ্চির মত সারাদিন যথেচ্ছ ঘুরিয়া বেড়ায় আর হঠাৎ পেটের ভিতরটা জ্বালা করিয়া উঠিলে যে কোনো একটা বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িয়া উঠানের ধারে বসিয়া কাঁদিতে থাকে।

ফেলির কান্নার কারণটা কাহারও অজানা নয়, তবু বিনাবাক্যব্যয়ে দু'মুঠা ভাত ফেলিয়া দিবার উদারতা বড় কাহারও দেখিতে পাওয়া যায় না—আ মরণ, এ ছুঁড়ি আবার মরতে এখানে এলো কেন ? এই লক্ষীছাড়ি, শুধু শুধু কেঁদে মরছিস যে ? ইত্যাদি সভ্য প্রশ্নের উত্তরে ফেলি যখন কান্নার মাত্রা আরো বাড়াইয়া বলে—খিদে পেয়েছে—পেটের মধ্যে ব্যথা করতেছে—' তখন নিতান্ত অবহেলায় পাতকুড়ানো এঁটোকাঁটা দুই মুঠা ভাত দিয়া দয়াবতীরা দয়ার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন।

একমাত্র নীহারের কাছেই এর কিছুটা ব্যতিক্রম হয় বটে—কিন্তু সেটা বামুনগিন্নীর অনুপস্থিতির মাহেন্দ্রযোগ না ঘটিলে নয়।

ভাত খাইয়া পাতা ফেলিতে হয়, গোবর ঘসিয়া ঘসিয়া এঁটো পাড়িতে হয়, বিরিঞ্চি মরিয়া এইসব অসুবিধাগুলা বাড়িয়াছে ফেলির।

বিরিঞ্চির জন্য মাঝে মাঝে মন কেমন করে।

অবশ্য তার অনেকটাই স্বার্থপ্রণোদিত। চড়া রোদ উঠিলে যে বিরিঞ্চি মাটিতে পা ফেলিতে দিত না ফেলিকে, কাঁধে করিয়া ঘুরিত, ঝড়বৃষ্টির সময় আশ্রয় খুঁজিয়া আগলাইয়া রাখিত, ক্ষুধার সময় ভাতের আবেদনের ভারটা লইত, এসব একটু আধটু আজকাল বুঝিতে পারে সে। কষ্ট হইলেই তাই বিরিঞ্চিকে মনে পড়ে তার।

তবে তার বেশী নয়।

ভালোবাসা উদ্রেক করিবার মতো মানুষ বিরিঞ্চি নয়।

হ্যাঁ ভালোবাসিতে হয় তো বামুনকর্তার ছেলে ছোট বাবুকে। যেমন টকটকে সুন্দর রং, তেমনি পোষাকের পারিপাট্য, যেন গল্পের রাজামশাই। নীহারের মেয়ে লীলার উপর অদ্ভুত একটা ঈর্ষা হয়, লীলার মতো যদি 'বাবা' বলিয়া ডাকিতে পাইত ছোটবাবুকে, তবে বোধ করি ধন্য হইয়া যাইত ফেলি।

কিন্তু ডাকা সহজ নয়।

একদিন ইচ্ছাকৃত অসাবধানে ডাকিয়া ফেলার অপরাধে বামুনগিন্নী সুধু গর্দ্দান লইতে বাকী রাখিয়াছিলেন তার। একেই তো নীহারের আশ্রয়ে পাড়ার সকলের চাইতে তার

শাশুড়ী বিজ্ঞ আর বহুদর্শী লোক, তাই বিজ্ঞ পরামর্শই দেন—"ছেলেমানুষ" নামে আর অরুচি ধরিও না বৌমা, 'সোমত্ত মাগী'। বোঝোনা তুমি, এ বয়সে হাত পায়ের ছুটি হলেই কুচিন্তা আসবে মনে।

কুচিন্তা আসিবার ভয়ে হাত পায়ের আর বিশ্রাম দিতে দেন না পরহিতব্রতী বামনগিন্নী। পরহিতব্রতী বৈ কি, নয় তো তাঁর নিজের নাতনী লীলা চব্বিশঘণ্টা হাত পা কোলে করিয়া নাটক নভেল পড়িতেছে—তাকাইয়া দেখিবার ফুরসুৎ হয় না তাঁর, অথচ ফেলির জন্য উৎকণ্ঠার সীমা নাই। বিধাতার বিচারটাও যে ন্যায্য নয়, তা' নয়তো এতো যত্ন করিয়াও বিয়ের যুগ্যি মেয়ে লীলার হাড়ের উপর মাস গজায় না, আর সারা সংসারের খাটুনি খাটিয়াও দুইবেলা দু' কাঁসির ভাতের জোরে ফেলি দিন দিন সত্যই সোমত্ত মাগী হইয়া উঠিতেছে।

দেখিলে গা জ্বলিয়া যায় কি আর সাধে ?

গায়ে মাস না গজাক, 'পুয়ে পাওয়া' হোক, বয়েসের মেয়ের বিয়েটা তো দেওয়া চাই। তাছাড়া দীর্ঘদিন যাবৎ এই একটা উপলক্ষ্যে আশা মিটাইয়া উৎসব করিবার ইচ্ছা পোষণ করিয়া আসিতেছেন মুখুয্যে দম্পতি।

লীলার বিয়ে।

কতো সাধ আহ্লাদের ব্যাপার। কতো কাপড়, কতো অলঙ্কার কতো ফুল কতো আলো ভোজের আয়োজনে কী রাজসূয় কাণ্ড। দেখিতে দেখিতে দিশেহারা হইয়া যায় ফেলি।

ফেলি যদি লীলা হইত।

হয়তো এমনি আগুনরঙা শাড়ী আর কনেচন্দনে সাজাইয়া আলপনা-আঁকা পীড়িতে বসাইয়া রাখা হইত ফেলিকে। গোড়ে মালা পরা বর আসিত ফেলির জন্য। ফেলিকে ঘিরিয়া সমারোহের আর শেষ থাকিত না।

বিবাহ উপলক্ষ্যে একখানা নূতন শাড়ী পাইয়াছে ফেলি। কোরা লালপাড় কণ্ট্রোলের শাড়ী। তা হোক তবু নূতন তো বটে, জীবনের প্রথম নববস্ত্র।

তা' সে শাড়ীও এখনো পরিবার অবসর হয় নাই তার। ফেলি নতুন কাপড় পরিয়া বাহার দিয়া বেড়াইলে রাজ্যের এঁটো পাতা ফেলিবে কে ?

অনেক রাত্রে সকল কাজের জের মিটাইয়া কোরা শাড়ীখানা জড়াইয়া ফেলি ধীরে ধীরে বাসরের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়...অতি পরিশ্রমের ফলে পিঠ যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে, দুই পা বিশ মণ ভারী....ঘুমে চোখ জড়াইয়া আসিতেছে। তবু এই স্বর্গলোকের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইবার লোভ সংবরণ করিতে পারে না ফেলি।

আর ঘরের ভিতর দৃষ্টি ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গেই মন্ত্রবলে সমস্ত শ্রান্তি উপিয়া যায়। গানের আর হাসির হুল্লোড় উঠিয়াছে...বর নাকি বলিয়াছে ঠানদির দল বাজনা বাজাইলে সে গাহিতে রাজী আছে। সদাবিরক্ত বামুনগিন্নী একগাল হাসি লইয়া কোমরে গোট আর পায়ে পাঁয়জোর পরিয়া নাত জামাইয়ের সামনে আসিয়া বসিয়াছেন....বাজনা কেন—ঠানদি'রা কি নাচিতেই পিছ পা ? এমন নাচ দেখাইয়া দিবেন—তোমাদের উদয়শঙ্কর কোথায় লাগে !

আত্মবিস্মৃত ফেলি যে সতরঞ্চের উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে একথা কেউ ঘুণাক্ষরেও ভাবে নাই।....

হঠাৎ অনেকগুলা কণ্ঠের হাসি থামিয়া গিয়া উঠিল তীব্র ঝড়।

—'এটা কে ? ফেলি না ?'...'আ মরণ এ আপদ আবার এখানে কেন ?'....'অযাত্রা কোথাকার...বেরো বেরো এখান থেকে'.... 'ওমা সব ছিষ্টি ছুঁয়ে জয় জয়কার করলে গো'। 'যত রাজ্যের নোংরা জঞ্জাল ঘেঁটে এলো—না চান না কিছু'.... 'আহা চান করে এলেই ফেলি একেবারে গোঁসাইকন্যে হয়ে আদরে বসবার যুগ্যি হবে যে।'.. 'আসপদ্দা দেখো একবার, দোরের বাইরে থেকে উঁকি দে—তা' নয় একেবারে বাসরের বিছানা ছোঁওয়া !'...

ঝড়ের তাড়ায় ততক্ষণে চৌকাঠের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে ফেলি।

—হেথায় বসে শুধু গান শুনবো ঠাকুমা—করুণ মিনতি করে ফেলি।

কিন্তু বামুনগিন্নী আদিখ্যেতা দেওয়ার মধ্যে নাই। ঝঙ্কার দিয়া ওঠেন—আর কি। তুমি গান শোনো আর আমি যাই এঁটো পাত ফেলতে! বলি—কাল সকালের জন্যে বাসন-কোসন চারটি মেজে রাখলেও তো হ'ত? সকালে তো একটা কাজ নয়—পঞ্চাশটা কাজ পড়বে। চায়ের বাসন ধুয়ে রেখেছিস্?

ফেলিকে আর দেখা যায় না।

কিন্তু সকালের বাসন আবার মাজিল কখন সে? যেমন তেমনি পড়িয়া আছে না?....পঞ্চাশটা কাজের একটা কাজেও যে পাওয়া গেল না তাকে!

নীচে, উপরে, গোয়ালে আর ঢেঁকিঘরে···সারা পাড়ায় ফেলি নাই! যাক্ ফেলি হারাইয়া গেছে আপদ গেছে, কিন্তু লীলার নূতন ফ্যাসানের কঙ্কণজোড়া আর রূপালি [illegible]দার ঢাকাইখানা বেমালুম হারাইয়া যাইবে?

যাইবে বই কি। দুধকলা দিয়া কালসাপ পুষিলে তার ফলভোগ করিতে হইবে না?

অধর্মের চারা বাড়িয়া বিষ ফল দিবে না তো কি অমৃত ফল দিবে? ··

ফেলি যে সুধু চোরই নয় চরিত্রহীনাও—সে সম্বন্ধে আর মতদ্বৈধ থাকে না।···চালচলন দেখিলে গা জ্বলিয়া যাইত লোকের। কেমন যেন 'ঢলানি' ভাব। গোয়ালের পিছনে সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রায়ই কার সঙ্গে যেন চুপি চুপি কথা কহিতে দেখা যাইত ফেলিকে····অনেকেই নাকি দেখিয়াছে····এই তো কাল রাত্রেও বরযাত্রীদের মধ্যে একটা ইয়ার গোছের ছোঁড়া ফেলিকে মিঠা পানের খিলি ছুঁড়িয়া মারিয়াছে···আর ফেলি হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতেছিল তার সামনে। এমনি অনেক প্রমাণ।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, অবিশ্বাস করিবার কিছু নাই।

অবিশ্বাসের আছেই বা কি? জাত-সাপের বাচ্ছা তো বটে?

হয়তো সত্যই তাই। এতগুলা পাকাপোক্ত সংসারী মানুষের অনুমানে ভুল নাই।

জন্মলগ্নের নিষ্ঠুরতার শোধ লইতে—একদিন হয়তো সর্পিণীর মতোই ক্রুর হইয়া উঠিবে ফেলি···বিষের থলি পুঁজি করিয়া—গৃহস্থের আনাচে কানাচে ঘুরিয়া সভ্যতা আর সৌন্দর্য্য আর ভদ্রজীবনের গায়ে ছোবল হানিয়া বেড়াইবে।

এশিয়ার সংহতি ও সম্মেলন

শ্রীনির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য

সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন সভ্যতার ধারা মহাকবি রবীন্দ্রনাথের জীবনে এক মহামিলনক্ষেত্র লাভ করেছিল। তাই রবীন্দ্রনাথের লেখনীমুখে বিশ্বসভ্যতার পরমবাণী চরম মাধুর্যে উৎসারিত হয়েছে। এশিয়ার প্রায় সমস্ত দেশ পরিব্রজনের পর রবীন্দ্রনাথ এশিয়ার মূলগত একত্বের ধারা ও অন্তর্নিহিত বাণীর সন্ধান পেয়েছিলেন। নানা বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে এশিয়ার সাংস্কৃতিক একত্বের সুর রবীন্দ্রনাথের মনে এক অপরূপ অনুরণন সৃষ্টি করেছিল। বিশ্বকবি তাঁর অনন্য ভাষায় নিজ অনুভূতিকে রূপায়িত করে গেছেন জাপানযাত্রীর পত্রে ও চীন, জাভা প্রভৃতি দেশ থেকে লিখিত পত্রাবলীর পৃষ্ঠায়।

যুদ্ধবিগ্রহ, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক বিপ্লব অতিক্রম করে এশিয়াখণ্ডে যুগে যুগে যে বাণী উচ্চারিত হয়েছে, যে বাণীর প্রভাবে কোটি কোটি নরনারীর জীবন সুখে দুঃখে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, তা হচ্ছে ধর্মের বাণী। এশিয়া হিন্দু, বৌদ্ধ, কনফিউসিয়ান, খৃষ্টীয় ও ইসলাম ধর্মের জন্মস্থান। ধর্মই হ'চ্ছে এশিয়ার সভ্যতার প্রাণবস্তু। ধর্মের ভিতর দিয়েই এশিয়ার অন্তরের নিগূঢ় সত্যানুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বসভ্যতার ভাণ্ডারে এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ দান—আধ্যাত্মিকতা। যান্ত্রিক বিপ্লব, ধনিকতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদী শাসননীতি এশিয়ার জনগণকে নিষ্পেষিত করেছে; দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর ধ্বংসলীলা, অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হয়েছে; পতন ও অভ্যুদয়ের বন্ধুর পন্থা অতিক্রম করে এশিয়াবাসী আজ ঘটনাবহুল বর্তমানের সম্মুখীন। তথাপি এশিয়াবাসীর দৈনন্দিন জীবনে ধর্মের প্রেরণা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। আদিকাল থেকে সাহিত্য, স্থাপত্য, চারুকলা ও জীবনযাত্রার প্রণালীতে এশিয়ার আধ্যাত্মিক মর্মকথা প্রাচীনকাল থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত, ইউরোপ ধর্মকে মোটামুটিভাবে রাষ্ট্রিক ও ব্যবহারিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে সক্ষম হয়েছে। কেবল মধ্যযুগেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছিল। তাই বোধহয় ইউরোপের মধ্যযুগ ইউরোপীয় ইতিহাসে অন্ধকারের যুগ বলে পরিচিত। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে, ইউরোপের রাষ্ট্র সাংসারিক চিন্তাকে ধর্ম ব্যাহত করতে পারেনি, যেমন পেরেছে এশিয়ার জীবনধারাকে। তাই ঐহিক ক্ষেত্রে এশিয়া পুনঃ পুনঃ ইউরোপের হস্তে ক্ষুণ্ণ ও পর্যুদস্ত হয়েছে।

শুধু যে ধর্মের দিক দিয়ে ইউরোপ ও এশিয়ার সভ্যতার মধ্যে একটা পার্থক্য লক্ষিত হয়েছে তা নয়, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভিতর একটা বিভেদ দেখা যায়। ইউরোপে মানুষের জীবন রাষ্ট্রকেন্দ্রিক, এশিয়ার জীবনধারা সমাজকেন্দ্রিক। সামাজিক অনুশাসন এশিয়াতে প্রাধান্য লাভ করেছে। সমাজপতি ধর্মনেতা ও পুরোহিত সম্প্রদায় এশিয়ার ব্যক্তিগত জীবনের উপর অপ্রতিহত ক্ষমতা পরিচালন করেছেন। কিন্তু ইউরোপের রাষ্ট্র সামাজিক অনুশাসন খর্ব ক'রে জনগণের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হ'য়েছে। তাই ইউরোপে রাষ্ট্র জনগণকে সমাজের শাসন থেকে মুক্ত করে ব্যক্তি-স্বাধীনতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মন্ত্রে দীক্ষিত ইউরোপ স্ত্রী-স্বাধীনতাও স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু এশিয়াতে নারী-প্রগতির ইতিহাস প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে আরম্ভ হয়েছে বলা যেতে পারে। ইউরোপের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এশিয়ার সমাজধর্মী গোষ্ঠী-গঠনের প্রতিকূল। এশিয়ার বিশেষত্ব প্রকাশ হয়েছে

শ্রেণীর মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে কিনা সন্দেহ। রামমোহন, কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দ সর্বপ্রথম এশিয়ার মর্মবাণী উদাত্তকণ্ঠে ইউরোপ ও আমেরিকায় ঘোষণা করে বিশ্বসভ্যতার ক্ষেত্রে প্রাচ্যের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। প্রাচ্য দর্শন ও সাহিত্য, আধ্যাত্মিকতা ও মানবতার বাণী প্রতীচ্য সমাদরে গ্রহণ করে। জাতীয় সংস্কৃতিতে আত্মপ্রত্যয়শীল, প্রবুদ্ধ প্রাচীতে তখন পশ্চিমের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ক্ষুদ্র জাপানের হস্তে রাশিয়ার ন্যায় একটি বিরাট ইউরোপীয় শক্তির পরাজয় এশিয়ার মুক্তি আন্দোলনের একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। স্বাধিকারপ্রমত্ত প্রাচ্যের দেশে দেশে এই যুগান্তকারী ঘটনার যে চেতনার সঞ্চার হয়। তারই ফলে সম্ভব। স্বাধীনতার আন্দোলন অগ্রগতি লাভ করে এই মুক্তি আন্দোলনে যারা অগ্রণী হয়েছেন তাদের মধ্যে চীনের সুন্ ইয়াট সেন, মিশরের জগলুল পাশা, তুর্কীর কামাল আতাতুর্ক ও ভারতবর্ষের মহাত্মা গান্ধী, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহেরুর নাম এশিয়ার স্বাধীনতার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলি শিক্ষা, সংস্কৃতি, বাণিজ্য ও রক্তের ভিতর দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল। কিন্তু এশিয়াক্ষেত্রে বিজয়ী ইউরোপের আবির্ভাবের পর এই প্রত্যক্ষ যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। এশিয়া ইউরোপীয় শক্তির নজরবন্দী হয়ে পড়ে, এবং সর্ববিষয়ে ইউরোপের মুখাপেক্ষী হ'য়ে দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চীন, জাপান, ইন্দোচীন, শ্যাম, জাভা, বালি, মালয়, ব্রহ্ম, ইরাণ প্রভৃতি দেশে পরিভ্রমণ ক'রে ঐ সব দেশের সভ্যতার মূল তত্ত্বের সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির সামঞ্জস্য ও মিলন সংঘটনের প্রয়াসী হন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীতে প্রাচ্যবিদ্যা সংগ্রহ ও অনুশীলনের কেন্দ্র স্থাপন করেন। সেদিন দিল্লীতে এশিয়ার দেশসমূহে মিলনযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হলো, এশিয়াবাসীর কর্তব্য আজ রবীন্দ্রনাথকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা; কারণ এশিয়ার মিলনমন্ত্রের তিনিই মন্ত্রদ্রষ্টা।

রবীন্দ্রনাথ যেমন ছিলেন এশিয়ার সাংস্কৃতিক মিলনের ঋষি, তেমনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন এশিয়ার রাজনৈতিক মিলনের প্রথম পথপ্রদর্শক। ১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসের সভাপতিরূপে দেশবন্ধু বলেছিলেন:

"The question of all questions in India today is the attainment of Swaraj.....Even more important than this is participation of India in the great Asian Federation, which I see in the course of formation, It is the union of the oppressed nationalities of Asia. I admit that our freedom must be won by ourselves but such a bond of friendship and love, of sympathy and co-operation, between India and the rest of Asia, nay, between India and all the liberty-loving peoples of the world is destined to bring about world peace. World peace to my mind means the freedom of every nationality, and I go further and say that no nation in the face of the earth can be really free when other nations are in bondage."

দেশবন্ধু এশিয়া ফেডারেশন্ এবং পৃথিবীর সমস্ত পরাধীন জাতির মিলনের উদারবাণী নির্ভীক কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন: যে পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত জাতি স্বাধীনতা লাভ না করে সে পর্যন্ত বিশ্বশান্তি নিষ্ফল স্বপ্নেই পর্যবসিত হবে। পঁচিশ বৎসর গত হয়েছে, আজ যুক্ত-জাতিসঙ্ঘ স্থাপিত হ'য়েছে। কিন্তু দেশবন্ধুর মতবাদের সত্যতা আজ এশিয়ার সকল স্বাধীনতাকামী জাতি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে।

এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হোক যে সম্মেলন এশিয়ার বিভিন্ন সরকারকে অনুরোধ করছেন, তারা যেন জাতিগত সর্ব-প্রকার প্রভেদাত্মক আইন পরিত্যাগ করেন। এই সম্পর্কে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত বলেন—যদি এশিয়া সম্মেলন এই প্রস্তাব গ্রহণ না করে তবে কোন মুখে এশিয়াবাসী যুক্ত জাতিপুঞ্জের বৈঠকে জাতিগত সাম্য দাবি করবে? সোভিয়েট এশিয়ার নেতৃবর্গ এই প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। কিন্তু এই ন্যায্য প্রস্তাবটিও বাতিল করে দেওয়া হ'লো। সিংহলের প্রতিনিধিবর্গ আপত্তি করলেন যে এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে সম্মেলনের নিয়ম ও কার্যক্রমের গণ্ডী অতিক্রম করা হবে। দ্বিতীয়তঃ, জাতীয় স্বাধীনতার আলোচনা সমিতিতে যেরূপ ব্যাপার ঘটলো তাও খুব প্রশংসনীয় নয়। মিশর ও ইন্দোনেশিয়ার নেতৃদ্বয় প্রারম্ভিক অধিবেশনে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে এশিয়া থেকে সাম্রাজ্যবাদ সমূলে বিতাড়িত করে সর্বদেশে জাতীয় স্বাধীনতা স্থাপন এশিয়াবাসীদের সর্বপ্রথম কর্তব্য। সম্মেলনের জাতীয় স্বাধীনতা শাখায় আলোচনা হচ্ছিল যে এশিয়ার যে সব জাতি স্বাধীনতালাভের জন্য এখনও সংগ্রামে লিপ্ত তাদের সেই ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামে এশিয়ার অন্যান্য দেশ কিভাবে সাহায্য করতে পারে। একজন ভারতীয় প্রতিনিধি বললেন যে এইরূপ সাহায্য দান করলে যুদ্ধ ক্রমে এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়বে। স্পষ্টভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া ছাড়া সাহায্যের অন্য পন্থা আবিষ্কার করা সুকঠিন। শেষ পর্যন্ত এই বিষয়ে কোন প্রস্তাবই গ্রহণ করা হ'লো না। সম্মেলনের এইসব ধারা লক্ষ্য করে একজন ইন্দোনেশীয় প্রতিনিধি মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি কি কলেজী বক্তৃতা শোনবার জন্য দূর-দূরান্তর থেকে নূতন দিল্লীতে উপনীত হয়েছেন?

এই সব অভিযোগের উত্তরে সম্মেলনের কর্তৃপক্ষীয়দের তরফ থেকে বলা যেতে পারে যে এশিয়ার জাতিসমূহের এই প্রথম সম্মেলন; এই বিষয়ে অতীত অভিজ্ঞতার পথনির্দেশ নেই। তাই বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয়তঃ, এশিয়ার বিভিন্ন জাতির ভিতর মোটামুটিভাবে একটা সাযুজ্য থাকলেও তাদের আর্থিক ও রাষ্ট্রিক স্বার্থ এক নয়। তাই সম্মেলনের একতা রক্ষার জন্য মতদ্বৈধমূলক প্রস্তাব ও আলোচনা বর্জন করাই ভাল। তৃতীয়তঃ সম্মেলনের কোন প্রকার নিয়মাবলী বা আইন কানুন ছিল না, সেজন্যও বাদানুবাদমূলক সিদ্ধান্ত পরিহার করা সম্ভবপর হয়েছে।

আন্তঃএশিয়া সম্মেলন উপলক্ষে দুটি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে, একটি স্থায়ী আন্তঃ-এশিয়া সংস্থা গঠন। এই সঙ্ঘের সভাপতি হয়েছেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। এশিয়া সম্মেলনের আদর্শ কার্যে পরিণত করা ও ১৯৪৯ সনে চীন দেশে সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা করা আন্তঃএশিয়া সংস্থার কার্যক্রমের অন্তর্গত। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হচ্ছে এশিয়া পাঠচক্র গঠন সম্পর্কীয়। এটি একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান; এর উদ্দেশ্য হবে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা ও গবেষণা। এই দুটি প্রতিষ্ঠানই যে আবশ্যকী। সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে না।

আন্তঃএশিয়া সম্মেলন ভারতবর্ষে যে অভূতপূর্ব চেতনা ও উৎসাহের সঞ্চার করেছে তা খুবই সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু উৎসাহের আতিশয্যে কতকগুলি প্রয়োজনীয় কথা সম্বন্ধে অন্ধ হলে মারাত্মক ভুল করা হবে। প্রথমতঃ মনে রাখতে হবে যে এশিয়ার একতা নিরবচ্ছিন্ন, অবিচ্ছিন্ন সত্য নয়। মোটামুটিভাবে মূলগত ঐক্য থাকা সত্ত্বেও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে অনেকস্থলে বিভিন্ন আর্থিক ও রাষ্ট্রিক স্বার্থের উদ্ভব হয়েছে। এই বিভেদটুকু স্বীকার করে নেওয়া প্রয়োজন। নতুবা জাতীয় স্বার্থের সংঘাতে এশিয়া সম্মেলনের অকালমৃত্যু ঘটতে পারে। দিল্লী অধিবেশনে অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক সহযোগিতার আলোচনা প্রসঙ্গে এই সত্য অনেকেই অনুভব করেছেন। দ্বিতীয়তঃ, এশিয়া সম্মেলন ইউরোপ-বিরোধী প্রতিষ্ঠান নয়। প্রগতিশীল ইউরোপের সঙ্গে সামাজিক, স্বাধীন

সীমা

লিঅন ফএখ্ট্ভানগার   অনুবাদক: ভবানী মুখোপাধ্যায়

[লিঅন ফএথ্‌ভানগার প্রসিদ্ধ জার্মান সাহিত্যিক। ১৮৮৪-এর ৭ই জুলাই মুনিকের ইহুদী ব্যবসায়ীর ঘরে জন্ম। বার্লিন ও মুনিকে দর্শন অধ্যয়নান্তর নাটক, কবিতা ও উপন্যাস রচনা করে অশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। গ্রন্থাবলীর মধ্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস "জু হস্", "জোসেফস্"—আর "আগলী ডাচেস্" বিশ্বব্যাপী খ্যাতি লাভ করেছে। ১৯৩৩-এ জার্মানী থেকে বিতাড়িত হয়ে দক্ষিণ ফ্রান্সে বসবাস করেন। পরে জার্মান অধিকারের পর অন্তরীনাবদ্ধ অবস্থায় আমেরিকায় পালিয়ে এসেছেন।

বর্তমান উপন্যাস "সীমঁ" ১৯৪৪-এ যুদ্ধকালীন দক্ষিণ ফ্রান্সের পটভূমিকায় রচিত। বাঙালী পাঠকের সুবিধার জন্য "সীমঁ"কে "সীমা"য় রূপান্তরিত করা হয়েছে।—**অনুবাদক**]

[পূর্বানুবৃত্তি]

সীমা ও ইতেনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব বর্তমান; ইতেন সীমাকে ভালোবাসে ও তার প্রতি স্নেহ ও সহানুভূতিশীল। তবু সে অল্পবয়সী বালকমাত্র, সীমা নিজেকে তার চাইতে বড় মনে করত। অথচ সীমা-ই ছিল তার চাইতে এক বছরের ছোট। মনে যত কিছু সমস্যা ও সংশয়ের ভাব উদয় হ'ত ইতেনের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে সে বিষয়ে স্পষ্টভাবে আলাপ আলোচনা করত। এই বিভ্রান্তিকর সাময়িক ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে ইতেন হয়ত কিছুই বলতে পারবে না এ কথা সে জানে। তবু তার মনে হ'ল, ইতেন থাক্‌লে বড় ভাল হ'ত, সে হ'ল হেনরিয়েটের ভাই।

সীমার সহপাঠিনী হেনরিয়েট ছিল তার একমাত্র অন্তরঙ্গ সহপাঠিনী, এক বছর আগে হেনরিয়েটের মৃত্যুর পর এখন আর এমন কেউ নেই যার কাছে ও খোলাখুলিভাবে বিশ্বাস করে মনের কথা বলতে পারে, ভাব বিনিময় করে। যে বাড়ীতে হেনরিয়েট ও ইতেন থাকত সেই বাড়িটির সামনে দিয়ে চলার সময় নিজেকে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বলে মনে হ'ল সীমার।

এই শরণাগতদের বিষয় যদি কিছু হেনরিয়েটকে বলা যেত, তা হলে সব কিছুই বেশ সহজ ও সরল হয়ে উঠত, হয়ত উভয়ে কলহ করত, হয়ত হেনরিয়েট চটে উঠত, কিন্তু উভয়ে উভয়কে ঠিক বুঝত। হেনরিয়েট ছিল সীমার বিপরীত চরিত্র, আত্ম-সমাহিত, চট্‌পটে আর সর্বদাই কিছু একটা অপ্রত্যাশিত কাজ করে বস্‌ত। মেয়েটি কলহপরায়ণা ছিল। লোকের মনে আঘাত দিয়ে আনন্দ পেত। সীমা আর হেনরিয়েট একবার স্কুলে পরস্পর মারামারি করেছিল, সীমার বাবার সম্পর্কে হেনরিয়েট একটা অশ্রদ্ধাকর মন্তব্য করেছিল। হেনরিয়েট অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও ছোট মেয়ে ছিল। এই শান্ত ও সুশীলা মেয়ে সীমা তখন তাকে মেরে, আঁচড়ে, তীব্রভাবে আক্রমণ করল। এরপর আশ্চর্যভাবে হেনরিয়েট মার্জনা ভিক্ষা করল, আর তদবধি উভয়ের বন্ধুত্ব আরো নিবিড় হয়ে উঠ্‌ল।

ওদের বাড়ীর সম্মুখ দিয়ে প্রায়ই যাতায়াত করলেও, অনেকদিন হেনরিয়েটের কথা সীমার মনে হয়নি। মাঝে মাঝে এমন হ'ত, কিছুকাল, কিছু সপ্তাহ ধরে হেনরিয়েটের কথা ওর মনে হ'ত না। পরে যখন মনে পড়ত, তখন স্বীয় নিষ্ঠাহীনতার জন্য সে অনুতপ্ত হয়ে

ডেপুটী প্রিফেকটের অফিসে সীমা বিশেষ পরিচিত, এখানেই সে তার মালবোঝাই ঝুড়িটি রেখে দিল, কাকার অফিস পর্যন্ত আর বইতে হবে না।

বোঝাটি নামিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে সীমা এ্যাভিন্যু দ্য পার্কের পথ ধরে কাকার অফিসের দিকে চলল। কিন্তু এ্যাভিন্যুতে বা সহরের নূতন অংশে পৌঁছবার পূর্বেই মত পরিবর্তন করে সীমা স্থির করল পেরী বাসটিডের সঙ্গে দেখা করবে। ওর মনে হ'ল কোনো বন্ধুজনের সঙ্গে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

ভিলা মনরেপোয় এই প্রাচীন দপ্তরী পেরী বাসটিডের তেমন সুনাম নেই। তাঁর সঙ্গে বা তার ছেলে ডেপুটী প্রিফেকটের সেক্রেটারী মঁশিয়ে জাভিয়েরের সঙ্গে মেলামেশা সীমার আত্মীয়বর্গ পছন্দ করেন না। প্রস্পার খুড়ো ও মাদাম এদের রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে নাসিকা কুঞ্চিত করতেন, স্পষ্টই বলতেন বুড়া দপ্তরীটা নির্বোধ। পেরী বাস্‌টিড্ একটু অবশ্য ছিটগ্রস্ত ও একগুঁয়ে ছিলেন। সব বিষয়েই তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠতেন, নিন্দা ও প্রশংসা কোনো বিষয়েই তার সংযম ছিল না, মাঝে মাঝে অতীত ও বর্তমান তাঁর কাছে গোলমাল হয়ে যেত। এখন যদিও অনেকের মন সংশয়াচ্ছন্ন, তবু ফ্রান্সের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা হ্রাস পায়নি। এঁর কাছে ফ্রান্স সম্পর্কে দু এক কথা শুনতে সীমার ভালো লাগত। সবচেয়ে বড় কথা উনি ছিলেন সীমার বাবার বন্ধু,—তাঁকে উনি ভালো ভাবেই জানতেন, মাঝে মাঝে তার সম্পর্কে সগর্বে ও সস্নেহে কথা বলেন। এই কারণেই সীমার সঙ্গে বৃদ্ধটির একটা সংযোগ থেকে গিয়েছিল, আর আজকের এই দুঃখকর তমসাবৃত অভিজ্ঞতার পর তাঁর সঙ্গে দেখা হলে হয়ত ভালোই হবে।

পেরী বাস্‌টিড পেটিট্‌ পোর্টে থাকতেন। শহরস্থ পাহাড়ের পিছন দিকটিতে, সর্বোচ্চ চূড়ায় তাঁর প্রাচীন পৈতৃক বাসভবন। একদিক থেকে প্রাচীন শহরের বাড়ি-গুলির ধূসর ছাত দেখা যায়, অপর দিকে প্রশস্ত ও চক্রাকার সেরিন নদীর উপত্যকা।

প্রাচীন সিঁড়ি বেয়ে উপরে কারখানার কাচের দরজায় মুখ চোখ রেখে সীমা ভিতরে তাকাল। পেরী বাস্‌টিড্ দীর্ঘকাল পূর্বে ব্যবসা থেকে অবসর গ্রহণ করলেও আত্ম-তৃপ্তির জন্য এখনও বই বাঁধাতে ও এইখানে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসেন, অনেক সময় এই দোকানেই বসে কাটান। বই তাঁর অত্যন্ত প্রিয়, আর তাঁর নিজস্ব পাঠাগারটিও বেশ বড়।

এই কারখানার সকল রকমের প্রাচীন ও অদ্ভুত আসবাবপত্রের ভিতর সীমা দেখল, তিনি একটি আরাম-কেদারায় বসে ঘুমিয়ে আছেন। তাঁর মাথার ঠিক উপরেই বিশিষ্ট সমাজতন্ত্রী নেতা জীন জাউরেসের প্রকাণ্ড ছবি টাঙানো, পেরী বাস্‌টিডের তিনি অশেষ শ্রদ্ধাভাজন। বিগত যুদ্ধের সূচনায় জাউরেস উগ্র-দক্ষিণপন্থী একটি সংবাদপত্রের প্ররোচনায় এক আততায়ীর হাতে নিহত হন। বাস্‌টিডের কাছে জাউরেস গৌরবময় অতীতের ও ফ্রান্সের প্রতীক। ছবিতে দেখা যাচ্ছে তিনি একটি বিরাট পতাকার সামনে মঞ্চোপরি দাঁড়িয়ে জনতার কাছে বক্তৃতা করছেন। লোকটিকে মনীষীর মত দেখায়। নম্র অথচ দুর্দমনীয় প্রকৃতি।

সীমা কিছুক্ষণ কাচের জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ছবির নীচে নিদ্রাচ্ছন্ন বৃদ্ধ বাস্‌টিডের দিকে তাকিয়ে রইল। তাঁকে দেখে মনে হয় যেন তাঁর পরিবর্তন ঘটেছে। আগে তাঁকে সর্বদাই সতেজ, প্রাণবান ও আগুন-ভরা মানুষ বলে মনে হ'ত—আজ কিন্তু এই বিশাল আরামকেদারার গহ্বরে তাঁকে কুঞ্চিত, ক্ষুদ্র ও পর্বতের মত প্রাচীন বলে মনে হচ্ছে। তাঁকে দেখে সীমার মনে বড় কষ্ট হল, দুঃখে তার অন্তর আকুল হয়ে উঠল।

সীমার মনে হ'ল উনি হয়ত তার অতর্কিত আবির্ভাব পছন্দ করবেন না। তাই সে নীচে নেমে গেল, সশব্দে সদর দরজা বন্ধ করল, আবার ওপরে উঠে এল যথা সম্ভব দ্রুত গতিতে ও পায়ের শব্দ করে।

যেমনটি ঠিক আশা করা গিছল, পেরী বাস্‌টিড ঘুম

ভেঙে উঠেছেন, চকচকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে সীমাকে দেখে খুশী হয়ে বললেন—"এসো, খুকী যে!" তারপর দেরাজ থেকে ঘরে তৈরী করা এক বোতল ব্রাণ্ডি বার করে এনে সীমাকে একগ্লাস দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। সীমাও নম্রভাবে এক চুমুক ব্রাণ্ডি পান করলো।

সীমা যেমনটি হবে আশা করেছিল ঠিক তেমনই হ'ল। সীমাকে একটি চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে ঘরময় পায়চারী করতে করতে তিনি বললেন "শোনো মা—", তারপর যে সব ঘটনা ঘটছে সেই বিষয়ে উত্তেজিতভাবে আলোচনা করতে লাগলেন। ক্রোধভরে বললেন—"এইত, কোথায় আমরা নেমে এসেছি।" এই কথা বলে ছোট্ট জানলা দিয়ে সেরিন উপত্যকার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। এখান থেকে দেখা যায় অনেক নীচে রৌদ্রতপ্ত ধূলিমলিন পথে শরণাগত দলের অন্তহীন মিছিল।

তিনি বললেন—ওদের এই পালিয়ে আসাটা নিছক পাগলামো, একটা বিপদ থেকে ওরা আর একটা বড় বিপদের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এদের কোথায় আটকে রাখবে, না কর্তৃপক্ষরা ওদের পালিয়ে আসার জন্যই তাড়া দিয়েছেন। এখন ওরা পথ আটকে দাঁড়িয়েছে, আমাদের রিজার্ভ বাহিনী কোনো পথ দিয়েই অগ্রসর হতে পারে না। বোঝা শক্ত যে আমাদের গভর্ণমেণ্ট অপটু, না এর পিছনে কোনো কু-মতলব আছে। বৃদ্ধ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। হাত পা নেড়ে যে ভঙ্গীতে তিনি কথা বলছেন কে বলবে যে এই বৃদ্ধই অথর্বের মত সঙ্কুচিত হয়ে এতক্ষণ বসেছিলেন।

পেরী বাস্টিড আবার সুরু করলেন: প্রধান মন্ত্রী রেডিয়োতে বলেছেন, যেখানে সৈন্যদের থাকা উচিত ছিল সেখানে তাদের পাওয়া যায় নি, ব্রীজ উড়িয়ে দেওয়া হয়নি, ষোলজন জেনারেলকে তিনি পদচ্যুত করেছেন। তিনি নিজেই একটা বিদ্রোহের কথা ইঙ্গিত করেছেন। আমার ছেলে জাভিয়ের বলে যে, ইনডাসট্রিয়াল কাউন্সিল, কমিতি দেব ফরজেস, ব্যাঙ্ক দি ফ্রান্স প্রভৃতির বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী গোড়া থেকেই "বস্‌দের" (জার্মান) জয় হবে ধরে নিয়েছেন এবং বলেছেন সেই অবস্থা তাঁদের অসন্তোষের কারণ হবে না। আমি এ ধারণায় বিশ্বাসী নই।—নিষ্ফল ক্রোধে চীৎকার করে তিনি বললেন—আমার বুড়ো মাথায় এ সব বিশ্বাসে প্রবৃত্তি হয় না। ফ্যাসিস্তরা কি পারে না পারে আমি জানি। জাউরেসকে হত্যা করার পর এই দুশ' পরিবার কি করতে পারে আমি জানি, কি তাদের ক্ষমতা বুঝি, তাদের সম্বন্ধে সব কিছুই বিশ্বাস করতে পারি, তবে তারা বিজয়ী হবে এ বিশ্বাসে আমার প্রবৃত্তি নেই।

সহসা সীমার সাম্‌নে থেমে, জাউরেসের ছবির দিকে নির্দেশ করে তাঁর পরম শ্রদ্ধেয় গুরুর বাণী উদ্ধৃত করে বল্লেন: "ফ্রান্স একটি ঐতিহাসিক দেউল, বহু শতাব্দীর সমবেত দুঃখ, লাঞ্ছনা, ও ক্লেশের ভিতর ধীরে ধীরে এই বিশাল মন্দির গড়ে উঠেছে। শ্রেণী সংগ্রাম বা তীব্র সামাজিক বৈপরীত্য অবশ্য থাকতে পারে। কিন্তু তদ্বারা কি মাতৃভূমির মূল সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়?" সীমাকে পেরী সন্ত্রাসকর ভঙ্গীতে প্রশ্ন করলেন—তুমি কি বিশ্বাস করো মা, এমন ফরাসী আছে যে ফ্রান্সের নিদারুণ সংকটকালে প্রকৃতই তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে বসবে? বিশ্বাসঘাতকতা করে তার স্বদেশবাসীকে এইভাবে পথে বার করে দেবে?—শরণাগতের মিছিলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে উত্তেজিত পেরী বাস্টিড বললেন, আমি এ সব বিশ্বাস করি না—

টেবিলের উপর বৃদ্ধ সজোরে একটি ঘুসী মারলেন।

আগ্রহভরা সুন্দর চোখ মেলে সীমা বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। প্রাচীন ফ্রান্সের ভগ্নাংশ এই বৃদ্ধ কিছুতেই স্বীকার করবেন না-যে, তাঁর ফ্রান্সের অবসান ঘটেছে। ক্ষুদ্র ও অসহায়, সাহসী আর কিঞ্চিৎ হাস্যোদ্দীপক এই বৃদ্ধ তাঁর অতীতের মৃত ভাবধারার জন্য সংগ্রাম করে চলেছেন।

বৃদ্ধ আবার সুরু করলেন: এর জন্য দায়ী উকীলরা। রাজনীতিক আর উকীলরাই ফ্রান্সের ওপর আধিপত্য চালাচ্ছেন। "বস"রা (জার্মানরা) যখন অস্ত্রে সজ্জিত

থেকেই দেখা বা শোনা যাবে ; আফিসে গ্যারাজে, পেট্রল পাম্পের প্রাঙ্গনে, সর্বত্রই যেন তিনি বিরাজমান, একে হুকুম করছেন বা তাঁর গম্ভীর ও সুরেলা গলায় কারো সঙ্গে গল্প করছেন। সীমা আশা করেছিল এই দুর্যোগের সময় তাঁকে হয়ত অধিকতর ব্যস্ত দেখা যাবে।

বুক-কীপার মঁসিয়ে পেরুর কাছে সংবাদ পাওয়া গেল, কর্তা প্রাইভেট রুমে রুদ্ধদ্বারে বসে আছেন, এখন কেউ যেন তাঁকে বিরক্ত না করে এই তাঁর বাসনা। তিনি স্যাটালিন মার্কুইস্ ডি সেণ্ট ব্রিসনের সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত আছেন। মঁসিয়ে পেরু বেশ সশ্রদ্ধ ভঙ্গীতে মৃদু-গলায় বললেন, টেলিফোন নিষ্ক্রিয়, তাই মার্কুইস্ স্বয়ং মঁসিয়ে প্লানকার্ডের সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন। বুক-কীপারের খরগোসের মত মুখখানি শ্রদ্ধায় নির্বোধের মত হয়ে উঠ্‌ল।

মঁসিয়ে পেরু সীমার সঙ্গে খোলাখুলিভাবে এবং গোপনকথা বল্‌তে অভ্যস্ত ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক দরদ আছে, মঁসিয়ে প্লানকার্ডের কর্মচারী হিসাবে পেরুর মনে মনে বেশ গর্ব ছিল, তাঁকে তিনি শ্রদ্ধা করেন। আর মামসেল সীমা হল কর্তার আত্মীয়া। পেরু ভাবলেন যে মার্কুইস্ সেণ্ট ব্রিসনের মত ব্যক্তি স্বয়ং যখন মঁসিয়ে প্লানকার্ডের সাহায্যপ্রার্থী, তখন সীমাও তাতে গর্ব অনুভব করবে। অফিসের অপর কর্মচারীরা কিন্তু পরস্পর হাসাহাসি ও সীমার প্রতি ইঙ্গিত করতে লাগ্‌ল। ঐ "ফ্যাসিষ্ট" মার্কুইসটা হয়ত সীমার খুড়োর প্রাইভেট কক্ষে বসে নতুন কোন ব্যবসার ফন্দী আঁটছে, এই কথা মনে করে তারা হয়ত বিদ্বেষপূর্ণ রসিকতা করছে।

(ক্রমশঃ)

সত্য নিজেই বেগবান, এবং কখনই জিজ্ঞাসার গতিরোধ করে না, নিবৃত্তিও ঘটায় না। যা কিছু চিন্তার পথ রোধ করে তাই মিথ্যা। সুতরাং চিন্তার প্রকৃত এবং যথার্থ প্রগতি হচ্ছে জ্ঞানান্বেষণের পথে,—যে জ্ঞান কোনো দিকেই কোনো বাধাকে স্বীকার করে না। চিরন্তন জিজ্ঞাসার মধ্যেই জীবনের তাৎপর্য্য। আর কেবল সেই জিজ্ঞাসার সাহায্যেই আমরা নূতন সত্যে উপনীত হতে পারি।— আউস্পেন্‌স্কি।

বিচ্ছিন্ন চিন্তা

অজিত দত্ত

হঠাৎ কালবৈশাখী এলো। সমস্ত আকাশ আর পৃথিবীব্যাপী তৃষ্ণার বহ্নি মুহূর্তে নিবে গেলো এক উদ্দাম ফুৎকারে। ম্রিয়মান জগতে এক দুর্দান্ত প্রাণ-শক্তির চঞ্চল খেলা যেন জীবনের আনন্দ ও জীবন-ধারণের অভিলাষকে নিমেষে মর্মের গোচর করে দিয়ে গেলো। গতানুগতিক জীবনের পর্দা সরিয়ে দিলে এই কালবৈশাখীর ঝড়,—স্মরণ করিয়ে দিলে,—'বাঁচি আমি বাঁচি'।

এইরকম করেই প্রকৃতির সহস্র প্রকাশে, রূপ থেকে রূপান্তরে, আমরা বারবার চকিতে নিজেকে দেখে নিতে পারি। এমনি করেই ভাদ্রের মাঝামাঝি হঠাৎ একদিন আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে হয় শরৎ এলো। এইরকম করেই ফাল্গুনে প্রথম উত্তাপের স্পর্শে মন সচেতন হয়ে ওঠে। এইরকম করেই ঋতুচক্রে বারবার নব নব আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি আমাদের অলস মনকে সচকিত করে দেয়। বিতৃষ্ণ, বিমুখ মনকেও ফিরিয়ে আনে জীবনের সৌন্দর্যের উপভোগের দিকে, অন্ধকার হতাশা থেকে আশার উজ্জ্বল প্রভাতের অভিমুখে।

প্রকৃতির আকস্মিক অভিনব আবির্ভাবে হৃদয়ে যে সাড়া জাগে, আমার কাছে সে-আনন্দের আর কোনোই তুলনা নেই একমাত্র কাব্যপাঠের রোমাঞ্চকর আনন্দ ছাড়া। কিন্তু কাব্যচর্চা অনভিনিবিষ্ট মনকে চকিতে এমন আনন্দের সুরে ভরে দিতে পারে না। আলস্য-যাপনকে আলস্য-বিলাস করে তুলতে পারে না এমন এক মুহূর্তে। কাব্য পড়বার এবং উপভোগ করবার জন্য আমরা এক-একটি দুর্লভ ক্ষণের প্রতীক্ষা করি। কাব্য-পাঠের না। কিন্তু কখনো, কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে প্রকৃতি যখন হঠাৎ এক নতুন রূপ নিয়ে চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তখন মন তাকে ফিরিয়ে দিতে পারে না। কেননা আমরাও বিশ্বপ্রকৃতিরই অঙ্গ। ওর সঙ্গে আমাদের অন্তরের যে নিগূঢ় অচ্ছেদ্য বন্ধন, তাকে তো ছিঁড়ে ফেলবার উপায় নেই।

সেই অপরূপ প্রকৃতির আবার নতুন ক'রে দেখা পেলাম ওই কালবৈশাখীর ঝড়ে। আজকের বীভৎস মারণ-যজ্ঞের পূতিগন্ধ মিলিয়ে যাবার আগেই, আমাদের মনের অস্থির উত্তেজনাকে শান্ত হবার অবসর না দিয়ে হঠাৎ আকাশ তার নীলাঞ্জন মোহ বিস্তার করে হৃদয় ছেয়ে দিলে। যেমন করে শবাকীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রেও চাঁদ ওঠে, যেমন শ্মশানপ্রান্তের শাল্মলী শাখাও একদিন জীবনের রঙে উদ্ভাসিত হয়, তেমনি বিস্ময়কর অপ্রত্যাশিতভাবে এবারও যেন ওই মুহূর্তের শুভদৃষ্টিতে নিজেকে আবার ফিরে পেলাম।

এই হচ্ছে প্রকৃতির কাছে মানুষের পরাজয়। এটাই প্রকৃতির চরম প্রতিশোধ ও পরম শিক্ষা। প্রকৃতি বারংবার, অক্লান্তরূপে তার দানকে সর্বাঙ্গীন সৌন্দর্যে ভরিয়ে তুল্‌ছে। কোনো কারণেই সে তার সৃষ্টিকে ব্যাহত হতে দেয় না। রাত্রি ও প্রভাতের জ্যোতিছায়াময় চক্রটি যেমন অবধারিত তেমনি বিস্ময়কররূপে বৈচিত্র্যময়। প্রত্যেকটি দিন ও রাত্রি নিজস্ব রূপ ও দানের গৌরবে স্বতন্ত্র, অগণিত মানুষেরই মতো। তাদেরকে বিশেষভাবে চিনে রাখা যায়। এক-একটি দিবা ও রাত্রির—

হৃদয়বৃত্তি যদিও বা মুমূর্ষু না হয়, তবু দমনের যোগ্য। কেননা হৃদয়বৃত্তির থেকেই মানুষের দুঃখ ও দুর্দশার উৎপত্তি বেশি। সে-কারণে কবিতা এখন বিদ্বন্মণ্ডলীর বিরাগ ও অপ্রীতির হেতু।

কিন্তু আমরা যারা পৃথিবী ও আকাশে, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে, প্রভাতে ও রাত্রে নিত্যই হৃদয়ের নব অনুভূতির প্রেরণা পাই, এবং আমাদেরি মতো আরো সহস্র-সহস্র, লক্ষ-লক্ষ, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, আগত ও অনাগত মানব যারা ঘর বাঁধে ও ভালোবাসে, হৃদয়ের আনন্দ ও বেদনার মধ্যেই যাদের জীবনের পরিচিতি, যারা শৃঙ্খলা মানে বলেই মানুষ নয়, বরং অনুভব করতে জানে বলেই মানুষরূপে গণ্য, তাদের জীবনে কবিতার চেয়ে বড়ো সান্ত্বনা আজ কোথায়?

তাই মনে হয়, কবিতার প্রয়োজন যেন আজ বড়ই বেশি। এবং তারো চেয়ে প্রয়োজন কবিতার দিকে মানুষের মনকে ফিরিয়ে নেওয়ার। কেননা ওরি মধ্যে আছে সত্যধর্ম, যে ধর্ম প্রত্যেক মানুষের অন্তরের; মানুষ মানই যে-ধর্ম জানে, তবু বারবার ভুলে যায়। প্রকৃতির মধ্যে কবি যে অন্তর্দৃষ্টি খুঁজে পায়, সে আজ তা বিশ্বমানবকে ফিরিয়ে দিক।

"সমাজবিচ্ছিন্ন যে আত্মকেন্দ্রিক মানুষ, সে মানুষ নিতান্তই কাল্পনিক, তার সুখ দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার আবেদন সর্বজনীন নয়। কেননা সে নিজেকে অন্যের কাছে উদ্ভাসিত করছে না, আপনার পরিচয় সে বহন করছে নিরালম্ব অনন্যতায়; অপরের সঙ্গে মানসিক যোগাযোগ স্থাপনের ব্যাপারে অপরিহার্য যে সাধারণ সামাজিক আধার, তার মূলে আছে জীবনের প্রতি এক গভীর বিশ্বাস, সমাজ-সংযুক্ত একটি সততা—সাহিত্যিক সততা।... এই সততার জোরেই বোধ হয় সোভিয়েট লেখকের কাছে বক্তব্যটাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেশী প্রাধান্য পায়; কেমন করে চলতে হবে তার অনুশীলনটা বিশেষ করে মুখ্য হয়ে ওঠে তখন, যখন ব্যক্তিত্ববোধে আচ্ছন্ন চরিত্রের ক্লান্তিকর বিশ্লেষণে স্বকীয়তার আশ্রয় না নিলে লেখকের পক্ষে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করা কঠিন হয়।"

সুবোধের মা সরস্বতী

জগদীশ গুপ্ত

সরস্বতী বিধবা, সরস্বতী দরিদ্র, সরস্বতী ভদ্র এবং সে সুবোধের মা। জননীর এই সুবোধ একমাত্র সন্তান। কিন্তু সে কেবল সরস্বতীর গর্ভজাত সন্তান নয়—সে আরো অনেক কিছু—জীবন-মরণ ইহকাল-পরকালব্যাপী সত্তা সে—সে ইয়ত্তাহীন ভাবের আর অন্তরের বিগ্রহ আর আশ্রয়।

সরস্বতীর শ্বশুর মহেন্দ্রনাথ ছিলেন অবস্থাপন্ন লোক – বিস্তৃত ব্যবসায় ছিল তাঁর। তাঁর দুয়ারে হাতী বাঁধা থাকিত না বটে, কিন্তু দুয়ারে লোকসমাগম ছিল, লক্ষ্মীশ্রী ছিল, সম্ভ্রান্ত সজ্জন বলিয়া মান মর্যাদা ছিল; তিনি অর্থোপার্জন করিতেন প্রচুর। কিন্তু লক্ষ্মী একদিন বিমুখ হইলেন—যে পথে টাকা আসিত, অতর্কিত দৈবদুর্ঘটনায় একদিন সেই পথেই তাঁর শেষ কপর্দকাদি পর্যন্ত নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। কিছু টাকা খাটিত, কিছু টাকা অসময়ের সম্বল হিসাবে স্থানীয় ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকিত। ব্যাঙ্ক ফেল করিল। যাহারা আইন-পরিচালক তাঁহাদের হস্তক্ষেপে আমানতকারীরা কিছু কিছু পাইলেন বটে, কিন্তু সেটা সঞ্চিত অর্থের নগণ্য ভগ্নাংশ মাত্র। ইহার অল্পদিন মধ্যেই মালগাড়ীর তাঁহারই নামীয় গাড়ীখানা কোন্ লাইনে কোন্ ঠিকানায় চলিয়া গেল তাহার আর উদ্দেশই মিলিল না। উকিলের চিঠি পাইয়া রেল কোম্পানী কিছু ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করিলেন বটে—কিন্তু তাহাতে ক্ষতির পূরণ তেমন কিছুই হইল না।

তারপর, বাজারে যাহাদের সঙ্গে তাঁর মালপত্রের লেনদেন্ চলিত তাহারাও ঠিক এই সময়টিতেই একদিন গদী গুটাইয়া আজমীর গেল, কি ভোল্ বদলাইয়া অন্য স্থানে সরিয়া বসিল তাহা আবিষ্কৃত হইল না। চালানী কাঁচা মালের দরুণ তাহাদের কাছে মোটা টাকা পাওনা ছিল সেটা গোটাই গেল।

এই সবের ফলে মহেন্দ্রের বিস্তৃত কারবার নষ্ট হইয়া লক্ষ্মীর পুলক চপলার দ্যুতির মতো এক নিমেষে অন্তহীন অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। সেই শোকে মহেন্দ্রনাথ শয্যাগ্রহণ করিলেন।

তাঁর মৃত্যুর পর সরস্বতীর স্বামী বিশ্বনাথ ভাঙ্গা হাট জমাইয়া তুলিতে গিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। কেবল না পারিলে তেমন দুঃখ ছিল না; কিন্তু পরম দুঃখের বিষয় হইল ইহাই যে নিরুপায় হইয়া তাহাকে দাসত্ব স্বীকার করিতে হইল; কারবারসূত্রে একদিন তাহারা যাহাদের সমকক্ষ ছিল বিশ্বনাথ তাহাদেরই একজনের অনুগ্রহ শিরোধার্য করিয়া লইল। মাধব দত্ত তাহাকে কর্ম্মচারী করিয়া রাখিলেন....

দাসত্বের জ্বালায় বিশ্বনাথের প্রাণ পুড়িয়া ছাই হইতে লাগিল।

বিশ্বনাথ নিঃশব্দ থাকিত—

পিতৃগৌরব সে কীর্তন করিত বটে, কিন্তু বর্তমান দুঃসহ দুরবস্থার উল্লেখ করিয়া সরস্বতীর সম্মুখে সে কোনদিন দুঃখের নিঃশ্বাস ফেলে নাই। তবু সরস্বতী বুঝিতে পারিত স্বামীর মনে অহরহ ঘুণের কাজ চলিতেছে—নিটোল সবল স-লীল মনটি লইয়া তিনি নাই—মন তাঁর শীর্ণ। অভাবের কথা উঠিতেই তাঁহার মুখে যে ছায়া দেখা দিত, সরস্বতী জানিত, তাহা বড় গুরুতর। স্বামীর মুখের প্রত্যেকটি রেখা তার পরিচিত—রেখার

করিতে দূর দূরান্তে অদৃশ্য হইতেছে, হাত যেন ঘুমাইতে চাহিতেছে; ঢুলিতে ঢুলিতে দু'বার চমকিয়া উঠিয়াই হাত আবার এলাইয়া পড়িল—কলমটি আর তুলিয়া লওয়া হইল না····

রাস্তার উপর হইতে লোকের গলার শব্দ আসিতেছে—

বিশ্বনাথের মনে হইতে লাগিল, সে শব্দ যেন মেঘলোক হইতে নির্গত হইতেছে, অস্ফুট অথচ গম্ভীর, চোখের সম্মুখে কতকগুলি মূর্তি নড়িতে লাগিল—তাহাদের কলরব পরস্পরকে পরাস্ত করিয়া ক্রমশঃ উচ্চে উঠিতেছে

বিশ্বনাথের আচ্ছন্ন এই ভাবটা হঠাৎ দূর হইয়া গেল সহকর্মী রামলালের ডাকে—

—এ্যাঁ। বলিয়া চমকিয়া চোখ মেলিয়া চাহিয়া সে কখন দেয়ালে পিঠ দিয়া চিৎ হইয়া পড়িয়াছিল তাহাও সে জানে না।

তারপর পাল্‌কিতে করিয়া বিশ্বনাথকে বাড়ীতে আনা হইল।

রামলাল আর ভৃত্য পানু ধরিয়া লইয়া যখন তাহাকে শয্যায় শুয়াইয়া দিল তখন তার চোখের রং রক্তজবার মতো। শুইয়া সে ঊর্ধ্বদিকে চাহিয়া রহিল, কাহারো ডাকে সাড়া দিল না, কাহারো প্রশ্নের জবাব দিল না। গায়ের উত্তাপ বাড়িতে লাগিল; রামলালেরই সাহায্যে ডাক্তার আনাইয়া চিকিৎসা শুরু হইল।

পাল্‌কিতে তুলিয়া বিশ্বনাথকে বাড়ীতে আনিবার সময় রামলাল শঙ্কিতচিত্তে ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছিল, না জানি কান্নাকাটির আর অস্থিরতার কি তুমুল কাণ্ডটাই দেখিতে হইবে। রামলাল জানিত, বিশ্বনাথের স্ত্রী বুদ্ধিমতী; কিন্তু তার বুদ্ধিমত্তা তাহাকে যে এমন আত্মস্থ নিবিড় করিয়া তুলিয়াছে তাহা সে চোখে না দেখিলে অনুমান করিতে পারিত না। সরস্বতী অস্থির হইয়া কান্নাকাটি কিছুই করিল না, আর্তনাদ তার মুখ দিয়া বাহির হইল না—নিঃশব্দে বাহকদ্বয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকিয়া স্বামীর শয্যায় সে বসিল। সে বসিবামাত্রই তার বসা দেখিয়াই রামলালের মনে হইল, সে আর উঠিবে না; ঐ শয্যার বাহিরে তার আর প্রয়োজন নাই; স্বামীর রোগশয্যা ছাড়া আর সব তার কাছে শূন্য হইয়া গেছে।

নূতন ধরণের ব্যাধি দেখিয়া শিক্ষানবীশ ডাক্তার একবার ডাকিতেই তিনবার আসিয়া দেখিয়া গেলেন; পানু ঔষধ আনিতে লাগিল; ডাক্তার চার ঘণ্টায় তিনবার ঔষধ পরিবর্তন করিলেন, রামলালের ছেলে দুটি রোগীর মাথায় বরফ দিয়া রাত জাগিল; কিন্তু বিশ্বনাথের চোখের লাল কাটিল না, মুখে শব্দ আসিল না; গায়ের উত্তাপ কমিল না।

সূর্যোদয়ের পর অকস্মাৎ তার জ্ঞান ফিরিল; চোখ মেলিয়াই দেখিল, সরস্বতী তার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে; ইচ্ছা হইল, তার মাথার উপর হাত তুলিয়া দেয়, কিন্তু হাত অতদূর উঠিল না, বলিল,—আমি চললাম সরস্বতী।

সরস্বতী স্বামীর মুখ চাপিয়া ধরিল—

বিশ্বনাথ বলিল,—মিথ্যে নয়। মনটাকে ক্ষয় করে এনেছি। যে ইচ্ছার জোরে মানুষ বেঁচে থাকে সে জোর আমার নেই, আমি তা বোধ করছি। এখন খুবই ইচ্ছে হচ্ছে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকি, ছেলের ঐশ্বর্য আর কৃতিত্ব দেখে যাই, কিন্তু জীবনের আকর্ষণ আমি নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে লঙ্ঘন করে গেছি···

সরস্বতী বলিল,—না, তুমি বাঁচবে; আমার ইচ্ছায় তুমি বাঁচবে।

কথাটা কানে যাইয়া বিশ্বনাথের মনে হইল, সাধ্বী স্ত্রীর এই দৃঢ় প্রত্যয় বুঝি ব্যর্থ হইবার নয়, বলিল,—দেখো চেষ্টা করে। ডাক্তার এসেছিল?

—হ্যাঁ।

—কি বলে গেল?

—বলেনি কিছুই। ওষুধ দিচ্ছে।

—টাকা দিচ্ছ কোথেকে?—বলিয়াই বিশ্বনাথ স্ত্রীর

হাতের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। ক্ষয়াবশিষ্ট কবেকার সেই দুখান। স্বর্ণালঙ্কার—একদা হাতে উঠিয়াছিল ·

কিন্তু তা হাতেই আছে।

সরস্বতী বলিল,—রামলালের স্ত্রী রাত্তিরে এসেছিল। বাবা নাকি রামলালের কাছে শ'খানেক টাকা পেতেন। তাই সে দিয়ে গেছে।

শুনিয়া বিশ্বনাথের নিষ্প্রভ চক্ষু ছলছল্ করিতে লাগিল, বলিল,—মিছে কথা, সরস্বতী, সে আমাদের দিয়েছে।

দু'জনেই নিঃশব্দ হইয়া রহিল, দুজনারই অন্তর বিগলিত হইয়া যেন সেই দয়াময়ের পায়ের উপর লুটাইতে লাগিল।

বিশ্বনাথ বলিল,—সুবোধ কই?

—ঘুমুচ্ছে।

—তুমি তাকে মানুষ করো, তোমার উপর দায়িত্ব রইল।

সরস্বতী চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—আমি কাছে থাকলেই তুমি এম্‌নি প্রলাপ বকবে।

বিশ্বনাথ কাতর হইয়া বলিল,—আর বকব না, কিন্তু তোমাদের আমি ভাসিয়ে চললাম।—বলিতে বলিতে এক ফোঁটা চোখের জল গড়াইয়া পড়িল।

সরস্বতী দ্রুতপদে বাহিরে যাইয়া আত্মসম্বরণ করিয়া দাঁড়াইল, বিশ্বনাথের অজস্র চোখের জল উপাধানে পড়িতে লাগিল।

বিশ্বনাথের শেষ কথাটি ঐ—

অশ্রুর শেষ প্রবাহ ঐ—

বুকের শেষ প্রদাহ ঐ—

পরক্ষণেই সরস্বতী যখন তার কাছে গেল তখন তার শ্বাস নাভিমূল হইতে উত্থিত হইতেছে - চোখের তারা স্থির হইয়া গেছে।

—দুই—

ছেলে বড় হইয়াছে, এখন সে সাত বছরের, কিন্তু তার সুবোধ নাম সার্থক হয় নাই।

সরস্বতী মাঝে মাঝে বসিয়া তাই ভাবে। স্বামী তাহার জীবনে যে মাধুর্য ঢালিয়া দিয়া গেছেন তাহা মন্দাকিনীর স্রোতের মতো অনন্ত। বাইশ বছরের অগাধ উদ্বেল আনন্দের অখণ্ড মূর্তি ঐ ছেলে—রক্ত, মজ্জা, মেদ, মর্ম, সম্বিৎ, আশা সব মিলিয়া যে নারী সে তাহাদেরই নিখিল-ব্যাপী সারবিন্দু ঐ ছেলে। কিন্তু বড় দুরন্ত, ঘরবাড়ী যেন দুহাতে আকাশে তুলিয়া ঘুরাইতে থাকে—সংসার ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। তা যাক্, কিন্তু ছেলে নিজের অকল্যাণ ঘটাইয়া না বসে। সরস্বতীর বুক ঢাটায়, তার সতর্কতা এতই যেন সে দুই পাশে অতল গহ্বর লইয়া সংকীর্ণ পিচ্ছিল পথে পা টিপিয়া টিপিয়া চলিয়াছে. গা টলিলে পা টলিবে, মাথা টলিলে আর রক্ষা থাকিবে না। ভাবিয়া সরস্বতীর গা ঘামিতে থাকে।

তার নিজেরও মনে পড়ে, এবং আরো আগেকার কথা, শাশুড়ী বলিতেন, বিশ্বনাথও অম্‌নি দুদান্ত দুর্বৃত্ত ছিল, সুবোধও তেমনি অশান্ত। সরস্বতী আশা করে, বাপেরই মতো বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার এই দুদম ঝঞ্ঝার বেগও শান্ত হইয়া আসিবে। কিন্তু এখন যে বড় নিরুপায় মনে হয়। ভয়ের যে অবধি নাই! শুধু সে মা নয়, সে অভিভাবিকা। মৃত্যুশয্যায় স্বামী তাহাকে বিশ্বাস করিয়া, আর, পরম অমূল্য একটি মর্যাদা দিয়া ছেলের ভার অর্পণ করিয়া গেছেন, তাঁর মুখ দিয়া লুপ্ত ঐশ্বর্যের পুনরুদ্ধারের আশার কথা, আর, পিতৃকুলের আশীর্বাদ আর আকাঙ্ক্ষা নির্গত হইয়াছিল, তর্পণপিপাসু পরলোকগত আত্মা এই বংশধরের দিকে চাহিয়া আছেন।

সরস্বতী ছেলের কথা ভাবে—ছেলের দায়িত্ব আর কর্তব্য অশেষ।

সুবোধের চেহারা তার বাপের মতো নয়; কিন্তু সময় সময় সরস্বতী হঠাৎ চমকিয়া ওঠে—ছেলের

আসরের বাতাস লোকের নিঃশ্বাসে গরম হইয়া উঠিয়াছিল—বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাস মাথায় লাগিয়া মাধব দত্ত আরামবোধ করিলেন।

ব্যাটারা যেন কি! একটু আক্কেল যদি ব্যাটাদের থাকে! এ কি যাত্রা না ছাই! দল ছিল যাদব পাকড়াশীর—যাত্রা বলে যাকে! গাইত কি! চারচৌকশ ছিল তারা। এদের ডেকে বলে দিতে হবে। এমন গান না করে যেন বেগুন বেচে!

ভাবিতে ভাবিতে নিজের রসটাই ষোলআনা উপভোগ করিয়া মাধব দত্ত মনে মনে খুব হাসিতে লাগিলেন; খানিক হাসিবার পর জানিতে চাহিলেন—ওরে পানু, গান শুনলি?

পানু পিছন হইতে বলিল,—আজ্ঞে, শুনলাম।

—কেমন শুনলি?

ইতস্ততঃ করিয়া পানু মনের কথাটাই বলিল,—মন্দ নয়, বাবু।

—হি হি। তোর যেমন আক্কেল তেমন আদেখলে মন। যাত্রা ছিল যাদব পাকড়াশীর—গান একবার জুড়লে কার সাধ্য নড়ে; ঠায় বসিয়ে রাখবে শেষ রাত অবধি।

পানু বলিল,—যে আজ্ঞে।

—তাই বল্। থিয়েটার দেখেছিস্ কখনো?

—দেখেছি, বাবু; এখানকার বাবুদের।

শুনিয়া মাধব দত্ত অট্টহাস্য করিলেন,—এখানকার বাবুদের থিয়েটার! সে ত' থিয়েটারের ঠাট্টা রে! আমিও দেখেছি। এদের সব পৌরাণিক বাবু; ভীম অর্জ্জুন সবাইকে এরা নিজেদের ঢঙে সাজায়—বুঝলি রে? এরা ভুল করে। কলকাতার থিয়েটার আমি দেখেছি। আমরা বলি থিয়েটার, তারা বলে রঙ্গালয়। রঙ্গালয় নয়, যেন নন্দন-কানন—হারে রে রে ঝম্‌ঝম্ করছে একেবারে! নিজেরা ত সাজেই যাকে যেমনটি মানায়—চ্যাপ্‌টা-নাক মেয়েগুলোকে এমন অপ্সরী সাজায় যে—বুঝলি, পানু?

পানু সাড়া দিল; বলিল,—আজ্ঞে শুনছি।

—শোন্ ভাই। এমন সাজায় মেয়েগুলোকে যে, দেখলে তুই বল্‌বি ওরা জাদু জানে; তুই আর আসতে চাইবিনে। দেখেছিস কখনো?

চ্যাপটানাক মেয়েরা অপ্সরা সাজিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখিবে, সে আর আসিতে চাহিবে না, বাবুর মুখে এমন কথা শুনিয়া পানু টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল আর ভাবিতে লাগিল, বাবু কি!—বলিল,—দেখিনি, বাবু।

—দেখে আসিস একবার; গোজন্ম উদ্ধার হয়ে যাবি। সেখানকার রাবণ বিভীষণের দাদা, এখানকার লরু লায়েকের ভাগনে নয়। আরে এখানে সেখানে বিস্তর—

বলিতে বলিতে মাধব দত্ত ঝপ করিয়া থামিয়া গেলেন। মাধব দত্তের চোখে পড়িল, হাত দশেক দূরে একটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। পথ নির্জন, আর রাত দুপুর। মনিব যাহা অনুমান করিয়া লইলেন তাহা একেবারেই ভুল।

সরস্বতীও তাঁহাকে দেখিয়াছিল; মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া সে একটু পিছাইয়া দাঁড়াইল—

মাধব দত্ত ধীরে ধীরে তার নিকটবর্তী হইলেন; বলিলেন—ছুটো দেখছি। দরদস্তুর করতে হবে, না এক দরে বিক্রয়?—বলিয়া তিনি কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইলেন, এমন নির্ভয়ে যেন অবধ্য দূত তিনি।

পুত্রবতী কুলবধূর সম্মুখে তখন স্বর্গত সপ্ত পুরুষ হাত পাতিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—প্রশ্ন করিতেছিল: যে আমাদের রক্তের ধারা আর নামের স্মৃতি বহন করিবে, আর জল দিয়া তিল দিয়া তর্পণ করিয়া আমাদের শীতল করিবে, সে কই? সুবোধ কোথায়? কেমন আছে সে?

প্রশ্নের উত্তর ছিল না—

ত্রাসে সরস্বতীর মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছিল—

মাধবের প্রশ্নে প্রেতলোক অন্তর্হিত হইয়া ছায়ালোক সহস্রবাহু রাক্ষসের মতো তার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টির সম্মুখে সহসা নাচিয়া উঠিল—কি উদ্দেশ্যে সে চারিদিকে চাহিল তাহা সে নিজেই জানে না; কিন্তু চোখে পড়িয়া গেল একটা লোহার ভাঙ্গা গরাদে; অর্ধ-চেতনা অর্ধ-অচেতনার মাঝেই সে

চক্ষের নিমেষে সেটা তুলিয়া লইয়া মাধব দত্তের গা বরাবর বসাইয়া দিল এক ঘা। ঘা কোথায় পড়িল কে জানে; মাধব দত্ত একবার পাক খাইয়া "মরিছি" বলিয়া ধরাশায়ী হইলেন—বিরাট উদর আকাশে তুলিয়া তিনি নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন....

পানু তফাতে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল—

ঠক্‌ঠক্ করিয়া হাত পা কাঁপিয়া তার হাতের লণ্ঠন মাটিতে পড়িয়া গেল; পরক্ষণেই সে প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিল: খুন, খুন....

এবং দেখিতে দেখিতে সেই জনমানবহীন রাজপথের উপর জনারণ্য যেন মাটি ফুঁড়িয়া গজাইয়া উঠিল। গরমের দিনে মানুষের ঘুম তখনও আঁটে নাই; চতুর্দিকের দরজা খুলিয়া হু হু শব্দে লোক বাহির হইয়া আসিল; শতকণ্ঠে প্রশ্ন হইতে লাগিল: কে মারলে?

পানু বলিল,—ঐ মাগী।

সরস্বতীকে সে চিনিতে পারে নাই।

সরস্বতী তখনও তেমনি দাঁড়াইয়া আছে; সুবোধ যে তখনও ফেরে নাই এ অশেষ উৎকণ্ঠাও তার লুপ্ত হইয়া গেছে—তখন কেবল লোকের কলরব সুদূরাগত অস্পষ্ট একটা গুঞ্জনধ্বনির মতো তার কানে আসিতেছে...

একদিন নানা দুঃখ ও আঘাতে বৃহৎ শ্মশানের মধ্যে বর্তমান পৃথিবীর এই দুর্যোগের নিবৃত্তি হইবে,—তখন যদি মানবসমাজ এই কথা বলে যে, ক্ষমতার মত্ততা, স্বার্থের দারুণ দুশ্চেষ্টা যখন প্রবলতম, মোহান্ধকার যখন ঘনীভূত এবং দলবদ্ধ ক্ষুধিত আত্মম্ভরিতা যখন উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিমে গর্জন করিয়া ফিরিতেছিল, তখনও ভারতবর্ষ আপন ধর্ম হারায় নাই, বিশ্বাস ত্যাগ করে নাই, একমাত্র নিত্য সত্যের প্রতি নিষ্ঠা স্থির রাখিয়াছিল, সকলের ঊর্ধে নির্বিকার একের পতাকা প্রাণপণ দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া ছিল, এবং সমস্ত আলোড়ন-গর্জনের মধ্যে মাভৈঃ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিল,... তবে বহু শতাব্দী হইতে নানা দুঃখ ও অবমাননা সমস্তই সার্থক হইবে,—ধৈর্যের দ্বারা সার্থক হইবে, ব্রহ্মের দ্বারা সার্থক হইবে,—দম্ভের দ্বারা নহে, প্রতাপের দ্বারা নহে, স্বার্থসিদ্ধির দ্বারা নহে।—রবীন্দ্রনাথ।

সঙ্গে লোকজন দাসদাসীও আছে। এইরূপ ভ্রমণকালে সে একটি ছদ্মনাম ব্যবহার করিয়া থাকে, সে নাম—মতিবিবি।

নবকুমার তাহাকে চিনিল না বটে, কিন্তু মতিবিবি তাহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিয়া শীঘ্রই তাহাকে চিনিয়া ফেলিল, এবং সেই মুহূর্তে অন্তরে একটা প্রবল বেদনা ও বাসনা অনুভব করিল। সে-ও আর বিবাহ করে নাই, আগ্রার বিলাস-ঐশ্বর্যে লালিত হইয়া সে এতদিন অতিশয় দুর্নীতিপূর্ণ ভোগসর্বস্ব জীবন যাপন করিতেছিল। আজ তাহার বিবাহিত স্বামীকে দেখিয়া সে পুনরায় দাম্পত্য সুখভোগের জন্য আকুল হইয়া উঠিল, অথবা এইবার সে সত্যই প্রথম প্রেমে পড়িল। সপত্নী কপালকুণ্ডলাকে দেখিয়া যদিও সে তাহার রূপে ও স্বভাব সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইল, তথাপি আশা ছাড়িল না, কারণ সে নিজেও অসামান্য রূপবতী। ইহার কিছুদিন পরে সে আগ্রার ভোগবিলাস ত্যাগ করিয়া সপ্তগ্রামে আসিয়া একান্তে একটি সুসজ্জিত অট্টালিকায় বাস করিতে লাগিল, উদ্দেশ্য—নবকুমারকে তাহার রূপ ও ঐশ্বর্যের দ্বারা বশীভূত করিয়া নিজের সেই কামনা চরিতার্থ করিবে।

এদিকে নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে স্বগৃহে আনিয়া নব সুখের আশায় নূতন করিয়া সংসার পাতিল। কিন্তু কপালকুণ্ডলার প্রকৃতি এমনই যে, সে কিছুতেই সংসার ও সমাজের শাসন, এমন কি—স্নেহপ্রেমের বন্ধনও স্বীকার করিবে না। সে নিজের সুখেও সম্পূর্ণ উদাসীন, অথচ পরের প্রতি করুণাময়ী। নবকুমার যতই তাহার প্রতি প্রেম-বিহ্বল হয় সে ততই কঠিন হইয়া উঠে—সেই বিহ্বলতা তাহার কৃপা উদ্রেক করে মাত্র।

মতিবিবি সকল সংবাদই লইতেছিল। সে নানা ছলে নবকুমারকে নিজগৃহে আনিয়া বহুপ্রকারে তাহার প্রেমভিক্ষা করিল; নবকুমার প্রতিবার তাহা প্রত্যাখ্যান করিল। অবশেষে একদিন এইরূপ সাক্ষাৎকালে, উত্তেজিত ও ব্যথিত মতিবিবির মুখে সে যখন শুনিল যে, সে তাহারই প্রথমা পত্নী পদ্মাবতী, তখন সে আরও ভীত ও চিন্তিত হইয়া সে স্থান ত্যাগ করিল, আর তথায় পদার্পণ করিল না।

মতিবিবি তাহাতেও হতাশ হইল না, বরং আরও কঠিন সংকল্প করিল। অতঃপর সে এক অভিসন্ধি করিয়া নবকুমারের গৃহসন্নিহিত নিবিড় অরণ্যে পুরুষবেশে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল, স্বাধীনপ্রকৃতি স্বেচ্ছাবিহারিণী সরলহৃদয়া কপালকুণ্ডলাকে ঐ বনে সে নিশ্চয় দেখিতে পাইবে, এবং ঐ পুরুষবেশেই তাহার সহিত এমনভাবে মিশিবে, যাহাতে তাহাদের সেই বন্ধুত্ব ক্রমে নবকুমারের চিত্তে ঘোরতর সন্দেহ উদ্রেক করে। এইরূপে কপালকুণ্ডলাকে স্বামীপ্রেম-বঞ্চিত করিতে পারিলেই সে অনায়াসে নবকুমারকে জয় করিতে পারিবে—ইহাই তাহার বিশ্বাস।

হঠাৎ দুইটা সুযোগ ঘটিল। বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া সে সেই সমুদ্রতীরবাসী কাপালিকের দেখা পাইল। কপালকুণ্ডলা কর্তৃক নবকুমারের উদ্ধারসাধনের পরে সেই রাত্রেই কাপালিক তাহাদের সন্ধানে একটা বালুস্তূপের শিখরে আরোহণ করিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল; ঐ স্তূপের তলদেশ বর্ষার জলস্রোতে একদিকে ক্ষয় হইয়া গিয়াছিল, কাপালিক তাহা লক্ষ্য করে নাই, সেইক্ষণে সহসা স্তূপসহ ভূপতিত হইয়া তাহার দুইবাহু ভগ্ন হইয়া যায়। তথাপি সেই অবস্থাতেও বহুসন্ধানের পরে এতদিনে সে নবকুমারের বাসস্থান আবিষ্কার করিয়াছে, ঐ বনের মধ্যেই সে পুনরায় তাহার আসন করিয়াছে; এবার সে কপালকুণ্ডলাকেই বলি দিবে,—এতদিন দেরী করিয়াছিল বলিয়াই দেবী তাহাকে ঐ শাস্তি দিয়াছেন, আর সে ভুল করিবে না। মতিবিবি এই কাপালিকের দ্বারা কিছু সাহায্য পাইবার আশা করিল—দুইজনে একটা ষড়যন্ত্র চলিল।

দ্বিতীয় সুযোগ এই যে, ঠিক ঐ সময়ে কপালকুণ্ডলা তাহার ননদিনী শ্যামাসুন্দরীর দুঃখমোচনের জন্য—

তাহাতেও চরিত্রগুলি সাক্ষাৎভাবে সংশিষ্ট নয়; অর্থাৎ পাত্রপাত্রী নিজ নিজ স্বভাব বা প্রবৃত্তির বশে যে কর্মজালে জড়াইয়া পড়ে, ঐ ঘটনাজাল সেইরূপ একটা রসবন্ধ নহে—ঘটনাগুলি দৈবের মত বাহির হইতেই ঘটে, এবং তাহার সংঘাতে চরিত্রগুলি যেন অভিভূত হইয়া তাহাদের গূঢ়তর প্রবৃত্তি-প্রকাশ করিয়া ফেলে

এইজন্য উপন্যাসহিসাবে কপালকুণ্ডলা বিশেষ নৈপুণ্য দাবী করিতে পারে না। মাত্র একটি কালানুক্রম-সূত্রে কতকগুলি ঘটনা গ্রথিত হইয়াছে, এবং তন্মধ্যে এমন কয়েকটি সংস্থিতির (situation) সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাতে ঐ রোমান্টিক কাব্যকল্পনা একপ্রকার নাটকীয় রস রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। নাটকহিসাবে দেখিলে, ইহার ঘটনাচক্র (plot বা action) যে চারিটি খণ্ডে বা অঙ্কে নিঃশেষ হইয়াছে, তাহার প্রথমটিতেই নাটকের crisis বা নায়ক-ভাগ্যের সেই সঙ্কট মুহূর্ত দেখা দিয়াছে—যাহাকে তাহার জীবনের একটা গুরুতর সন্ধিক্ষণ বলা যাইতে পারে। নবকুমারের সহিত কপালকুণ্ডলার বিবাহই সেই crisis, তাহাতে নায়ক জয়লাভ করিয়া যেন সৌভাগ্যের পথে পদার্পণ করিল, কিন্তু তাহার পরেই ভিন্নমুখে অবতরণ, এবং Catastrophe বা পূর্ণ-পতনের সূচনা।

উপন্যাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে সেই catastrophe (পতন)-র বীজ দেখা দিয়াছে ও দ্রুত অঙ্কুরিত হইয়াছে। মধ্যে গতি-নিবারণের একটু সম্ভাবনা জাগিয়াছিল—হয়ত নবকুমার বাঁচিয়া গেল, কারণ মতিবিবি তখনও একটা অতিশয় উচ্চাশা পোষণ করিতেছিল; কিন্তু শীঘ্র তাহা ধূলিসাৎ হওয়ায়, এই ক্ষণ-রুদ্ধ পতন-বেগ শেষ খণ্ডে দুর্বার হইয়া উঠিয়াছে। Crisis ও Catastrophe-র মধ্যে ঐ যে গতিবেগের একটু বিশ্রাম এবং তজ্জনিত একটা আশা বা সংশয়ের অবকাশ, উহাও একটা নাটকীয় কৌশল; এই উপন্যাসেও গ্রন্থকার সেই কৌশল করিয়াছেন—আগ্রার রাজ-অন্তঃপুরের ষড়যন্ত্র এবং মেহেরুন্নিসাকেও এই জন্য আবশ্যক হইয়াছে। অতএব 'কপালকুণ্ডলা'র ঐ নাটকীয় প্রকৃতিই লক্ষণীয়—"কপালকুণ্ডলা tale নহে, উপন্যাস নহে, উহা গদ্যরীতির কাব্য-নাটক, গ্রীক নাটক"—এ উক্তি যথার্থ। আখ্যানের জটিলতা থাকিলে উহা গ্রীক নাটক হইতে পারিত না। তথাপি নাটকহিসাবেও ইহার গঠনে একটু অসামান্যতা আছে, কারণ ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, প্রথম অঙ্কেই ইহার crisis শেষ হইয়াছে—বাকি সমগ্র ঘটনাধারা একটা বিলম্বিত catastrophe মাত্র।

এইবার ইহার অন্তর্গত চরিত্রগুলির কথা। কাপালিকের চরিত্র স্বাভাবিক বা সামাজিক মানব-চরিত্র নয়, তাহা আমরা দেখিয়াছি। সে একপ্রকার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার আশায় সকল মনুষ্য-সুলভ সংস্কার বিসর্জন দিয়াছে; তাহার যে ইষ্ট-দেবতা—তন্ত্রে তাহার বহুতর নাম আছে; সেই মহাশক্তিকে আরাধনায় তুষ্ট করিয়া সেও মহাশক্তিমান হইতে চায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে একটা বিকৃতমস্তিষ্ক নর-পিশাচমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। তাহার ঐ সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন এবং দুই একটি তত্ত্বকথার মত বচন শুনিয়া, এবং তাহার অসীম দেহবল ও নিষ্ঠুর মনোবল দেখিয়া প্রথমে যেমন ভয় ও বিস্ময় জাগে, পরে তাহার দুরবস্থা দর্শনে তেমনই ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। একটা অমানুষিক সংকল্প-সিদ্ধির জন্য তাহার যে একাগ্রতা তাহাও যেন একটা 'fixed idea' বা একপ্রকার মানসিক ব্যাধির মত। গ্রন্থকার এ-চরিত্রে মনুষ্যপ্রকৃতির বিকৃতিই বিশেষভাবে চিত্রিত করিয়াছেন; এ চরিত্র স্বাভাবিকও নয়, আবার স্বভাবকে অতিক্রম করার যে মহত্ত্ব তাহাও ইহাতে নাই।

কপালকুণ্ডলা-চরিত্রে অসাধারণত্ব আছে, তাহার কারণ পূর্বে ব্যাখ্যা করিয়াছি। তথাপি, গ্রন্থকার তাহার সেই অনমনীয়, অতিমানবীয় প্রকৃতির মধ্যেও যতদূর সম্ভব রক্তমাংসের বাস্তবতা রক্ষা করিয়াছেন। প্রথমতঃ, নারী-প্রকৃতিসুলভ দুর্বলতা হইতে সে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়; পালক-পিতার প্রতি কন্যার মত স্নেহভক্তিও তাহার আছে। দ্বিতীয়তঃ, তাহারও একপ্রকার ধর্মবিশ্বাস ও তজ্জনিত মিথ্যা

লেখক সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরুত্তর। এ চরিত্রের এইরূপ পরিবর্তন সহসা অসঙ্গত বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু একটু ভিতরে দৃষ্টিপাত করিলেই ইহার কারণ অতিশয় স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। বঙ্কিমচন্দ্রের কবিদৃষ্টি অভ্রান্তই আছে; তাঁহার সৃষ্টি কল্পনা সৃষ্টিই করে এবং সে কল্পনা অব্যর্থ বলিয়া তিনি নিজে এই সকল গভীরতর কারণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। নবকুমারের এই অস্বাভাবিক চরিত্রভ্রংশ একটা অস্বাভাবিক কারণেই ঘটিয়াছে—সে কারণ কপালকুণ্ডলা, সে-ই সকল অস্বাভাবিকতার নিদান। কিন্তু ইহার একটা স্বাভাবিক কারণও নির্দেশ করা যায়। নবকুমারের সেই প্রথম বিবাহের পরিণাম এমনই লজ্জাজনক ও দুঃখকর হইয়াছিল—তাহার মত পুরুষের হৃদয়ে তথা আত্মসম্মানে, এমন আঘাত লাগিয়াছিল যে, তাহার ফলে সে আর বিবাহ করে নাই; ইহা সেকালের পক্ষে একটু অসাধারণ। সম্ভবতঃ নারীর সহিত ঐ সম্পর্ক সে অতঃপর ভয় ও সন্দেহের চক্ষে দেখিত। কপালকুণ্ডলার প্রতি তাহার যে আকর্ষণ তাহার মধ্যেও এই সংস্কার জাগ্রত ছিল; তাহার অন্তরের অন্তরে যেন একটা ভয় ছিল যে, নারী-সংস্পর্শ তাহার পক্ষে কল্যাণকর হইবে না। পরে বিবাহবিমুখ নবকুমার কপালকুণ্ডলার অসাধারণ রূপ ও অদ্ভুত চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া, এবং তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতার বশেও—বিবাহ করিল; তখন এতদিনের নিরুদ্ধ, অথচ সুস্থ ও স্বাভাবিক যৌনপিপাসা যেন প্রকৃতির প্রতিশোধের মত তাহাকে আক্রমণ ও অভিভূত করিল। তথাপি তাহার প্রথমা পত্নীর সেই স্মৃতি, সেই দাহচিহ্ন সে ভুলিতে পারে নাই; ফলে সে এই স্ত্রীর সম্বন্ধেও সন্দেহ-কাতর হইয়া ওঠে। বাহিরেও যেমন সেই পদ্মাবতী তাহাকে এখনও অনুসরণ করিতেছে, ভিতরেও সেই পত্নীর স্মৃতি তাহার প্রেমকে পঙ্গু করিয়া তাহার চরিত্রের এমন অবনতি ঘটাইয়াছে।

মতিবিবি-চরিত্র লেখক নিজেই এমন সবিস্তারে ও স্পষ্ট বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন এবং নিজেই তাহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার পর সে বিষয়ে অধিক কিছু বলিবার নাই বটে, তথাপি এই চরিত্র উপন্যাসের এক ভাগে এমন রসসৃষ্টি করিয়াছে যে, পাঠকের দিক দিয়া ওই চরিত্রের কাব্য-সৌন্দর্য-বিচার করিবার পৃথক প্রয়োজন আছে। এই চরিত্রসৃষ্টিতে নারীপ্রকৃতি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর কবি-দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। কপালকুণ্ডলা-চরিত্রে তাঁহার দৃষ্টি একটা ভাববস্তু বা তত্ত্বরসে নিবদ্ধ ছিল, এখানে তাহা মুক্তিলাভ করিয়াছে—সেখানে যাহার অবকাশ ছিল না, এখানে তাহার পূর্ণ অবকাশ মিলিয়াছে। কাহিনীর দিক দিয়া দেখিতে পাই, যে মুহূর্তে মতিবিবির আবির্ভাব হইয়াছে সেই মুহূর্তেই উপন্যাসের আখ্যান-গ্রন্থি দৃঢ়তর হইয়াছে; নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার বিবাহিত জীবনের ঠিক প্রবেশপথে সেই পথের অন্তও দেখা দিয়াছে। মতিবিবি যেন নবকুমারের প্রাক্তন কর্মের দুশ্ছেদ্য বন্ধন—সেই কর্মশৃঙ্খলই এই উপন্যাসের ঘটনাকে প্রসারিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। জীবনে এমনই করিয়া গ্রন্থি পড়ে এবং গ্রন্থিমোচন হয়; যেন তাহার আদ্যন্ত একটা অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের কর্মধারায় সুবিন্যস্ত ও সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া আছে। জীবনের আলেখ্যরচনায় যে কবি এই তত্ত্বটি আমাদের দৃষ্টিগোচর করেন—আদ্য, মধ্য ও অন্তকে এমনই একটা নিয়মাধীন দেখাইতে পারেন, তিনিই জীবনের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর; ঐ প্লট বা আদ্যন্তযুক্ত কাহিনীনির্মাণই সেইরূপ সৃষ্টি-প্রতিভার প্রধান কৃতিত্ব।

আবার, এই চরিত্রই উপন্যাসের রসবস্তুকেও নানাভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছে। প্রকৃতি ও পল্লীসমাজের যে মূল বর্ণভূমিকায় এই আখ্যান চিত্রিত হইয়াছে, তাহার উপরে একটি বিপরীত বর্ণের অত্যুজ্জ্বল ছটা উদ্ভাসিত করিয়াছে এই মতিবিবির আবির্ভাব। উহার দ্বারা মোগলযুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি, বিলাস ও ঐশ্বর্য, বৈদগ্ধ্য ও শিষ্টাচার যেমন ঐ পল্লী-প্রতিবেশের মধ্যে আরও প্রেক্ষণীয় হইয়াছে, তেমনই মতিবিবি-চরিত্রে নারীপ্রকৃতির যে আরেক রূপ—তাহার সেই দুরন্ত ভোগ-পিপাসা—তাহাও কপালকুণ্ডলা

এই বিরোধ

সিগ্‌ফ্রিড্‌ সিয়োর্ট অনুবাদক : শ্রীশিশির সেনগুপ্ত

[কবি হিসাবে সাহিত্যিক জীবন সুরু করলেও আসলে হুকহল্‌মের এই লেখক ছোট গল্প ও উপন্যাসেই তাঁর রচনার মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। তিনি সভ্যতার কবি, সহরের রাস্তাপথে তাঁর রচনার পটভূমিকা প্রসারিত, সহরের বস্তুজীবনের বিচিত্র ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যেই তাঁর কবিতার ঝঙ্কার ; কাব্যাদর্শের এই স্বীকৃতি নিয়ে আরম্ভ করলেও পরবর্তী কালে তিনি নাগরিক মানুষকেই তাঁর গল্প উপন্যাসে প্রধান করেছেন। আর সেই কারণেই সম্ভবতঃ দুঃখবাদ তার রচনার উপজীব্য। অবশ্য আরো অগ্রসর হয়ে তিনি বিপরীত ভাগ্যের বিরুদ্ধে মানুষের বলিষ্ঠ মননশীলতার চূড়ান্ত জয়কেই প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন। 'ডাউনষ্ট্রীম' নামক উপন্যাসই লেখকের সর্বোত্তম সৃষ্টি বলে সমালোচক মহলের ধারণা। সমাজের যারা নীচুতলার বাসিন্দা তাদের জীবন নিয়েই আশ্চর্য শৈলীর সঙ্গে তিনি লেখনী চালনা করেছেন। করেছেন তরবারীর তীক্ষ্ণতা নিয়ে। অবশ্য এক শ্রেণীর পাঠকের মত যে ছোট গল্পের মধ্যেই লেখকের প্রতিভার সর্বোত্তম বিকাশ ঘটেছে।]

আজো নিজের ভার বইতে শেখেনি ছেলেটি। তবু সে-ই সন্তানের বাপ হবে। রেল লাইনের পাশের পার্কে বসে মেয়েটি এই খবর পৌঁছে দিয়ে গেছে তার কাণে। জন্ম-মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে-ওঠা এই আশ্চর্য অনুভূতির মুখোমুখী হয়ে ছেলেটির কেমন বিচিত্র বোধ আসে মনে। আগন্তুক শিশুটি অনাগত দিনরাত্রির জন্য কি মধুর রোমাঞ্চ আনবে ভাবতেই হৃদয়ের পাত্র গোপনে ভরে ওঠে।

ছেলেটির ঘরে বসে কথা হয়। অনর্গল কথা কয়ে ছেলেটি সাহস দেয় মেয়েটিকে। যদিও নিজের কথার অপদার্থতা সম্বন্ধে নিজেরই বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে ওঠে মনে। বাতায়নের বাইরে ঋজু দীর্ঘ পপলার গাছের ছায়া পড়েছে মাটিতে। মুমূর্ষু চাঁদের একটা মৃত্যুশ্বেত আলো পড়েছে মেয়েটির মুখে। নির্বাণী মেয়েটি আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকে। কি জানি হয়ত কাঁদছে, ছেলেটি মেয়েটির ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে। চোখের দিকে তাকাতেই কেমন একটি অস্বস্তি হয় মনে।

সামান্য একটি ঘটনার ঝাপট লাগতেই মেয়েটির চোখে কেমন এক বিদেশী আলো আশ্রয় নিয়েছে, বদলে দিয়েছে চেনা জগতের সীমানাকে। যাকে চিনত ছেলেটি, এ মেয়ে সে নয়। নূতন পরিপ্রেক্ষিতে একে আবার চিনতে হবে, জানতে হবে, জয় করতে হবে।

জানলার পর্দা নামিয়ে দিয়ে ছেলেটি ঘরের আলো জ্বাললে। কাঁধের দিকে হেলানো মাথার পিছনে চুলের রাশি শ্লথ হয়ে পড়েছে। গায়ের জামার প্রান্ত ঘেঁসে কণ্ঠের ভঙ্গীটি যেন চেনা বলেই মনে হয় না। মেয়েটির সামনে দাঁড়িয়ে ছেলেটির চোখ যেন কাকে খুঁজে বেড়ায়।

'আমার জন্যেই কি দুঃখ পাচ্ছ তুমি? কথা কও। তোমাকে চিনতে দাও। কিছু বল।'

এতক্ষণে মেয়েটি হাসল। দিগন্তের ওপার থেকে।

'তোমায় আমার এত ভাল লাগে এরিক। এই ছোট্ট ঘরে তোমায় নিয়ে....অথচ তোমায় আমায় কত তফাৎ!'

পায়ের জুতা খুলে মেয়েটি জামার বোতামে হাত দিলে।

আরো কাছে ঘেঁসে এরিক মেয়েটির দেহের ভার নিলে। চোখে, হাতে, মুখে মেয়েটির সর্বাঙ্গের স্পর্শ নিতে লাগল। মেয়েটিও আদরের প্রতিদান দিতে লাগল। কিন্তু তার মধ্যে প্রীতির চেয়ে দাক্ষিণ্যই যেন বেশী।

ঘরের আলো নিভিয়ে ছেলেটি আগুন গনগনে করে দিলে। ততক্ষণে অন্তর্বাস অবধি খুলে মেয়েটি নির্মল নগ্নতায় সুন্দরী হয়ে দাঁড়িয়েছে

নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে ছেলেটি চেয়ে চেয়ে দেখছে। অলজ্জতায় মেয়েটি মুখর হয়ে উঠেছে। এ মেয়ে মা হবে কে বলবে?

চুলে হাত দিতেই বুকের ঔদ্ধত্য প্রখর হয়ে উঠল। মাথার জাল খুলেই গিছল, আস্তে পিছনে দিলে মেয়েটি।

'আমি চলে গেলে তুমি দুঃখ পাবে?'

মেয়েটির কণ্ঠে প্রগলভতা। খুব কাছে এসে ছেলেট তার হাত ধরলে। মেয়েটির চোখে যেন দূর দিগন্তের ইসারা। ধরা দিলেও যেন ধরতে পারা যায় না।

পরদিন থেকে মেয়েটির মধ্যে এক অপ্রত্যাশিত চাঞ্চল্য দেখলে ছেলেটি। মনে মনে আতঙ্ক হোল হয়ত বা শেষ অবধি দুঃখ সে একাই পাবে। নিজেকে সে বোঝায় যে এ পরিবর্তন অস্বাভাবিক নয়। এখন মেয়েটির মধ্যে দুটি আত্মা। দুটি হৃদয়ের ব্যঞ্জনা মুখর হয়েছে ওর কথায়, ভঙ্গিমায়।

একদিন সকালে মেয়েটি ওর ঘরে এল। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দ্রুতকণ্ঠে বললে,—'আমি আমেরিকা যাচ্ছি।'

'আমেরিকা। কিন্তু ছেলে—ছেলে কোথায়—?'

'নিজের অবস্থা বুঝেই আমি শিকাগোতে আমার এক আত্মীয়ের কাছে চিঠি লিখি। নিঃসন্তান স্বামী-স্ত্রী আমার শিশুকে গ্রহণ করতে রাজী হয়েছেন। সেখানেই আমার ছেলে হবে। তোমার-আমার কথা ভেবেই আমি এই ব্যবস্থা করলাম। তবে তাঁরা একটি সর্ত দিয়েছেন, অবশ্য আমি রাজীও হয়েছি। ছেলে আমাদের কথা কিছুতেই জানতে না পারে।'

দ্রুতকণ্ঠে কথা কইতে কইতে মেয়েটি সপ্রশ্ন চোখে ছেলেটির দিকে তাকালে।

ছেলেটি জানত এই প্রশ্নের কি উত্তর আশা করছে ভাবী মাতৃত্ব।

'তুমি যাবে না। যত শীঘ্র সম্ভব ব্যবস্থা করে আমরা স্বামীস্ত্রী হয়ে এখানে বাসা বাঁধব। তোমার চিন্তা কি?'

কিন্তু মেয়েটি ওর একটি কথাও শুনল না। প্রশ্নমান চোখে অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ছেলেটির গলা কাঁপতে থাকে: 'তোমার মত সেই ছেলেটির উপর আমারও দাবী কম নয়—আমি চাইনা যে।'

যেন প্রেতকণ্ঠে মেয়েটি বললে—'তুমি জান যে তোমার দাবী—,

ছেলেটি বুঝলে, মেয়েটি হয় কৌতুক করছে আর নয়ত নূতন মাতৃত্বের সম্ভাবনায় প্রলাপ বকছে আনন্দে।

কাছে এসে মেয়েটিকে সে আদরে অতিষ্ঠ করতে লাগল।

'তুমি যাবে না—তোমায় আমি যেতে দেব না'

'সব বাঁধা হয়ে গেছে। পরশু যাবার দিন হয়েছে।'

- মেয়েটি তেমনি অতল থেকে কথা কইলে—'চিঠি লিখো তুমি আমায়।'

শেষ অবধি ছেলেটি সব বুঝতে পারলে। একটা রুদ্ধ বেদনায় তার মুখ নীল হয়ে উঠল।

বিদায়ের কোন কথা না বলেই মেয়েটি চলে গেল।

তার নিজের ছেলেকে নিয়ে ঐ দস্যু মেয়েটা চলে গেল। অথচ তাকে আটকাতে পারলে না সে।

ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে অনেকক্ষণ অবধি ছেলেটি পথে পথে ঘুরে বেড়ালো বিভ্রান্ত ভাবে। তারপর এক সময়ে মেয়েটির ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে তার চমক ভাঙল। দরজার চাবীতে হাত দিয়ে সে নেমে চলে এল। পথের ধারের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে নিজের অস্বস্তিকে সে দমন করতে লাগল।

সেইদিন সন্ধ্যায় নিজের ঘরের রুদ্ধ দরজার বাইরে সেই পরিচিত প্রত্যাশিত পদধ্বনি শুনলে ছেলেটি। করাঘাত শুনলে দরজায়, কিন্তু উঠে স্বাগত করলে না।

'ঘরেই রয়েছ, তবে দরজা খুলছ না কেন?'

এতক্ষণে ত্রস্ত হোল ছেলেটি। দরজা খুলে মেয়েটির

এমনি একদিন সকালবেলা ঘুম ভেঙে উঠে প্রথম সে দেখলে সূর্যকিরণ। নির্মল জ্যোতির্ময়তায় চিত্ত প্লাবিত হোল। যেন দুঃখসমুদ্রের মাঝখান থেকে চিত্তের সূর্যমুখী আকাশের স্নেহে বিকশিত হয়ে উঠল। লুপ্তির কুয়াসা সরে যেতেই আনন্দময় এক জগতে নূতন করে আবিষ্কার করলে সে নিজেকে।

শীতের দীর্ঘ সন্ধ্যায় পথে প্রান্তে ঘুরে বেড়ালে সে অনেকক্ষণ। একটা নিঃশব্দ প্রসন্নতায় মন আশ্বস্ত হয়ে আছে। পুরাণো দিনের অর্থহীন দুঃখবেদনার জগৎ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে সে নতুন হয়েছে। এখন থেকে আর ঝড়ের ঝাপট নয়—তরঙ্গায়িত দিন রাত্রির শান্তি।

আজ মনের মধ্যে এক না-জানা দৃঢ়তা এসেছে। সব দুঃখ, চাঞ্চল্য আর মোহের উপরে যে অনির্বাণ আলোক, তার দ্যুতি এসেছে মনের মধ্যে। নিজের পরিবেশের নিঃসঙ্গতায় আর ভয় নেই। এখন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে সে সুস্থ জীবন যাপন করতে পারবে। নিজেকে নিয়ে বিলাস করে দিন তার কাটবে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

প্ল্যাটফর্মের বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মেয়েটি চেনা সহরকে দেখবার চেষ্টা করলে। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে অবশেষে যে পথে সে পৌঁছল তারই পাশে এরিক বলে ছেলেটি বাস করত।

মনের সঙ্গে যুদ্ধ করলে তার গর্বিত নারীত্ব। এরিকের বাড়ী যাওয়া যখন স্থির, তখন মেয়েটি গাড়ী ডেকে বাড়ী ফিরল।

নিজের ঘরে ঢুকেই আয়নায় প্রতিবিম্বিত করলে সে নিজেকে। দেহের সেই তারুণ্য আজো ক্ষয় হয়নি। মুখের সেই উদ্ধত সৌন্দর্য স্তিমিত হয়নি এতটুকু। নিজেকে বিচার করে দেখলে মেয়েটি। কই, মনের সমর্পণ তো চোখের দৃষ্টিকে কোমল করতে পারেনি।

এরিকের ঘরে দুদিন পরে এল মেয়েটি।

'তোমার অসুখ শুনে এলাম।'

ছেলেটি হাসল। জোয়ার-নেমে-যাওয়া হাসি।

'সমুদ্র আর সহর দেখে এলে?'

'এত রোগা হয়ে গেছ তুমি। আমার জন্যেই কি দুঃখ পেলে তুমি?'

'প্রথম দিকে তোমার জন্যে দুঃখ পেয়েছি অস্বীকার করব না। বসন্তের মত তুমি আমার মনকে খুসীতে উপচিয়ে দিতে। কিন্তু তোমার সব দানের পিছনে উঁকি মারত শীতের রুক্ষতা। সেই দুঃখকে আমি জয় করেছি। এখন আমি শান্তি পেয়েছি। শূন্যতার মধ্যেও আমার মন নিরাসক্ত হয়ে থাকতে শিখেছে।'

মেয়েটি পাশের চেয়ারে বসে বিগলিত কণ্ঠে বললে—'আমিও সুখী হইনি।'

ক্লান্ত চোখ তুলে ছেলেটি বললে—'এ ত সুখের কথা নয়। সুখ আর আমি চাই না। সুখ আম ঘৃণা করি। দীর্ঘ দিন ধরে যে সুখের বেঁচে থাকা তা আমি চাই না। আমি চাই আনন্দ—মনের গভীর অন্তহীনতা থেকে যে আনন্দ ক্ষণিকের জন্য মনকে দোলা দেয়—কিন্তু ধরা দেয় না।'

আনন্দময়তা। কে জানে, কখন কেমন করে এ আনন্দ মনকে তুলে ধরে মৃত্তিকার গ্লানি থেকে। মন যেন লঘু পক্ষপুটে উড়ে যেতে চায়। সারা জীবনের অভিযোগ একটি মুহূর্তের দাক্ষিণ্যে সার্থক হয়ে ওঠে।

মেয়েটির দিকে স্মিত হেসে ছেলেটি আবার বললে—'বয়স ছিল কম, তোমার কাছে দুঃখের কথা বলতাম। সে তুমি বুঝতে না। আজ তোমায় বলছি আনন্দের কথা। তাও হয়ত তুমি বুঝছ না। তা হোক্। তবু আগের চেয়ে তুমি কত লাবণ্যময়ী হয়েছ। আমি তাই দেখছি।'

'তোমার কি খুব অসুখ হয়েছিল?'

'অসুখের সময় শুয়ে শুয়ে ভাবতাম, হয়ত বুড়ো হয়ে মরা আমার ভাগ্যলিপি নয়। আজ বুঝছি—'

বিছানার উপর এলিয়ে পড়ে ছেলেটি ক্লান্ত গলায় বললে—'এবার তুমি যাও। তোমাকে বড় শ্রান্ত দেখাচ্ছে।'

আগষ্টের দুইটি দিন

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

খৃষ্টাব্দ ১৯৪২-এর ৯ই ও খৃষ্টাব্দ ১৯৪৬ এর ১৬ই আগষ্ট আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় বলিয়া বর্ণিত থাকিবে। বর্ণভেদ, রুচিভেদ ও প্রকারভেদ থাকিলেও ঐ দুইটি দিন সাধারণ ভারতবাসীর চিত্তপটে 'ভুলিবার নহে' বলিয়া লিখিত হইয়া গিয়াছে এবং পাষাণে খোদিত লিপির মত মুছিবার নহে, মুছিবে না বলিয়াই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। বর্তমান শতাব্দীর দুইজন প্রধান নেতার হাতের ছাপ ও অন্তরের ভাষা ঐ দুইটি তারিখের প্রত্যঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এমন একাকার হইয়া গিয়াছে ঐ দু'টি দিনের সঙ্গে ঐ দুই নেতার নামও চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবে।

১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট বোম্বাই সহরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে, গান্ধীজীর "কুইট ইণ্ডিয়া" প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। "কুইট্ ইণ্ডিয়া" শব্দসমষ্টি আজ বিশ্বজনবিদিত ও বিশ্বমানববন্দিত হইয়াছে; কে না বুঝে এমন অজ্ঞ ভূলোকে নাই। প্রস্তাব গৃহীত হইলেও "কুইট ইণ্ডিয়া" কার্যকরী করিবার সময়, সুবিধা ও সুযোগ কংগ্রেসের হয় নাই। যাঁহার প্রস্তাব, তিনি যদিচ এই বীজমন্ত্রের সাধন অথবা শরীর পতন করিবার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষকে আহ্বান দিয়াছিলেন—'ডু অর ডাই'—করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'র জন্য প্রস্তুত থাকিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু কার্যক্রম নির্ধারণের অবসর তাঁহারও মিলে নাই। বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সন্ধি-সূত্রের সন্ধান বিফল হইলে 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'র কার্যসূচী দেশবাসীকে জ্ঞাত করাইবার অভিলাষ গান্ধী সেই রাত্রেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সে অবকাশ তাঁহার হয় নাই। আমি তখন বোম্বাইতে; আমার মনে আছে, রাত্রি পৌণে বারটার সময় প্রস্তাব গৃহীত হয়। দেশী, চাল-চুঁয়ান কালীতে তুলোট কাগজে লেখা প্রস্তাব শুকাইতে না শুকাইতে ওয়ার্কিং কমিটিকে "তোল তল্পী, চল বাঁধাগাছি" করিতে হইয়াছিল। "যদি নিশি পোহাইত, কুমুদ মুদিত হোত, শশী যেতো নিজস্থান" সেকালের টপ্পা গানের অবস্থা হইবার পূর্বে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু দিদিভাইর ভাষার দশুধাবনের দ্রব্যসামগ্রী গুছাইয়া লইয়া নিরুদ্দেশযাত্রা করিতে হইল; গান্ধীজীও বাদ পড়িলেন না। সূর্যোদয়ে শয্যাত্যাগে জানা গেল (দেখা গেল বলিলে আমার পক্ষে আরও ঠিক বলা হইবে) যে 'শূন্য যে শয্যা, শূন্য যে ঘর'।

আচম্বিতে ও আকস্মিক নিদারুণ আঘাতে প্রথমটা মানুষ হতবাক্ হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিল। বিশাল জনসঙ্ঘের একাংশ—শিক্ষিত, ভদ্র ও সুস্থচিত্ত ব্যক্তিবর্গ নিঃসংশয়ে ধরিয়া লইয়াছিলেন যে বড়লাট বাহাদুর অনতিবিলম্বে গান্ধীজীকে ডাকিয়া যুদ্ধকালে "কুইট ইণ্ডিয়া" আন্দোলনের বিপজ্জনক অপকারিতা বুঝাইয়া দিয়া অন্ততঃ যুদ্ধকালটা নিরস্ত থাকিতেই বলিবেন। নিশান্তে প্রতীতি জন্মিল যে তাহারা বিলাতের চার্চিল ও ভারতের লিনলিথগোর মতি-গতির স্বরূপ বুঝিতেই ভুল করিয়াছিলেন। ভারতে তখন লক্ষ লক্ষ অস্ত্রধারী শস্ত্রপাণি হামেহাল হাজির—বৃটিশ, মার্কিন, আফ্রিকান, ক্যানেডিয়ান—কে নাই ও কে নহে? "ডু অর ডাই"য়ের উতোর "নাউ অর নেভার" হাঁকিবার এমন সুবর্ণ সুযোগ আর কবে পাওয়া যাইবে? দুইশত বৎসরের ইতিহাসমধ্যে ৯ই আগষ্টের মত শুভদিন বৃটিশের পঞ্জিকায় আর আসে নাই।

বিস্ময়ের মোহ অবসানে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রভঞ্জন বহিয়া গেল প্রবল স্বননে প্রবল বায় দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্যন্ত কম্পান্বিত। উতলা বাতাস মাতালের মত টলিতেছে ও হাঁকিয়া হাঁকিয়া ফিরিতেছে "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" কি করিতে হইবে কেহ জানে না ; কেহ কোন নির্দেশ পায় নাই, অথচ এই অভ্রভেদী অবিমৃষ্যকারিতা ও হঠকারিতা নিরুপদ্রবে মেষ-শাবকের মত সহ্য করিবে ইহাও পরিপাক হয় না। চার্চিলগোষ্ঠি নাগালের বাহিরে না হইলে "ডু অর ডাই" র পাবকশিখায় তাঁহারাও অব্যাহতি পাইতেন কি না সন্দেহ, তাঁহারা সীমার বাহিরে, স্পর্শাতীত। সীমাভ্যন্তরে চার্চিল লিনলিথগো ও বৃটিশ সংশ্লিষ্ট সমাগের দিকেই আক্রোশাগ্নি পধাবিত হইল চার্চিলগোষ্ঠি থানা-পুলিস, ফাঁড়ি, চৌকি রেল তারঘর সাহায্যেই স্বেচ্ছাচার পরিচালিত করিয়া থাকে, সেইগুলাই ভস্মীভূত ধ্বংস হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে বোম্বাইতেও ট্রাম পুড়িল কলিকাতাতেও ট্রাম-সৎকার হইল। অথচ ট্রাম চার্চিল বা লিনলিথগোর প্রত্যক্ষ অথবা পৈতৃক সম্পত্তি ছিল না। কিন্তু দারুণ চিত্তবিক্ষোভের সময়ে চুলচেরা সূক্ষ্মবিচারের কথা মনে থাকে না। বৃটিশের জ্ঞাতিগোত্রের সম্পর্কচ্ছেদই তখনকার লক্ষ্য। কলিকাতায় কত ট্রাম পুড়িয়াছিল জানি না বটে, তবে কিছুকাল পর্যন্ত ট্রামের সংখ্যাল্পতা তথা স্বল্প সংখ্যক ট্রামে সহরবাসীর লাঞ্ছনার গুরুত্ব দেখিয়া এরূপ আশঙ্কা হইয়াছিল যে মোটা অঙ্কেই ঘা পড়িয়াছে। এ কথাটাও এখানে বলা অসঙ্গত হইবে না যে ট্রাম-বাস-মোটর সৎকার করিয়া সাম্রাজ্যবাদের অবসান হয় না, নিজেদের কষ্ট ও দুর্দশাই বৃদ্ধি পায়। এ কথাটা এখন এবং ভবিষ্যতের উদ্দেশে বলা যাইতে পারে ; তখনকার দিনে এমন কথা উচ্চারণ করিবার সাহস থাকিলে সতীদাহ প্রথা বিস্মৃত হইয়া সহমরণে যাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইত। আজ (১৯৪৭ সালে) গভর্ণমেণ্টের সম্পত্তি সম্পর্কেও সেই কথা খাটে। একটি ডাকঘর পুড়িলে, একটি রেল লাইন নষ্ট হইলে অথবা পুলিশ ফাঁড়ী ভস্মীভূত হইলে দেশের লোকেরই সমূহ অনিষ্ট। দেশের লোকের অর্থেই সেগুলির পুনর্গঠন হইবে ; দেশের কল্যাণকর কাজের বরাদ্দ হ্রাস পাইবে।

কিছুদিন পর্যন্ত ধ্বংসযজ্ঞ চলিয়াছিল। আগেই বলিয়াছি, সে সময়ে যত শস্ত্রপাণি সৈন্য সামন্ত, যত অস্ত্র শস্ত্র, যত কামান, যত বিমান অগ্নিযান ভারতবর্ষে ছিল, (অবশ্য মাতুলালয়ের দৌলতে।) তেমন সমারোহ বোধ হয় কুরুক্ষেত্রোত্তর কালে ভারতে আর কখনও হয় নাই। ক্ষিপ্তাপ তেজমরুদ্ব্যোম পর্যুদস্ত করিয়া বৃটিশ অল্পকাল মধ্যেই সাবড়া করিয়া ফেলিয়াছিল। তা ফেলুক : তাহার পৈতৃক জমিদারীতে প্রজাবিদ্রোহ বরদাস্ত সে কেন করিবে ? কিন্তু নিরস্ত্রের সেই "ডু অর ডাই" ও সশস্ত্রের "নাউ অর নেভারের" দক্ষযজ্ঞের ইতিবৃত্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ও তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলেও কি দেশী কি বিদেশী, কি শ্বেত কি কৃষ্ণ শোণিতবিন্দু মিলিবে না। বৃটিশ বর্বরের পুষ্পবরিষণে রেলের নিরীহ নির্দোষ কুলি মজুর দল বাঁধিয়া মরিয়াছে, ইতিহাসে লেখা আছে দেখা যায় ; নিরপরাধ পল্লীবাসী বৃটিশ বেওনেটের রোষানলে কাতারে কাতারে আহুতি প্রদত্ত হইয়াছে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় ; গ্রাম জ্বলিয়াছে, ঘর পুড়িয়া ছাই হইয়াছে, নারীর সতীত্ব বিপর্যস্ত হইয়াছে, বৃটিশের মারণ যজ্ঞেতিহাসে বহু কীর্তিই কীর্তিস্তম্ভ রচনা করিয়াছে দেখা যায় ; কিন্তু যে 'ক্ষ্যাপা কুকুরের দল' "ডু অর ডাই" করিতে বাহির হইয়াছিল তাহাদের হাতে গোটা দশেক অত্যাচারী পুলিস, দুটি কানাডীয় ও একটি বৃটিশ বৈমানিক ব্যতীত একটি প্রাণী হাতেও মরে নাই, ভাতেও মরে নাই।

লর্ড লিনলিথগো ও তাঁহার কীর্তিমান সভাসদ ম্যাক্স-ওয়েল-টটেনহাম কোম্পানি অতিশয় যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে প্রলয়েতিহাস রচিত, প্রকাশিত ও প্রচারিত করিয়া গান্ধী ও কংগ্রেসের শাঠ্য ও নৃশংসতা বিশ্বময় ছড়াইয়া দিতে কালবিলম্ব করেন নাই তাহা আমরা জানি আছি। জালীয়ানবালাবাগে ডায়ার-ও'ডায়ারের কীর্তি-কলাপ শ্রবণে যাঁহারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই, গান্ধী

ও কংগ্রেসের নির্মম নৃশংসতায় তাঁহারাও মূর্ছাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ইহাও আমরা শ্রুত আছি। কিন্তু যে কারণেই হৌক বৃটিশ সে পুরাতন কাসুন্দি ঘাঁটে না, ঘুণাক্ষরে সে কথা উত্থাপন করে না (করে না কারণ জানে কেঁচো খুঁড়িতে অজগর বেরিয়ে আসিতে পারে।) কিন্তু মাঝের অধিক দরদী কায়েদে আজম কংগ্রেসের হিংস্র নৃশংসতার মাত্রা ক্ষণে ও অক্ষণে সময়ে ও অসময়ে ত দিয়াছেনই পাঁচ বৎসর পরেও ১৯৪৭ সালের ৭ই মে তারিখে সে দাগ বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। কিন্তু কেন এই আক্রোশ? তাঁহার ত দাবের কথা তাঁহার একচ্ছত্রাধীন মুশ্লিম লীগের একটি বাবুর্চির কেশ স্পর্শের কোনও খবর ক কেহ পায় নাই, তথাপি তিনি চিরকাল "রাই বোর কলের কথা' গাহিয়া আসর সরগরম করেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর আমি এখন দিব না। মনে হয় তাহার প্রয়োজনও হইবে না, উত্তর আপনা হইতেই পরিস্ফুট হইবে।

তিনবৎসর পরে, কারাবাসান্তে মুক্ত আলোকে আসিয়া সর্বপ্রথম পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুই ৯ই আগষ্টের ও পরবর্তী কয়েকদিনের ইতিহাসের পাদমূলে পূজার্ঘ্য দান করিয়াছিলেন। পৌরুষ পৌরুষের প্রশংসা করিবে না ত কে করিবে? দেশের লোক তো জড় পদার্থ নহে, পচা পুকুরের কলুষশীতল পঙ্ক নহে, পরন্তু জীবন্ত ও প্রাণবন্ত মনুষ্য। মনুষ্যত্বে মহান ও গরীয়ান পুরুষ জহওরলালের বলিষ্ঠ অন্তঃকরণে তাহারা সাড়া না জাগাইলে বিস্ময়ের বিষয় হইত। চিল যেমন ছোঁ মারিয়া ঠোঙ্গার খাবার, ঝুড়ির মাছ লইয়া উধাও হয়, দেশের সর্বজনপ্রিয় বরেণ্য নেতৃবৃন্দকে সেই ভাবে, অতর্কিতে ছোঁ মারিবার দুর্মতি ও দুঃসাহস যে-বৃটিশের হইতে পারে, সেই বৃটিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্মগত অধিকারের সমর্থন জওহরলাল করিবেন না ত কে করিবে? "কুইট ইণ্ডিয়া"র তরঙ্গাভিঘাতে বৃটিশের সাম্রাজ্য-সৌধ চূর্ণ-বিচূর্ণ, তাহারই ফলে ১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশন এবং পরবর্তী অধ্যায়ে ১৯৪৭এর ২০এ ফেব্রুয়ারীর এ্যাটলি-নির্ঘোষ—"উই কুইট জুন নাইনটিন ফরটি এইট্"। বৃটিশ যদি ভারতবর্ষ ত্যাগ করে দু'শ বৎসরের পরাধীনতার শৃঙ্খল যদি ছিন্নই হয়, তাহাতে কায়েদে আজমের ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপের পুনরভিনয় ঘটে কেন?

আরও একটা কথা আছে। জওহরলাল ১৯৪২ সালের ৯ই আগষ্ট ও পরবর্তী কয়েকদিনের সাধুবাদ করিয়াছেন। কায়েদে আজমের নিকটও একটা তুচ্ছ সুযোগ আসিয়া পড়িয়াছে, দেখিতেছি। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট ও পরবর্তীকালের সাধুবাদ করিতে তিনিই বা বিরত হইবেন কেন তাহা ত আমরা বুঝিতে পারি না। কংগ্রেসের "ডু অর ডাই" অর্থে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, তাঁহারও 'ডাইরেক্ট এ্যাকসন' প্রত্যক্ষ সংগ্রামেরই নামান্তর। প্যারিটি ত অব্যাহত রহিয়াছে, তবে এই ব্যর্থ ক্ষোভ কেন? পলিটিক্সে চক্ষুলজ্জার স্থান নাই ইহা ত সকলেই জানে; তবুও, কায়েদে আজম ৯ই আগষ্টের চতুর্দশ পুরুষের উদ্ধার করিলেও ১৬ই আগষ্টের প্রশংসা করিতে পারিতেছেন না কেন?

১৬ই আগষ্ট—১৯৪৬

কংগ্রেস ১৯২১ সাল হইতে বহুবার বহু আন্দোলন পরিচালিত করিয়াছে এবং দুইশতবর্ষব্যাপী ইঙ্গ-ভারতীয় ইতিহাসে ইহাও দেখা যাইবে যে কেবলমাত্র সসাগরা ভারতবর্ষই নহে, ছ'হাজার মাইল দূরের ইংলিশ চ্যানেল তটবর্তী বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের ভিত্তি পর্যন্ত বিকম্পিত হইয়াছে। ১৯২৭এ সাইমন কমিশন, ১৯৩০ এ গান্ধী-আরুইন চুক্তি, ১৯৩১ হইতে লণ্ডনে রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স, ১৯৪২এ ষ্টাফোর্ড-ক্রীপস্-আগমন, ১৯৪৫এ ওয়াভেল বৈঠক, পার্লামেণ্টারী মিশন ও ১৯৪৬ এ শেষ বেশ হিসাবে ক্যাবিনেট্ মিশন এবং ১৯৪৭ এ ধূলা-পায়ে ওয়াভেল বিদায়, এ সকলের মূলেই কংগ্রেসের কার্যকরিতা বিদ্যমান। ১৯৪৮ এর ৩০শে জুন (বলা যায় না। গান্ধীজী তৎ-

অব্যবহিত ফলস্বরূপ ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদের যে কণ্টকাকীর্ণ সুউচ্চ প্রাচীর উত্থিত হইল, কত যুগ কত শতাব্দীর সাধনায় সে ব্যবধান ঘুচিবে কিম্বা কোনকালে আদৌ ঘুচিবে কি না তাই বা কে বলিতে পারে ?

'যদি'র উপর নির্ভর করিয়া প্রতিভাশালী বাঙ্গালীকেও আত্মপ্রবঞ্চনা করিতে দেখিতেছি কেন, তাহা বুঝিতে পারি না। চক্ষুলজ্জার অবসর আজো আছে বলিয়াও আমরা মনে করি না। চক্ষুলজ্জার কণামাত্র অবশিষ্ট থাকিলেও কি কলিকাতায় নাদিরশাহী নরমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত? চক্ষুলজ্জার বালাই একটুও বাকী থাকিলে কি নোয়াখালি হয়? হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ, পল্লীদাহ, ধর্ম্মান্তরিতকরণও যেমন, তেমন নারীমাংসলোলুপ রক্তবীজ-পুষ্ট রাক্ষসের শোভাযাত্রা। মনে করুন তক্ষশীল, মনে করুন জয়চাঁদ; মনে করুন মানসিংহ, মনে করুন ভবানন্দ; মনে করুন মীর্জাফর। যে বিধাতা ভারতবর্ষ সৃজন করিয়াছিলেন সেই বিধাতাপুরুষই ভারতের অদৃষ্টে এই লিখনই লিখিয়াছিলেন। যে নারীর জঠরে জন্ম, যে মাতৃঅঙ্কে শয়ন, যে পুণ্যপীযূষধারায় জীবন ধারণ, সেই নারীর মর্য্যাদা, সেই জননীর পবিত্রতা, সেই মাতৃস্তন্যের মর্য্যাদা নরককুণ্ডে নিক্ষিপ্ত করিয়াও যে অজবুক্ত পুরুষ লজ্জিত নহে, এককালে তাহার ছায়াস্পর্শে স্নানবিধি প্রচলিত ছিল। সে বিধান যে অকারণে রচিত হয় নাই ভারতের হিন্দু কি আজ মর্ম্মে মর্ম্মেই তাহা অনুভব করে না? হিন্দুর প্রাণে বাঁচিবার, সম্পত্তি সংস্কৃতি ধর্ম্ম কৃষ্টি ও ঐতিহ্য রক্ষার প্রয়োজন যদি আজ কঠিন বাস্তবের অঙ্গীভূত হইয়াই থাকে, তবে তাহার অন্তরের শান্তি, তাহার গৃহের শ্রী, তাহার সমাজের পবিত্রতার তপোবন, আত্মোৎসর্গের লীলা-নিকেতন, প্রেম ও প্রীতির নন্দন কানন হিন্দুর স্বর্ণ-সিংহাসনাধিষ্ঠিত লক্ষ্মীপ্রতিমাখানির মর্য্যাদারক্ষার প্রয়োজন আজ আরও অধিক। পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখ তাহা বুঝিয়াছে, বাঙ্গলার হিন্দুও কায়মনোপ্রাণে বুঝিয়াছে। বাঙ্গলার হিন্দু আজ পুণ্যসলিলা ভাগীরথীতীরে একখানি সুখনীড় রচনায় তনুমনঃধন উৎসর্গ করিয়াছে।

হিন্দুর হৃদিবৃন্দাবনে আজ বংশীধ্বনি উঠিয়াছে; হৃদয়যমুনা আজ উজান বাহিয়াছে; আজ সে নিষ্কলুষ পবিত্র আবেষ্টনীমধ্যে নিধুবন মধুবন নিকুঞ্জবন গঠনে ব্রতী হইয়াছে। যে হিমালয়শিখরে গিরিবরগৃহে হিন্দুর দুহিতা উমার আবাস সেই হিমাচলমূল হইতে পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবীর চরণচুম্বী যে বিস্তীর্ণ ভূস্বর্গ সেইখানেই সে তাহার ভূস্বর্গ সৃজন করিতে চাহিয়াছে। যে ভারতে তাহার ইহলোকের শান্তি পুণ্য বারাণসী যে ভারতের যমুনাতটে অক্ষয়বটমূলে তাহার হৃদয়ের রাসপূর্ণিমা, যে চিরনবীন প্রেমিকের প্রেমদোললীলায় আজও তাহার শিরায় শিরায় স্নায়ুতে স্নায়ুতে ধমনীতে ধমনীতে দোলা লাগে, যে ভারতের শ্রীক্ষেত্রে রথারূঢ় পুরুষোত্তমদৃষ্টে জন্মজন্মার্জ্জিত পাপের শান্তি ও পুনর্জ্জন্মের যন্ত্রণার লাঘব হয়, যে ভারতের ত্রিবেণী সঙ্গমে মস্তক মুণ্ডন করিয়া সে মৃত্যুভয় জয় করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হয়, যে ভারতের মানস সরোবরে স্নান করিয়া অমরনাথ প্রসাদে সে চির অমরত্ব লাভ করে, তাহার সেই স্বর্গাদপি গরিয়সী ভারত জননীর অঙ্ক হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে হেন সাধ্য, লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ত তৃণাদপি তুচ্ছ, এ্যাটম্ বমেরও নাই।

হিন্দু চিরকাল আত্ম-হারা, আপন-ভোলা। লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম প্রত্যক্ষে হিন্দুর যত সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াই থাক্, হিন্দুকে আত্মস্থ করিয়াছে সে সত্য অস্বীকার না করাই উচিত প্রত্যক্ষ সংগ্রামবেশে নাদিরশাহী নরমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলেই হিন্দুর আত্মচেতনা জাগিয়াছে। আত্মশক্তির অভাব তাহার কোনদিন ছিল না, এবং ছিল না বলিয়াই গান্ধীজীর "কুইট ইণ্ডিয়া" ধ্বনিকে মূর্ত্ত ও রূপায়িত করিতে সে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করতে পারিয়াছিল। দুর্দ্ধর্ষ ও বিশ্ববিজয়ী বৃটিশকেও সে কোনদিন ভয় করে নাই আজিকার সাম্প্রদায়িক হত্যালীলাকে ভয় না করিলেও ঘৃণাই সে চিরদিন করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু মনুষ্যত্বের

লেশমাত্র যেখানে অবশিষ্ট নাই, সেখানে মনুষ্যত্বের উচ্চাদর্শের মূল্য কে দিবে? ভারতের রাজনীতি যে কোন কালে আততায়ীর ছুরিকায়, যৌন ব্যাভিচারে ও ধর্মীয় অত্যাচারে নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে এ দৃশ্য কি কেহ দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিয়াছিল?

এই অন্ধ ধর্মোন্মত্ততা, এই পৈশাচিক প্রভুত্ববিলাস, এই শোণিতপ্লাবন একদিন হয়ত স্তব্ধ হইবে, প্রাকৃতিক নিয়মেই ইহার অবসান ঘটিবে, কিন্তু ইতিহাসের যে পৃষ্ঠা কয়খানি ইহা কলঙ্কিত করিয়া রাখিল অনন্তকাল কি অনন্তলোকসমাজে তাহা কলুষ বিস্তার না করিয়া পারিবে কি? পরাধীনতার লৌহনিগড় ছিন্নপ্রয়াসী স্বাধীনতাকামী জাতির আত্মদানের যে অবদান ১৯৪২ সালের ৯ই আগস্টকে গৌরবমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, অগণিত ভ্রাতৃশোণিতাপ্লুত, নারীর মর্মন্তুদ হাহাকারে বিমর্দিত, ধর্মান্তরিতের করুণ ক্রন্দনে কলঙ্কিত ১৯৪৬এর ১৬ই আগস্টের কাহিনীকে প্রশংসা ত দূরের কথা, প্রকাশ্যে সমর্থন করিবার মত হীন মনোবৃত্তি মনুষ্যালয়ে মিলিবে কি?

মানস মুকুরে সেই অনাগত ভবিষ্যকালের কালিমা লিখনই যে কায়েদে আজমকে বহু বিলম্বে বিব্রত ও বিপর্যস্ত করিতেছে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? বিলাপে যে প্রলাপেরই পদধ্বনি শুনিতেছি!

নবীন লেখকদের আর একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিই। অধিকাংশ লোকই জানে না যে, তার অন্তরে কতখানি শক্তি আছে। চলতি বুলির মায়া কাটাতে পারলেই মানুষ তার নিজের অন্তরাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করে। আর সেই আত্মাই হচ্ছে সকল সাহিত্যের মূল। সুতরাং প্রতি নবীন লেখক যদি এই সংকল্প করেন যে, অন্যের মতামত আমাকে প্রভাবিত করতে পারবে না, আমিই অন্যের মতামতকে প্রভাবিত করব, তহ'লেই তাঁর লেখার আর মার নেই।—প্রমথ চৌধুরী

ঢাকের বাদ্য

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

'ঢাকের বাদ্য থামিলে মিষ্ট'—কে-বা হেন কথা বলে ?
শ্রোত্র তাহার চর্ম-মাত্র, শ্রবণ-নামে যা চলে।
অন্তরে মিলে রসের তত্ত্ব, বাহিরে যাহার দ্বার,—
মর্মের সাথে যোগ না থাকিলে সবই-যে ব্যর্থ তা'র !

* * * *

দুর্গাপূজার বোধন বসেছে—ঘোষিছে ঢাকের বাণী,—
আধ ক্রোশ জুড়ি' সারা পল্লীর মনে-মনে জানাজানি !
উৎসাহ তা'র উথলিয়া উঠে নিরানন্দেরও ঘরে,
আনন্দ যেন দেহাতীত হয়ে আকাশে ছড়ায়ে পড়ে !

বৎসর-পরে গিরিরাজ-ঘরে মেনকা-মায়ের মেয়ে
আসিছেন ফিরে', সারা দেশ তাই পথপানে আছে চেয়ে;
মায়ের-মেয়ের মিলনোৎসবে নিখিলে পড়েছে সাড়া,
শিবপুরে শুধু শ্মশান জাগিছে হইয়া গৌরীহারা।

অম্বরে সেথা ডম্বরু বাজে গুরুগুরু-গরগর্,
শিবাণি শিবাণি ডাকে শূলপাণি, কণ্ঠে ফুটে না স্বর ;
—কি যেন কোথায়, ভুল হয়ে যায়—অতীত ভবিষ্যৎ,
ভূমিকম্পে কি সহসা কাঁপিল কৈলাশ পর্বত !

তিনটি দিনের বিরহ মাত্র, তবু মনে জাগে ভয়,
সতী-বিয়োগের বেদনার কথা ফিরে যেন মনে হয়
পাগল ভোলার ত্রিনয়নে তাই নিবে' আসে যেন আলো
ভাবে,—যতদিন রত ছিনু যোগে,
ততদিনই ছিনু ভালো।

* * * *

দেবদারু-পথে ঐ দেখা যায় গৌরীর রথখানি !
মন উচাটন, না মানে বারণ,—ছুটে' চলে হিমরাণী।
গিরিরাজ-গৃহে হুলাহুলি সাথে শত শাঁখে পড়ে সাড়া,
মাতে পুরনারী উমারে ভেটিতে উজাড়ি' পল্লী-পাড়া।

নানা কলরব—ঢাকিয়া সে সব ঢাকের বাদ্য বাজে,
ভুলাইয়া লাজ ভুলাইয়া সাজ ভুলাইয়া গৃহকাজে ;
কাঁপাইয়া মাটীঢাকে পড়ে কাঠি, উঠে আগমনী-বোল,
মর্মে সবার ধ্বনি পশে তা'র ছাপায়ে গণ্ডগোল।

চারিধারে তারই প্রতিধ্বনিটি বারবার ফিরে' জাগে—
গৃহ হ'তে গৃহে, জন হতে জনে আনন্দে অনুরাগে ;
কেহ শোনে আর কেহ-বা শোনে না,
এ ধ্বনি সে ধ্বনি নয় ;
সবাকার সাথে সবারে মিলাতে বাণী এর দুর্জয় !

ষষ্ঠী হইতে দশমী প্রভাত মহাতিথি যায় যত—
পূজা, ভোগ, বলি, সন্ধি, আরতি—নানাবুলি নানামত,
আধক্রোশ ধরি' যেথায় যে আছে—পশিয়া সবার কাণে
মর্মের মাঝে পশি' কত প্রীতি কত স্মৃতি বহি আনে।

নাচে শিশুদল চলচঞ্চল তালে তালে মাথা নাড়ি',
বয়স্ক যারা মনে-মনে তা'রা শিশুদেরই অনুকারী।
নরনারী যত আরতি-সময়ে চাহি' প্রতিমার পানে
মায়ের মুখের হাসিটিও যেন সত্য বলিয়া মানে।

মানুষ চেননি তাই মানুষের এ লাঞ্ছনায়
তোমার বিরাম কুঞ্জতলে
সুধার পাত্র বিষ বলে তুমি
ছুঁড়ে ফেলনিক বিতৃষ্ণাতে।

মৃত্যুর পথে জীবনের পণ
শৃঙ্খল নিয়ে হাসির খেলা
তুমি ত দেখেছ জীবন ভ'রে—
অত্যাচারীর অগ্নি-অস্ত্রে কাঁচা প্রাণবলি
নির্বিকারে ;

তুমি ত দেখেছ রুদ্ধ কবাটে
আঘাত হেনেছে পাষণ্ডরা
তুমি ত শুনেছ চতুর্দিকে
দিবস রাত্রি ক্ষুধার কান্না ভোগগর্দ্ভ ধনীর দ্বারে ;
তুমিত দেখেছ মার বুক হ'তে
স্নেহের শিশুরে ছিনায়ে নিতে
সম্ভ্রমহানি জননী-জায়ার
নিরুপায়ে শেষ আত্মবলি,
সত্যের পরে দম্ভ হেনেছে
শত পদাঘাতে উদ্ধতেরা
তাদের বিচার করেছে যাহারা
তাদের বিচার হোল না আর।

তুমি ব'সে ব'সে হায়গো জরতী
গত বৈভবে স্বপ্ন দেখ,
গৃহদাহ দেখি' ভাব বিবাহের আতসবাজী,
বিস্ফোরণের দমকা আওয়াজে
মনে ভাব ঘর নিকটে এল,
ভয়বিহ্বল কোলাহলে ভাব
বিবাহ-বাসরে হুলুধ্বনি।
হায় হতভাগী বিলাস-শয্যা
কণ্টক হয়ে বিঁধে না গায়ে
প্রসাধনে তব নাহি আলস্য
নহ লজ্জিত অলঙ্কারে ;
তোমার ঘরের প্রদীপ নিবিছে
মালা-চন্দন শুকায়ে গেছে,
হয়ত এখনি প্রভাত হবে—
প্রভাত না হোতে দাঁড়াও বারেক দুয়ারে এসে
দর্পণে তব পড়ুক ছায়া
সে ছায়া দেখিয়া হয়ত আজিকে পড়িবে মনে
বহু আগেকার একটি প্রভাত
সে প্রভাতে তুমি রাজেন্দ্রাণী,
সপ্তদ্বীপের মরকত মণি মুকুটে জ্বলে
জ্বলে দু'নয়নে উদয়ভানুর স্নিগ্ধ আলো ;
মধুর হাস্যে মহিমান্বিতা তোমার দ্বারে
মনে কি পড়ে—
পূজার অর্ঘ্য বহিয়া আনিল বীরাঙ্গনা
অঙ্গনে তব মহোৎসবের দিবাবসানে
বীরবৃন্দের প্রণতি লভিলে
বসিয়া আপন সিংহাসনে— ?

তাইত শুধাই হে মহানগরী,
হয়ত এখনই প্রভাত হ'বে—
আলোকে জাগিবে বসুন্ধরা ;
তোমার লজ্জা কলঙ্ক তব ভাগ্যহীনা,
কেমনে ঢাকিবে সভার মাঝে ?

ধর্মান্ধ

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

হে ধর্মান্ধ ! ধর্মে অন্ধ ভাগ্য-পরিহাসে !
পতঙ্গেরা তেজঃপুঞ্জ বহ্নিশিখাপাশে
উদ্‌ভ্রান্ত যেমতি, তেমতি ধর্ম্মেরে চাহি
দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য রহ অবগাহি
গভীর গোঁড়ামি পঙ্কে !

অন্ধ-হস্তি-ন্যায়
দেবতারে বল স্তম্ভ কভু রজ্জু-প্রায়
কভু স্থূর্পসম কভু সর্পসম তায়
একান্ত একাঙ্গ দেখি। বুঝিনাক হায় !
আপনারে পোষ্যপুত্র মানো বিধাতারে
ভুলাইয়া মন্ত্র পড়ি কিম্বা কি-প্রকারে
উৎকোচে পূজায় ?

চড়ি কদলীর ভেলা
উত্তরিবে তুমি বুঝি করি অবহেলা
শাস্ত্রপারাবার পারে ?

তার চেয়ে বুঝি
নাস্তিকে স্বস্তিক বাক্য কহে সোজাসুজি
সর্বহিতবাদবাণী মুক্ত অভিমানে
সমুদার চিত্ত তার ছোট বড় জ্ঞানে
কোনো ধর্ম নাহি ভজে ; নাহি ত্যজে কারে
অনার্য কি আর্য গণি ; শিষ্ট সদাচারে
মিষ্টভাষে করে প্রীতি, আড়ম্বর-হীন
সম্প্রদায়ে অসংকীর্ণ কৌটুম্বে প্রবীণ,
বসুধৈব দেশ যার নভস্তলে ঘর
সংসারে সর্বস্বহীন চলে যাযাবর,
নাস্তিক তাহারে ধরি কানে কানে বলে
ধর্ম্ম না হইলে চলে, কিন্তু নাহি চলে
ধরাতলে হলে অর্থহীন, রাত্রি দিন
শান্তি হীন, দীন হীন, একান্ত মলিন
'হা-ঘরে' 'হা-ভাতে' পড়ি তরুচ্ছায়াতলে
খাদ্য যদি পায় কিছু খায় অশ্রুজলে
লবণাক্ত করি।

ধর্মান্ধ দুর্গের মত
ধর্মের পরিখা বেষ্টি রহে সে সতত
অচলায়তনপুরে, সহজে না চলে
সূর্য-রশ্মি মুক্ত-বায়ু, সুনির্মল জলে
কত না কদর্য বাধা ! পরধর্মপুরে
সতত শত্রুর মত আশে পাশে ঘুরে
কেমনে তাহারে আনি আত্ম-অধিকারে
উড়ায়ে বিজয়-ধ্বজা রক্ত-অত্যাচারে
করায়ত্ত করে পরে।

ডাকে পিতা বলি।
কে কাহার পিতা ? মিথ্যা ছলনায় ছলি
ডাকে ভগবানে।

খৃষ্টীয় সুসমাচার হৃদয়ে পূর্ণ ।
নাহি বাধা চলে, গতি নব-বর্ষ
আসে সর্বনাশা প্রবাহিনী পাশে
নয়ের সমুদ্রজল ।

সজিনা মল

এচির দিন নগুলার সমাজিনা শ
শাসন বাদ চল না আশ বল
সব-কোথা শব শ্রম হয়েতে কবল
হও বিছু সহনার ।

শাচন বালা

যা কিছু সুন্দর শুভ সুশোভন শালীন
মানবের মানবতায় পবিত্র ললাম
দানবের হানে শানি করে হানালাম
'ধর্ম' নর্ম' কবি মুখে যাঁরা শাখে ধরে

আদর্শের 'বিজয়স্তম্ভ' গড়ে তোলে পারে
তাহা হইতে চ্যুতপদে অনধ্য বদনে
পাচ নদন স মরে। বে কালগমে,
প্রল যন্ত্র বেশ্বনব, লক্ষহীন শত
নব নরমেধ যজ্ঞ বর্তমান টান।
শান বে মানব মানে, নিষ্যাজবে তারে
পাপিল দুগুল বেদী পারমাজিব বে
জ্বলে অনল জ্বাল মত্তে পবিত্র
দাহ হবে প্রমত্ত লক্ষ লক্ষ পাপ
অতগ্র অশ্রুর জলে। পুণ্য জনবহ
দহন শবর বাদ দীপ্ত শিহুত
ন হবে হিরণ্যপ্রভ

নব অশুমলা

অম্লান উদয়- কল ঘুচাইক বালি
বসাগাব ভক্তনে অন্ধকার
মনুষ্যের বক্ষ বিন বে ভ ছিবে আর ।

রাত্রির সঙ্গীত

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

বহু স্তব্ধ তারাভরা রাতে
যখন থেমেছে চলাচল
যানবাহনের,
সমস্ত সহর শুধু মূর্ছাতুর নিদ্রায় বিকল,
কার যেন হাত লাগে হাতে
কার ছেঁয়া চোখের পাতায়।
ভেঙে যায় অকস্মাৎ ঘুম,
চোখ মেলে দেখি ঊর্ধে জ্বলে তারাদল.
নিরুত্তাপ আকাশ নিঝুম।
আর কোনো শব্দ নেই আর কারো সচকিত স্বর
রক্তস্রোতে ঢেউ তুলে বাজে না হৃদয়ে,
মাঝে-মাঝে দূরাগত হাওয়ার আঘাতে
অশোকতরুর মূলে ঝরা পত্রদল
কাঁপে ভয়ে ভয়ে।
মানুষের সাড়া নেই সকলের চোখের পাতায়
যাদুকরী ঘুম এসে যাদুদণ্ড দিয়ে
ছোঁওয়া দিয়ে যায়।
দিনান্তের প্রাণকেন্দ্র সচেতন গভীর নিদ্রায়।

রাত্রির গহ্বর হ'তে চুপিসারে বার হ'য়ে আসে
নিরুচ্চার তন্দ্রাভাঙা সুর,
অপূর্ব সঙ্গীত যেন, পলাতক স্মৃতিতে বিধুর!
অশ্বত্থ পল্লব দোলে রাত্রির বাতাসে,
তারি ছায়া দুর্বাদলে, ঘাসে,
আকাশের নীলিমায় নক্ষত্রের দিকে চেয়ে থেকে
বারংবার এ হৃদয় মৌন, তন্দ্রাতুর।
রক্তমাখা স্মৃতিতে বিধুর!

মনে হয় রজনীর নিরুচ্চার সঙ্গীতের এই
বারিধারা
সদ্যোজাত কিন্তু চিরন্তন।
প্রত্যেক রাত্রিতে নিক ধুয়ে হৃদয়ের প্রান্ত ছুঁয়ে
সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন
গ্লানি আর জড়তাকে, সমুদ্ভূত হোক না যৌবন।
জীবনের পথে-পথে দ্রুত চলে ভারবাহী রথ,
রন্ধ্রে-রন্ধ্রে খুঁজে মরে শ্রান্তনীড় অযুত মানুষ
দুর্বার, বিচিত্রগামী পথ।
সারাদিন রৌদ্রালোকে ছায়াপ্রদ পথ খুঁজে-খুঁজে
শেষহীন মন্থর যাত্রায়
বিচ্ছুরিত অগ্নিকণা পদতলে প্রবল মাত্রায়,
আমাদের চোখ আসে বুঁজে।
তারপর রাত এলে
যে মুহূর্তে নিদ্রাতুর গ্লানি আর জড়তাকে
ন্যুব্জমন দূরে ছুড়ে ফেলে;
তন্দ্রাঘোরে বনান্তের পথ যেন ডাকে,
পথে যেতে দেখি পথে ফোটে শতদল,
ফসলের শত ঢেউ মাঠের সবুজে।

নিস্তব্ধতা ঘনীভূত: রাত্রির সঙ্গীতধ্বনি শুনি।
সঙ্গীতের শেষ নেই প্রণয়েরো শেষ নেই কোনো।
রাত্রির সঙ্গীত শেষে রক্তস্নাত দিন এসে
দাঁড়াবে আবার কাল ভোরে;
পরমায়ু নেই তবু বেঁচেই যে আছি।
সেটা কোন্ জোরে?

শতাব্দীর নিশি-যাপন

প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

যে সময় চলে গেছে, যে মানুষ মরে গেছে—
তাহাদের ঘন নৈশ সুর টানি চেতনার
চন্দ্রাতপ-তলে
ভঙ্গুর পাণ্ডুর ক্ষীণ সুন্দরী সে মেয়ে,
আসে সন্ধ্যা।
কেয়া-বনে জ্বলিল আরতি,—
গন্ধে গন্ধে ঘাসে ঘাসে, সুরাসম কেয়ার নিশ্বাসে,
জোনাকীর পাখার কিরণে,
দিবসের পথ হতে পলাতকা শব্দদের রেশে,
সহস্র-অস্ফুট-স্পর্শ-তীরে
নীলাক্ষী হেলেন কাঁদে, রূপের আগুন হতে
নীল শিখা উঠে,
সুন্দরী হেলেন বাতায়নে, ট্রয় হবে শেষ।

ক্রেসিডা, ঘুমায়ো নাকো, নিষ্ঠুর-নয়না,
আজ রাত্রে তাঁবু শান্ত রহিবে না,—
ট্রয়লাস চলিছে সে কতকাল যুগবর্ষ
ধরি তোমা লাগি,—
খেজুর গাছের শিরে আজ রাত্রে চাঁদ অস্ত গেলে
আসিবে সে, থেকো মেয়ে জাগি।

ক্লিওপেট্রা! ক্লিওপেট্রা!
—পদক্ষেপ শুনিছ কি তার?
কঠিন প্রাসাদ থেকে মৃত্যুর ঝরণা গলি পড়ে,—
নীল নদ লাল হয়ে গেল,—
আঁখি হতে কণ্ঠ হতে
যৌবনগন্ধেতে সিক্ত বক্ষপুষ্প হ'তে
বিলোল আগুন উপচিয়া পড়ে; রাণী ক্লিওপেট্রা!
কামনার বীজে ভরা সুগন্ধি চুম্বন,
ঈজিপ্টের নভোতলে আবেগে কাঁপিছে মধু-পাপ,
জীবনের ছন্দ ভেঙ্গে যায়, সম্রাটের ঘুম
কেড়ে নেয়;—
রাত্রি যায় বেড়ে, গর্জে বায়ু,
নীলনদতীরে বসি
শতাব্দীর রহস্যনিষিক্ত গাত্রবাসে,
ললাটে স্বেদের বিন্দু, ক্লান্ত, ঢেউ গণে,
তীব্র ক্লিওপেট্রা।

পেনিলোপ্! পেনিলোপ্!
ঘড়ি কি দেখিছ?
উলিসিস্ সিন্ধুতীরে এলো।
তোমার কার্পেট-বোনা কতোখানি হ'লো?
উলিসিস্ আসিতেছে—
বহু দেশ, মানুষের, বনানীর ঘ্রাণ নিতে পারো
চর্মে তার, ওষ্ঠে তার, কেশে তার,
সত্তা তার বর্ণে ভরে গেছে।
তোমার দেহের যমুনায়
অবেলায় অতিথিরা ভিড়াইল তরী,
নির্লজ্জ পাখীর ভিড় যাক্ তবে সরি;
সুন্দর প্রতীক্ষা তব আমার শিরায় স্পর্শ দিল,
পেনিলোপ্।

* * * *

এরা এলো, আরো এলো অনেক নায়িকা
পশ্চিমের সাহিত্যের বহু মালবিকা;
তাহাদের প্রেম অশ্রু সাফল্য ও কারুণ্যের রঙে
বিগলিত, ছায়াময় বহু-দূর-কাল
আমার পড়ার ঘরে সেই রাত্রে
রেখে গেলো গভীর নিশ্বাস।
রোমান্সের যুগ শেষ, এটা বুঝি করেনি' খেয়াল?
অথবা সে মিছে কথা শতাব্দীরা করেনি' বিশ্বাস?

এই হিসাবে বৃটিশ সরকারের খরচ হয়েছে মোট ১৭০০ কোটি টাকার উপর। এই টাকা বৃটিশ সরকার কিন্তু নগদ দেননি, তাদের হয়ে ভারতসরকারের নোট ছেপে খরচ চালিয়েছেন, বৃটিশ সরকার ভারতসরকারের নামে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লণ্ডন শাখায় জমা দিয়েছেন ষ্টার্লিং ঋণপত্র বা প্রতিশ্রুতিপত্র। এই হিসাবে ছাড়া আর একভাবে ষ্টার্লিং পাওনার পরিমাণ বেড়ে গেছে। ভারতে মার্কিন সেনাদের বা সামরিক বিভাগের জন্য যে খরচ হয়েছে, মার্কিন সরকার ডলারে সে দেনা শোধ করেছেন কিন্তু অত্যন্ত অন্যায়ভাবে স্বার্থপর বৃটিশ সরকার '[illegible] ডলার তহবিল' নামে একটি তহবিল সৃষ্টি করে সেই ডলারগুলি তাতে জমা দিয়েছেন এবং পরিবর্তে ভারতসরকারকে দিয়েছেন সমপরিমাণ পূর্বোল্লিখিত ষ্টার্লিং প্রতিশ্রুতিপত্র। এই সামরিক ডলার [illegible] ডলারগুলি দিয়ে বৃটিশ সরকার আমেরিকা থেকে পণ্য আনিয়ে নিজ দেশে পণ্য যোগান ব্যবস্থা অব্যাহত রেখেছেন এবং পণ্যমূল্যরেখা বিশেষ বাড়তে দেননি। এত মার্কিন ডলার ভারতে যদি আমদানী হত, তাহলে এদেশে ১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দের মহামন্বন্তরে লক্ষ লক্ষ লোক মরত কিনা সন্দেহ এবং মুদ্রাস্ফীতির এতটা জুলুম ভারতবাসীকে অবশ্যই সহ্য করতে হত না। এইভাবে ভারতের নামে বৃটেনে যে তহবিল বেড়ে উঠেছে, তা থেকে ভারতসরকার কিছু টাকার সোনা কিনেছেন এবং ৪০০ কোটি টাকার বিলাতী দেনা শোধ করেছেন। বৃটেনে ভারতসরকারকে নিয়মিতভাবে যে ব্যয় করতে হয় তার বহুলাংশও এই তহবিল থেকে যোগান হয়েছে। শেষপর্যন্ত ভারতসরকারের যুদ্ধের আগে ৬৮ কোটি টাকার ষ্টার্লিং তহবিল ফাঁপতে ফাঁপতে ১৬০০ কোটি টাকার উপরে এসে দাঁড়িয়েছে। এই ষ্টার্লিং পাওনা জমবার সময় ভারত সরকার বৃটিশ সরকারকে পণ্য যুগিয়েছেন অতি সস্তা দামে, যদিও সে সময় ভারতে খোলাবাজারে ও চোরাবাজারে একই জিনিষ বিক্রী হয়েছে ৩৭ গুণ দরে। সবচেয়ে বড় কথা, সাধারণ ভোগ্যপণ্যের জন্য পরনির্ভরশীল ভারতের বাজারে যুদ্ধকালীন আমদানী বন্ধের জন্য যখন তীব্র পণ্যাভাব দেখা দিয়েছিল, তখন সেই স্বল্প পরিমাণ পণ্যের একাংশ বৃটেনের স্বার্থে নিয়োজিত হবার ফলে এদেশে সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। বলতে গেলে বাঙ্গলার পঞ্চাশের মহামন্বন্তরের এও একটা মস্ত বড় কারণ।

যাই হোক, ভারতবাসীর দারুণ দুঃখবরণের বিনিময়ে যে পাওনা গড়ে উঠেছে এবং যার জন্য [illegible] নাশ হয়েছে তার, দরিদ্র ভারতের আর্থিক ভবিষ্যৎ গঠনের একমাত্র আশা ভরসা সেই ষ্টার্লিং ঋণ বৃটেনের এবার পরিশোধ করে দেবার কথা। যুদ্ধকালীন প্রয়োজনে যে ঋণ সংগৃহীত হয়েছে, যুদ্ধাবসানে কাল বিলম্ব না করে কোন দেশই তা ফেলে রাখতে পারে না, ভারতবর্ষের মত নিঃস্ব দেশের তো কথাই নেই। কিন্তু ভারতের পাওনা ফিরে পাওয়ার দাবী ন্যায়সঙ্গত হলেও বৃটেনের দিক থেকে এখনো এ বিষয়ে কোন আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিলপ্রমুখ বৃটেনের একদল লোক এবং 'ইকনমিষ্ট' প্রভৃতি এক শ্রেণীর বৃটিশ সংবাদপত্র ভারতের পাওনা টাকা কমাবার জন্য রীতিমত আন্দোলন সুরু করেছেন। এদের প্রধান বক্তব্য, ভারতবর্ষ যখন মিত্রপক্ষীয় দেশ হিসাবে যুদ্ধ করেছে তখন সেই যুদ্ধের ব্যয়ভার গ্রহণ করবার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে তার, ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের বাজে একটা আর্থিক চুক্তির নাম করে যুদ্ধবিধ্বস্ত বৃটেনের স্কন্ধে সেই ঋণভারের একাংশ চাপাবার কোন অর্থ হয় না। এদের কেউ কেউ ভারতহিতৈষী সেজে আর এক ধরণের যুক্তির অবতারণা করেন। এই যুক্তি হচ্ছে, 'ভারতবর্ষে বর্তমানে প্রচণ্ড মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে এবং সেই মুদ্রাস্ফীতির চাপে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত ভারতবাসীই কষ্ট পাচ্ছে বেশী। ভারতের আর্থিক

পরিস্থিতিতে সমতার সৃষ্টি করতে হলে মুদ্রাস্ফীতির জন্য কমাতেই হবে, সেই মুদ্রাসংকোচনের দিক থেকে স্টার্লিং পাওনার পরিমাণ হ্রাস করা অত্যাবশ্যক।" একদল আবার মরিয়া হয়ে মাঝে এমন আন্দোলনও করেছিলেন যে, ভারতের নামে যে পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হয়েছে, ততখানি ভারতের সত্যকার পাওনা নয়, যুধ্যমান নিরুপায় বৃটেনের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে অসম্ভব চড়া এবং অন্যায় দরে ভারতবর্ষ তাকে পণ্যাদি জুগিয়েছে বলেই স্টার্লিং পাওনার পরিমাণ এত স্ফীত হয়ে উঠেছে। এই সব যুক্তি যে স্বার্থপ্রণোদিত এবং মনগড়া সে কথা না বললেও চলবে। প্রথম যুক্তির উত্তর হচ্ছে বৃটেন ভারতের সমরব্যয়ের একাংশ বহনে প্রতিশ্রুতি না দিলে ভারতের মত দরিদ্র দেশের যুদ্ধ করে সর্বস্বান্ত হবার কোন প্রয়োজন ছিল না। বৃটেন সমরব্যয়ের একাংশ দেওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষ যুদ্ধের খরচ চালাতে দেউলিয়া হয়ে গেছে। ভারতবর্ষ যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল বিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশ হিসাবে স্বাধীন দেশ হিসাবে নয়, নইলে ভারতবর্ষকে যুদ্ধের জালে জড়িয়ে ফেলবার আগে একবার অন্ততঃ এ বিষয়ে ভারতবাসীর মতামত গ্রহণ করা হ'ত। বৃটেনের ঘরের পাশে আয়ল্যাণ্ড গত যুদ্ধে পূর্ণ নিরপেক্ষতা রক্ষা করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের প্রথম ২। মাস নিরপেক্ষ ছিল, মুসোলিনীর ইটালী পর্যন্ত যুদ্ধের গোড়ার দিকে ৯ মাস যুদ্ধ করেনি, এইসব দেশ যখন এভাবে যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে পারে তখন দুর্বল ভারতবর্ষের পক্ষে জাপানী কামানের মুখোমুখী দাঁড়াবার দায়িত্ব গ্রহণ না করাও অবশ্যই অসম্ভব ছিল না। দ্বিতীয় যুক্তির উত্তর হচ্ছে টাকা কমালেই ভারতের মুদ্রাস্ফীতি কমবে না, এ দেশে টাকা বাড়ার জন্য মুদ্রাস্ফীতি হয় নি, হয়েছে পণ্যাভাবের জন্য। ষ্টার্লিং পাওনা যথাসম্ভব পুরোপুরি ফেরৎ চাই, কারণ এই টাকায় বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি এনে ভারতে শিল্পসম্প্রসারণ সম্ভব হলে তবেই এদেশে বাড়তি কর্মসংস্থান হবে এবং পণ্যাভাব কমবে। এ ছাড়া বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি জনিত দুরবস্থা প্রতিরোধের আর কোনই উপায় নেই। তৃতীয় যুক্তির উত্তর অবশ্য আমাদের দিতে হবে না। সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যে কমিটি নিযুক্ত করেছিলেন তারাই মতপ্রকাশ করেছেন যে, ভারতসরকার যুদ্ধের সময় ভারতের বাজার দর অপেক্ষা সস্তাদরে ব্রিটিশ সরকারকে জিনিষপত্র যুগিয়েছিলেন।

ভারতের পাওনা নাশের অপচেষ্টামূলক এই সব বেসরকারী আন্দোলনের কিছুটা গুরুত্ব থাকলেও ব্রিটিশ সরকারের দিক থেকে এসম্বন্ধে এতদিন উল্লেখযোগ্য কোন বিবৃতি পাওয়া যায় নি। আশঙ্কার বিষয় সম্প্রতি ব্রিটিশ সরকার তরফ থেকে ভারতের ষ্টার্লিং পাওনা সম্পর্কে যে সব বাক্য উচ্চারণ করতে আরম্ভ করেছেন, তাতে ভারতের স্বার্থসমর্থক সকলেরই আতঙ্কিত ও বিরক্ত হওয়া স্বাভাবিক। এই ধরণের প্রথম সরকারী আলোচনা হয়েছে গত ফেব্রুয়ারী বিলাতের কমন্স সভায়। এই সভায় ব্রিটিশ অর্থসচিব ডাঃ হিউ ডালটন মন্তব্য করেন যে, ভারতবর্ষের ষ্টার্লিং পাওনা দাবী মিটাবার অধিকার ব্রিটিশ সরকারের থাকা উচিত। এর পর গত মে মাসে লণ্ডনে এ্যাক্সিডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের ভোজসভায় ডাঃ ডালটন পুনরায় অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, শীঘ্রই হোক বা বিলম্বেই হোক, বৃটেনকে তার বিরাট দেনার বোঝা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করতে হবে। এই বিপুল দেনা অবাস্তব, অন্যায় এবং সমর্থনের অযোগ্য।

ডাঃ ডালটনের উপরিউক্ত মন্তব্য যে সারা পৃথিবীতে চাঞ্চল্য জাগিয়েছে এবং ভারতবর্ষে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে তা বুঝিয়ে না বললেও চলবে। বৃটিশ অর্থসচিবের এই ধরণের মন্তব্যের পর ভারতসরকারের সাবধান না হয়ে উপায় নেই। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতের পাওনা প্রায় ১০০ কোটি টাকা বৃটেন একরকম ষড়যন্ত্র করে বাতিল করে দিয়েছিল। আশার কথা, বর্তমানে ভারতে জাতীয়তাবাদী অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং এই সরকার দৃঢ় অভিমত ঘোষণা করেছেন যে, কোনভাবেই ভারতের পাওনা ষ্টার্লিংয়ের পরিমাণ

হ্রাস করা চলবে না। গত ২৮শে অক্টোবর অন্তর্বর্তী সরকারে অর্থসদস্য মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ এসম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যবৃন্দকে সুস্পষ্ট আশ্বাস দিয়েছেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, ভারতসরকার দৃঢ়তা বজায় রাখলে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে বৃটেনের পক্ষে পাওনা ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হবে না। তা ছাড়া বৃটেন যখন আর্জেন্টিনার ষ্টার্লিং পাওনা পরিশোধের ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই করেছে, তখন তার দিক থেকে ভারতের পাওনা পরিশোধে (এই পাওনা ষ্টার্লিংগুলিই দরিদ্র ভারতবর্ষের আর্থিক পুনর্গঠনের একমাত্র আশাভরসা) অসম্মত হওয়ার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে আমেরিকার ব্রেটন উডস সহরে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলনে বৃটিশ প্রতিনিধি দলের নেতা পরলোকগত লর্ড কিনেস প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, বিলম্ব হলেও বৃটেন ভারতের দেনা অস্বীকার করবে না। ডাঃ ডাল্টনের উপরিউক্ত মন্তব্যের সঙ্গে লর্ড কিনেসের এই প্রতিশ্রুতির সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

যুদ্ধ অবসানে যুদ্ধকালীন ঋণ ও ইজারা চুক্তি বাতিল হওয়ায় বিপন্ন ব্রিটেন ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নূতন এক চুক্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ৪৪০ কোটি ডলার (১৪০০ কোটি টাকার কাছাকাছি) ধার করে। এই ঋণ গ্রহণের সময় বৃটিশসরকার প্রতিশ্রুতি দেন যে, অবিলম্বে তাঁরা বৃটেনের বিদেশী ঋণের একাংশ খাতিল করবার ও অবশিষ্টাংশ পরিশোধের ব্যবস্থা করবেন। এই চুক্তির ফলেই সম্ভবতঃ বৃটিশ সরকারের মতিগতি পরিবর্তিত হয়েছে। গত জানুয়ারী মাসে স্যার উইলফ্রিড ইডির নেতৃত্বে এক বৃটিশ প্রতিনিধিদল ভারতসরকারের সঙ্গে ষ্টার্লিং পাওনার মীমাংসা সম্পর্কে কথাবার্তা চালাবার জন্য ভারতবর্ষে এসেছিলেন। সম্ভবতঃ অন্তর্বর্তী সরকারের ভারতীয় স্বার্থসংরক্ষক দৃঢ় মনোভাবের ফলে সেই আলোচনায় বৃটিশ প্রতিনিধিদল বৃটেনের দেনা কমাবার বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। এই নিষ্ফল প্রয়াসের পরিণতিতেই বোধ হয় ডাঃ ডাল্টন তথা বৃটিশ সরকার এখন কতকটা মরিয়া হয়ে (এবং নীতিজ্ঞান ভুলে) সরাসরি বিদেশী দেনা কমিয়ে ফেলবার সংকল্প প্রকাশ করছেন। যাই হোক, এই ধরণের মন্তব্য যখন তাঁরা করছেন, তখন ভারতের মত সংশ্লিষ্ট পাওনাদার পক্ষকে এই মন্তব্যের উপর উপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করে অবিলম্বে পুরো পাওনা আদায়ের জন্য আন্দোলন বা চেষ্টা করতে হবে। ইঙ্গ-ভারতীয় রাজনৈতিক সম্পর্কের ইতিহাসে ১৯১৯-২১ খৃষ্টাব্দ আর ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দ যে একবস্তু নয়, ষ্টার্লিং পাওনা সমস্যার সমাধানের উপর একথার প্রমাণ নিঃসন্দেহে বহুলাংশে নির্ভর করছে।

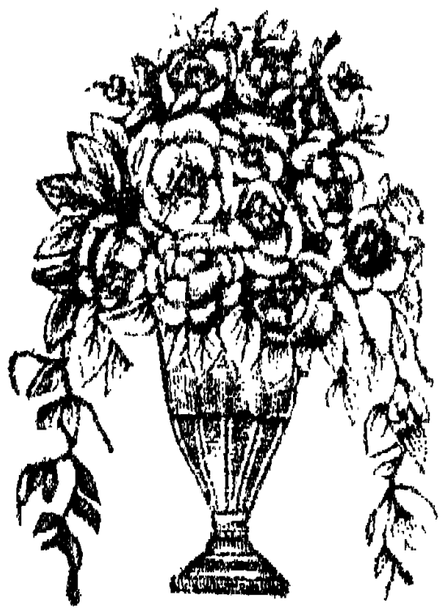

ছুলতে দিচ্ছে না। দূর থেকে ছোট ছোট ছেলেপুলেরা ডোঙ্গা সাহেব বলে চীৎকার করে এবং মুহূর্তে ডান-গাল বাঁ গালের নীতিবাক্যটা ভুলে গিয়ে জোসেফ তাদের পশ্চাদ্ধাবিত হয়। বলা বাহুল্য তাদের ধরতে পারা যায় না এবং রোষ-কষায়িত নেত্রে ফিরে আসতে আসতে জোসেফ ইম্যানুয়েল স্মরণ করতে থাকে: প্রভু, এদের ক্ষমা করিয়ো, কারণ এরা জানেনা এরা কী করিতেছে।

তেঠেঙ্গে টাট্টুতে চড়ল হ্যান্‌স্ এবং তার সঙ্গে চলল জোসেফ। গন্তব্যস্থল রামগোপালপুরের হাট। শীতের মাঝামাঝি। মাঠের যে অংশটুকুতে ফসল ধরে তা রবি-শস্যে আকীর্ণ হয়ে গেছে—সোণালি উজ্জ্বল পুষ্পস্তবকে আলো করে দিয়েছে চারদিক—শীতের রোদের মতোই তার রঙ। সমতল টিলা জমির ভেতর দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে চলেছে টাট্টু; সে চলা একটানা, থামা আর চলার মাঝামাঝি যে অবস্থাটা, সেই বিলম্বিত লয়ে তার যাত্রা। সুতরাং সঙ্গে চলতে জোসেফের কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না।

ভারী খুশি মনে পৃথিবীটাকে পর্যবেক্ষণ করছিল হ্যান্‌স্। নতুন জগৎ—নতুন পরিবেশ। শহরে থেকে ভারতবর্ষকে একরকম চেনা যায়, কিন্তু এর রূপ আলাদা। এই ঢেউ খেলানো জমি, এই অবিচ্ছিন্ন নির্জনতা আর ঠাণ্ডা বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ—এর সঙ্গে কোথায় যেন ইয়োরোপের সমুদ্রের একটা সংযোগ রয়েছে। হ্যান্‌স্ আনন্দিত কণ্ঠে বললে, মিস্টার জোসেফ, তোমার দেশটা ভারী চমৎকার।

জোসেফের মনে কাব্য নেই। এদেশের চমৎকারিত্ব-টাও তাকে যে খুব রোমাঞ্চিত করে তোলে তাও নয়। তবু স্বাভাবিক সৌজন্য রক্ষার জন্য জোসেফ ইংরাজি ভাষায় জবাব দিলে, ইয়াশ্।

—ম্যাক্সমূলারের বই পড়ে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভারী মোহ ছিল আমার। এখন দেখছি ঠকিনি।

জোসেফ আবার বললে ইয়াশ্ সার।

কিন্তু কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে জোসেফের কাণ খাড়া হয়ে উঠেছে, বদলে যাচ্ছে মুখের রঙ। মাঠের ওদিকটাতে যেখানে বিলের জল মরে গিয়ে এক কোমর কাদা আর আধহাত ঘোলা জল থক থক করছে আর যেখানে একদল কালো কালো নেংটিপরা ছেলে জিওল-মাছের সম্বন্ধে দাপাদাপি করছে, ওখান থেকে একটা সন্দেহজনক শব্দ শোনা যাচ্ছে।

শিকারী কুকুরের মতো উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়ালো জোসেফ। হ্যাঁ—কোনো ভুল নেই, এ ব্যাপারে ভুল হতেই পারে না। পরিষ্কার নির্ভুলভাবে চীৎকার উঠছে: ডোঙ্গা ডোঙ্গা, ঠোঙ্গা ঠোঙ্গা—ইজিরি মিজিরি!

ঠোঙ্গাটা হচ্ছে ডোঙ্গার সঙ্গে মিলিয়ে কাব্যরচনার প্রয়াস, আর ইজিরি মিজিরি ডোঙ্গা সাহেবের ইংরেজি বিদ্যার প্রতি কটাক্ষপাত! মুহূর্তে জোসেফের মুখের পেশীগুলি শক্ত হয়ে গেল, বিড় বিড় করে খানিকটা অশ্রাব্য এবং অথৃষ্টানোচিত গালিগালাজ বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে।

—কী হল মিস্টার জোসেফ?

—নাথিং শার্।

—ওরা ওখানে চীৎকার করছে কেন?

—গ্রামের সব ত্যাঁদোড় ছেলে শার্! মাছ ধরছে।

—মাছ ধরছে? ওঃ—লাভ্‌লি! চলো, মাছ ধরা দেখব।

মনে মনে জোসেফ শিউরে উঠল। তবে একমাত্র ভরসা সাহেবের বাংলা জ্ঞানটা টনটনে নয়, তা ছাড়া ডোঙ্গা শব্দের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটা উপলব্ধি করাও সম্ভব নয় তার পক্ষে।

তবু ডোঙ্গা সাহেব শেষ চেষ্টা করলে একবার।

—ও দেখবার কিছু নেই শার্, নোংরা ব্যাপার।

—নোংরা? নোংরা কেন? নেভার মাইণ্ড, চলো।

সাহেবের গোঁ আর বুনো শুয়োরের গোঁ—এদের মধ্যে যে কোনো পার্থক্য নেই, এতদিনে সে অভিজ্ঞতাটা আয়ত্ত

হয়েছে, ডোঙ্গা সাহেবের। কিন্তু ওদিক থেকে সমানে সোল্লাস চীৎকার আসছে: ডাঙ্গা ডোঙ্গা ঠোঙ্গা ঠোঙ্গা—এসপার কিংবা ওসপার। মনটাকে বহু কষ্টে শান্ত করে নিয়ে জোসেফ বললে চলুন—

কিন্তু ওরা সেদিকে এগোতেই ছেলের দল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে সুরু করে দিলে।

—কী ব্যাপার জোসেফ, ওরা পালালো কেন?

—জানিনা স্যর্।

—বোধ হয় ভয় পেয়েছে, তাই নয়?

—ইয়াস্ স্যর্।

—কিন্তু কেন? বাঘ না ভালুক? ক্রিশ্চিয়ানিটি প্রচার করতে হলে আগে তো ওদের ভয় ভাঙানোটা দরকার—কী বলো

জোসেফ বললে, সে পরে হবে স্যর্, এখন চলুন, নইলে হাটে পৌঁছুতে বেলা ডুবে যাবে।

—নেভার মাইণ্ড।—বলেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল হানস। বিদ্যুৎবেগে লাফিয়ে পড়ল [illegible] থেকে, তারপর ছেলের পালকে লক্ষ্য করে ঊর্ধ্বশ্বাসে মাঠের ভেতরে ছুটতে সুরু করে দিলে।

—কী হচ্ছে স্যর্।

কিন্তু জবাব দেবার সময় নেই হানসের তখন। সে প্রাণপণে ছুটেছে মাঠের ভেতর দিয়ে। ছেলেরা পরিত্রাহি চীৎকার করে পালাবার চেষ্টা করছে এদিক ওদিক আর হানস তাদের অনুসরণ করছে। টাট্টুর লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে অভিভূতভাবে জোসেফ ঘটনাটা লক্ষ্য করতে লাগল।

পাঁচহাত লম্বা মানুষ, সেই অনুপাতে লম্বা লম্বা তার ঠ্যাং; তা ছাড়া লাইপজীগ ইউনিভার্সিটির ব্লু, দৌড়ে তাকে হারানো অসম্ভব। সুতরাং কয়েক মিনিটের মধ্যেই সাহেব দুহাতে দুটো ছেলেকে ধরে ফেলল। ছেলেদুটো আর্তনাদ করে উঠল।

সান্ত্বনা দিয়ে হানস বলল, ভয় পাচ্ছ কেন? আমি শ্বেত জাতি—ইয়ুরোপ হইতে আসিয়াছি। আমি ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ হইতে আসি নাই নরমাংস খাইনা।

ছেলেদুটো কথাটা বুঝতে পারল না, কিন্তু চোখের ভাষা বুঝতে পারল। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই বদলে গেল সমস্ত। দলে দলে ছেলেরা এসে হানসের চারদিকে এসে জড়ো হয়ে গেল।

নিজের চোখকে কি বিশ্বাস করতে পারে জোসেফ? বিশ্বাস না করার অবশ্যই কারণ। মিশনারীদের কাছে নতুন কথা নয়, বরং তাদের পক্ষে সেটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। তাই বলে এতটার জন্যে কেউই প্রস্তুত থাকতে পারেনা, জোসেফও নয়

সাহেবি সাদা সার্টটা খুলে ফেলেছে হানস, খুলেছে জুতো মোজা। তারপর প্যান্টালুনটাকে হাঁটু অবধি গুটিয়ে দিয়ে ছেলেদের সঙ্গে পরমোল্লাসে সেই এককোণের ডোবায় মাছ ধরতে নেমে পড়েছে। পোষাকের অবস্থা তার অবর্ণনীয় সর্বাঙ্গে কাদার ছিটে—এমনকি গালে মুখে পর্যন্ত ছোপ লেগেছে। কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই হানসের—এক নিছক সৃষ্টিছাড়া আনন্দে সে মশগুল হয়ে গেছে

টাট্টু ঘোড়ার লাগামটি ধরে ডোঙ্গা সাহেব কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একী, ভগবানের সেবকের এই ব্যবহার! এমন করলে যে সম্মান থাকবে না লোকের কদর করবে না। যদি মিছরি নামাঙ্কুশের সঙ্গে সাহেব যে একদম হয়ে যান শেষ পর্যন্ত।

সাহেব যখন উঠে এল মাঠের ওপর দিয়ে তখন সন্ধ্যা নেমেছে। পেছনে ছেলের দল চীৎকার করছে, ও সাহেব, কাল আসবে তো?

সাহেব সোৎসাহে সাড়া দিয়ে বললে হাঁ, আসব

এতক্ষণ পরে গম্ভীর থমথমে গলায় কথা বললে জোসেফ: সন্ধ্যা হয়ে গেল—আজ আর হাট হবেনা।

—আমি বাস্তবিক ভারী দুঃখিত—লজ্জিত স্বরে হানস জবাব দিলে, লোভ সামলাতে পারলামনা।

অজ্ঞাত অনাদৃত গ্রামগুলির মধ্যে কোনটি যে নতুন কালের বেথেলহেম সে কথা কে বলতে পারে। যিনি আসবার নিজের প্রয়োজনেই তিনি আসবেন, অনর্থক কেন আর—

কিন্তু সৌভাগ্য এই যে মনোভাবটা তাঁর দীর্ঘস্থায়ী হয়না। নিজেকে মধ্যে মধ্যে প্রবলভাবে ধমকে দেন ডোনাল্ডস। এ অন্যায়, এমন ভাবে চিন্তা করাটা অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ। ভারতবর্ষের জলমাটি তাঁর রক্তের মধ্যেও দুর্বলতা প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছে নাকি। নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছে, নিরুৎসাহ আর সংশয়িত করে দিচ্ছে এ দেশের হিন্দুদের মতো? চুপ করে বসে থাকলে চলবেনা, তাঁর ক্ষেত্র প্রস্তুত করে না রাখলে ঈশ্বরপুত্রের রিসরেকশন হবে কেমন করে, কেমন করে সার্থক হবে প্রফেটদের ভবিষ্যৎ বাণী।

—শুভসন্ধ্যা ফাদার

—শুভ সন্ধ্যা—মুখ ফিরিয়ে ডোনাল্ডস তাকালেন। এসো, বাসো।

হ্যানস এসে নিঃশব্দে পাশের চেয়ারটাতে বসল।

—কেমন লাগছে এখানে।

—চমৎকার। এ এক আশ্চর্য দেশ

—প্রথম প্রথম তাই মনে হবে—ডোনাল্ডস স্মিতভাবে বললেন: কিন্তু তারপরেই মত বদলে যাবে তোমার।

আমার তো মনে হয় না—তাবের সঙ্গে জবাব দিলে।

—বেশ, তাহলেই ভালো।—ডোনাল্ডস আর কথা বাড়ালেন না, বললেন, বিস্তর কাজ আছে, এতদিনে আমরা বিশেষ কিছুই করতে পারিনি। তোমাকে ভালো করে এর দায়িত্ব নিতে হবে।

—তা নেব, কিন্তু—হোনাল্ডস হঠাৎ থেমে গেল।

—কী বলছিলে?

—মাপ করবেন ফাদার, একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ল।

—কী কথা?

—জবাব দেবার আগে খানিকক্ষণ কী ভাবলে হ্যানস্। অন্যমনস্ক হয়ে কামড়াতে লাগল বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা।

—এর কি সত্যিই কোনো দরকার আছে?

—কিসের?

—এই প্রিচিংয়ের?

ডোনাল্ডসের দৃষ্টি শঙ্কিত হয়ে উঠল

—হঠাৎ একথা বলছ কেন?

—আমার মনে হয়—একটু থেমে হ্যানস বলে চলল—আমার মনে হয়, আমরা চেষ্টা করে কাউকে ভালো করতে পারিনা। প্রত্যেকেই নিজের মতো করে ভালো হতে পারে, আর সেইটেই সব চাইতে ভালো।

তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসু চোখ হ্যানসের মুখের ওপর ফেলে ডোনাল্ডস বললে, তোমার কথাটা বুঝতে পারছিনা।

—আমি বলছিলাম—হ্যানস আগের আরো লাগা কামড়ে নিল: জোসেফ ইম্যানুয়েলের মতো কতগুলো জীব তৈরী করে ক্রিশ্চিয়ানিটির মর্যাদা বাড়ানো যায় না। ওরা যেমন আছে তেমনি থাকলেই ওদের মনুষ্যত্ব বিকাশের সুযোগ পাবে।

—এসব কী বলছ তুমি। ডোনাল্ডস আর্তনাদ করে উঠলেন: এই তো আমাদের কাজ। অন্ধকারের মানুষকে আলোর পথ তো আমাদেরই দেখাতে হবে। তুমি কি বলতে চাও এই পৌত্তলিক হিদেনগুলো চিরকাল শয়তানের শিকার হয়ে থাকুক?

—ঠিক বুঝতে পারছিনা—

আলোচনাটায় আকস্মিক একটা ছেদ টেনে দিয়ে হ্যানস উঠে দাঁড়ালো। কোথায় যেন অনিশ্চিত একটা অস্থিরতা পীড়ন করছে তাকে। তারপর সোজা সম্মুখের প্রায়ান্ধকার মাঠটার ভেতরে সে গিয়ে পায়চারী করতে লাগল।

পাকা চোখে ছোটাকে একটা সেকেণ্ড ব্যাবেচের মতো একত্র করে ডোনাল্ডস তাকিয়ে রইলেন। নতুন এ পথে এসেছে, এখনো সিলানথ্রফি আছে খানিকটা। কিন্তু ডোনাল্ডস হাসলেন: বেশিদিন এসব থাকবেনা। আস্তে আস্তে রোমান্স কেটে যাবে—যেমন করে ডোনাল্ডসেরও একদিন কেটেছিল।

কাজেই যদি না হবে তবে কেন পাদ্রীবাবা এখানে আমদানি করা কেন। ছেলেগুলো ঘরে বসে থাকবে না, সারাদিন কোথায় কোথায় ঘোরে, বন্ধু নিয়ে বাগানে তামাক খায়, গুরুর বাগানে নীচু চিরো। এ দেশের সঙ্গে মিশে জলায় নেমে সর্বাঙ্গে কাদা মেখে খায়দায় ঘোরে। তারপর সন্ধ্যার পরে ফিরে এসে বলে, ইণ্ডিয়া ইজ এ বিউটি। আর লাইক হাওয়া—আর লাইক হাওয়া।

পাদ্রীরা বিশ্বপ্রেমিক বটে কিন্তু একটা বিশ্বপ্রেম জন্মানো পাদ্রীদের পক্ষে শক্ত।

সেদিন সন্ধ্যার দিকে একটু ঘর থেকে পাদ্রীদের পায়চারি করে চারদিকে এসে দেখি অদ্ভুত কাণ্ড হয়েছে—এক আলোর বিস্ময় দেখা দিয়েছে কিছুক্ষণ পরে ঘর আলো কপালে লাল জ্বলজ্বল করছে, মাথায় অদ্ভুত এক অজানা চাঞ্চল্য। আর শান্ত নিরীহ দুটো পাদ্রীর চেহারার অদ্ভুত পরিবর্তন। একটা ঝিকিমিকি—ভারতবর্ষের আমাজনা। একটা ঘুমন্ত সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দেয় স্বপ্নের মতো মনে পড়ে ইংলণ্ড চার্চের লাল চূড়া, চক মিল, লাল রঙ পাথরের বাংলো, সেখানে সমুদ্রের হাওয়া মনে হয় এ নির্বাসন—একটা অসহ অনিচ্ছাকৃত নির্বাসন। আর ঘর থেকে যা এই হাওয়ারা—এই ভেটি আর ভেলো সব দল।

চক চকে একটা রেভারেণ্ড পর্যন্ত ঢেকে ডোনাল্ডসন চুপ করে বসে ছিলেন পাশেই বসে ছিল ডোমেস ও হানুস তার কানে মুখ আর আকাতরভাবে চাইতে লাগল।

অর্থাৎ নতুন একটা কবিতে প্রার্থনা হয়েছে। সাম্প্রতিক ভাষাটা সংশোধন করলে মোটামুটি কথা দাঁড়ায় এই রকম।

ছেলে পাদ্রী পাগল,
বুড়ো সাহেব আদত ছাগল

ছোটো শুনে ডোনাল্ডসন বললেন, কী।

ডোমেস বললে, আপনাকে অনেকবার বলেছি স্যার, সব ওই ছোট সাহেবের দোষ। ওরাই কত লোকগুলো গোল্লায় দিয়েছে। ঘরের লোকই যদি এভাবে শত্রু হয়ে ওঠে স্যার, তা হলে এসব করে আর লাভ কি? সোজা দেশে পাঠিয়ে দেওয়া ভালো।

ডোনাল্ডসন আবার বললেন, হুঁ।

নিঃশব্দে সন্ধ্যা নামতে লাগল। হঠাৎ বাতাস-থেমে-যাওয়া গুমোটের মধ্যে গাছের পাতা যেন চারিদিকে আবর্তিত হতে লাগল। ডোনাল্ডসনের মনের কাছে ইংলিশ-চ্যানেলের সমুদ্রের ঢেউ বার বার বিক্ষুব্ধ হয়ে যাচ্ছে হাওয়ার মতো আকাশ জুড়ে। আর ডোমেসের মুখের দিকে তাকিয়ে একটা দেশ বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগলেন ডোনাল্ডসন, হঠাৎ রাগে লাফিয়ে এবং একটা কুকুরের মতো এসে নিজের মেজাজ দিয়ে দূরে ছিটকে ফেলে দিলেন।

অন্ধকার হয়ে গেছে। বাইরের রাস্তায় শোনা গেল গরুর গাড়ির আওয়াজ আর রাখাল শিশুর শব্দ। হানুস ফিরে আসছে। কোথেকে একটু পরে চেয়ারে স্থির হয়ে বসল।

আনন্দোচ্ছল স্বরে হানুস বললে, কী হয়েছে ফাদার, সব এমন চুপচাপ কেন?

বাবারা কানে শুনতে পেলেন।

হানুস বললে, দেখুন ফাদার, আমি চন্দ্রবার একটা মুর্গী এনেছি। ইণ্ডিয়ান হেন্স আর লাভলি —

হানুসের হাতের মুর্গীটার দিকে তাকালেন ডোনাল্ডসন: কোথায় পেলে এটা?

—ওরা কী যেন পুজো করছিল, তারই বলি। আমাকে প্রেজেন্ট করলে। রিয়্যালি - আই লাভ —

—ড্যাম আনস্কাউণ্ড্রেল।—সমস্ত সংযমের মুখোশ হারিয়ে কর্কশভাবে ফেটে উঠলেন ডোনাল্ডসন: হানুস, আমি খুব দুঃখিত। তোমার আর এখানে থাকবার দরকার নেই, কালই তুমি এখান থেকে চলে যাবে।

ছু চোখ বিস্ফারিত করে হ্যান্‌স বললে, ব্যাপার কী ?

—কিছু না।—তিক্ত তীব্র স্বরে ডোনাল্ড্‌স্ বললেন, চার্চ তোমার জন্যে নয়। ইউ টাই ইয়োরসেল্‌ফ এল্‌স-হোয়্যার।

জোসেফ নিশ্চিন্তে বসে বসে হাঁটু দোলাচ্ছে—যেন অনাসক্ত কোনো তৃতীয় পক্ষ। তার দিকে একটা রক্ত-দৃষ্টি ফেলে হ্যান্‌স বললে, বুঝতে পেরেছি। নিশ্চয়ই এই ডোঙ্গা চ্যাপ্—

ডোঙ্গা চ্যাপ্! সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক ক্রিয়াটা ঘটে গেল জোসেফের শরীরে। তীরের মতো দাঁড়িয়ে পড়ল সে : আই ওয়ার্ণ ইউ শার্—আই অ্যাম নো ডোঙ্গা!

শব্দ করে হ্যান্‌স হেসে উঠল—তার গভীর স্বচ্ছ হাসি লহরে লহরে মুখরিত করে তুলল তরল অন্ধকারকে।

—নিশ্চয় ডোঙ্গা! শুধু ডোঙ্গা নয়, ঠোঙ্গা ঠোঙ্গা—

পরের ঘটনাটা ঘটল চক্ষের পলক ফেলবার আগেই। বুনো একটা রক্তলোলুপ জানোয়ারের মতো ভয়াবহ হুঙ্কার করে জোসেফ ঝাঁপ দিয়ে পড়ল হ্যান্‌সের ওপরে। কিন্তু লাইপ্‌জীগ্ ইউনিভার্সিটির ব্লু সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক একটা সরীসৃপের মতো পিছলে বেরিয়ে গেল; তারপর পুরু একতাল লোহার মতো প্রচণ্ড একটা হেভিওয়েটের আঘাত এসে নামল জোসেফের চোয়ালে। ঠিকরে একটা দেওয়ালে গিয়ে লাগল জোসেফ, সেখান থেকে কুমড়োর মতো ধপাৎ করে পড়ল মাটিতে।

ক্রোধে, জ্বরের উত্তেজনায় যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন ডোনাল্ডস্। অমানুষিক কণ্ঠে চীৎকার করে বললেন, বেরিয়ে যাও এখান থেকে—ইউ বোথ! এটা চার্চ—গুণ্ডামির জায়গা নয়।

—সত্যিই চলে যাবো ফাদার ?

—হ্যাঁ—এই মুহূর্তে। ক্রিশ্চিয়ানিটি ডিস্‌ওনস্ ইউ। বেরিয়ে যাও—

নিজের চীৎকারে নিজের কথাটা বোঁ করে পাক খেয়ে গেল ডোনাল্ড্‌সের। দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁপতে কাঁপতে তিনি বসে পড়লেন চেয়ারে—শিরাগুলোতে ব্লাড্-প্রেশারের রক্ত যেন টগবগ করে ফুটে উঠছে তাঁর। অনেকক্ষণ পরে যখন চোখ তুলে তাকাবার মতো স্বাভাবিক অবস্থাটা ফিরে এল, তখন দেখলেন পায়ের কাছে পোষা কুকুরের মতো বসে আছে জোসেফ; পুরু ঠোঁট কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে তার, আর সেই রক্তাক্ত মুখে একটা বিগলিত হাসির রেখা! এ অবস্থায় হাসা শুধু ইণ্ডিয়ানের পক্ষেই সম্ভব!

কিন্তু হ্যান্‌স ? তার চিহ্ন-মাত্রও নেই। শুধু অভিশপ্ত ভারতবর্ষের বুকের ওপরে খা-খা করছে অমাবস্যা রাত্রির নিকষ অন্ধকার। সে অন্ধকারে এতটুকুও দৃষ্টি চলে না!

* * *

ছ মাস পরে—পনেরো মাইল দূরের হাটখোলায়।

ঝুরি-নামা বুড়ো বটগাছের তলায় লোকে লোকারণ্য। ঢোল আর কাঁসরের শব্দে কান পাতা যাচ্ছে না। শিবের গাজন চলছে ওখানে।

"বুঢ়া শিবের নাচ নাগিলে
নাচ মাগিলে ভোলানাথের—"

বাজনার সঙ্গে সঙ্গে চলছে ভোলানাথের নৃত্য। মাথায় লাল চুলের সঙ্গে চমৎকার মানিয়েছে পাকানো পাটের জটা। রঙ দিয়ে আঁকা বাঘছাল শিবের শরীরে আশ্চর্য সুন্দর মানিয়েছে। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দীর্ঘদেহ শিবের আনন্দ-নৃত্যের তালে তালে পরমোল্লাসে ঢোল আর কাঁসর সঙ্গতি রক্ষা করে চলেছে।

"প্যাটেতে ভাত নাই ও শিব,
গোলাতে নাই ধান,
কী দিয়া বাঁচাব ও শিব
ছেল্যা পিল্যার জান!
ও বুঢ়া শিব, দয়া করো—"

নাচতে নাচতে শিবের চোখে জল এল। পেটে ভাত নেই, গোলায় ধান নেই। একবিন্দু অতিরঞ্জন নেই এর ভেতরে—এই ছ মাসেই নিজের চোখেই সে তা পরিষ্কার

পর্যন্ত গাড়ি থেকে নেমে পুজোমণ্ডপের দিকে এগিয়ে গেলেন, ভক্তিভরে দাঁড়ালেন সেখানে।

হ্যান্‌স জিজ্ঞাসা করলে, এ কী?

পাশের সশস্ত্র গুর্খাটি বুঝিয়ে দিলে। যুদ্ধজয়ের কামনাতে এখানে কালীপুজো করা হচ্ছে। টাকা দিয়েছেন গবর্ণমেণ্ট—ম্যাজিষ্ট্রেট নিজে এর একজন প্রধান উদ্যোক্তা।

—তাই নাকি? লাভ্‌লি।—হ্যান্‌সের নীল চোখ-দুটো একবার ঝকঝক করে উঠল: তোমার জলের বোতলটা দাওতো, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে!

সরলমনে গুর্খা তার ফ্ল্যাস্‌কটা তুলে দিলে হ্যান্‌সের হাতে। কিন্তু জল খেলোনা হ্যান্‌স, তার বদলে একটা কেলেঙ্কারী করে বসল। বোঁ করে তার হাত থেকে উড়ে গেল ফ্ল্যাস্‌কটা—একেবারে অব্যর্থ লক্ষ্যে। বিশ্রী শব্দ করে কালীমূর্তিটার মাথাটা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ভেঙ্গে পড়ল মাটিতে, ঘটে গেল একটা খণ্ড প্রলয়!

নিমেষের মধ্যে একটা উল্‌কার মতো মোটর থেকে মাটিতে যেন উড়ে পড়ল হ্যান্‌স। উন্মাদ ছন্দে শিবের গাজন নাচতে লাগল: মাউ আই অ্যাম এ ট্রু এনিমি—অ্যাণ্ড এ ট্রু ইয়োরোপীয়ান! অ্যাম আই নট?

"বাঙ্গালীর পক্ষে স্বধর্ম ত্যাগ করা আত্মহত্যার তুল্য পাপ। ভগবান আমাদের অর্থের সম্পদ দেন নাই বটে, কিন্তু তিনি আমাদের প্রাণের সম্পদ দিয়েছেন। অর্থের জন্য লালায়িত হয়ে যদি প্রাণের সম্পদ হারাতে হয় তবে অর্থে আমাদের প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালীকে এই কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে ভারতবর্ষে—শুধু ভারতবর্ষে কেন—পৃথিবীতে তার একটা স্থান আছে,—এবং সেই স্থানের উপযোগী কর্তব্যও তার সম্মুখে প'ড়ে রয়েছে।

—সুভাষচন্দ্র

প্রথম শ্রেণীর কলেজের কথা বলি। এখানে একজন বাংলার অধ্যাপককে, দু'শ টাকা মাসিক দক্ষিণা এবং এক বছর অন্তে বেতন বাড়াবার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে, নিয়োগ করা হয়। ঐ কলেজেরই এক জন সংস্কৃতের অধ্যাপককে তার শারীরিক অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে একবছর ধরে বিনা মাইনে [illegible] খাটানো হয়। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে একবছর পর তাকে পুরো বেতনে অধ্যাপক নিযুক্ত করা হবে। এক বছর পরে তাকে বলা হল [illegible] আপাতত কিছু মাইনে [illegible] করা গেল, [illegible] অধ্যাপক বানানো যাবে। (?) নিয়োগপত্রে অধ্যাপকদের যে বেতন নির্দিষ্ট করা হয়, [illegible] কলেজে যোগদান করতে এলে পর নানা [illegible] ঘুরিয়ে [illegible] করে না থেকে ৫০০ টাকা কলেজে [illegible] তাদের উপর চাপ দেওয়া হয়। তাদের বলা হয় যে কলেজের আর্থিক অবস্থা শীঘ্র ভাল হয়ে যাচ্ছে। তখন এ ক্ষতি তাদের পুষিয়ে দেওয়া হবে বেতনের স্কেল উঁচু করে, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড করে এবং আপাতত তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পরীক্ষক হতে সাহায্য করে। বলা বাহুল্য, কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতি [illegible] অচল অবস্থা আর কখনই কাটেনা। উক্তরূপ ব্যাপার সব যখন ঘটতে থাকে তখনই পাশাপাশি কলেজের রিজার্ভ ফান্ডেও বহু টাকা জমতে থাকে। সে টাকার কিছু অংশ নাকি সম্পাদক যুগ্ম-সম্পাদক প্রভৃতির কলেজ সংক্রান্ত (?) কাজে মধ্যে মধ্যে বাংলা ও ভারত-ভ্রমণাদির খাতে খরচ হয়ে যেতে থাকে।

আর এক জায়গার কাহিনী। একটি বেসরকারী খুব বড় কলেজের স্থায়ী একজন অধ্যাপক গ্রীষ্মের ছুটির মধ্যে কলেজ খোলবার একমাস আগেই কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানালেন যে, কলেজ খোলার এক সপ্তাহ পরে তিনি এক বছরের ছুটির দরখাস্ত করবেন যেহেতু তিনি অন্যত্র ভাল কাজ পেয়েছেন। তাঁকে উত্তরে জানানো হ'ল যে সেক্ষেত্রে ছুটির পরে তাঁর কলেজে ফিরবার আদৌ দরকার নাই, তিনি অবিলম্বে পদত্যাগপত্র দাখিল করতে পারেন, কারণ উক্তরূপ ছুটি তাকে দেওয়া হবে না। তার ছুটির মাসের ন্যায্য প্রাপ্য বেতনটা ফাঁকি দেবার দুরভিসন্ধিই এরকম উত্তরের উৎস। ভদ্রলোক কলেজের সঙ্গে ঐ কলেজে অনেক বছর ধরে অধ্যাপনা করেছেন একথা আবার মনে করলে ঐ উত্তরটা যে কতোখানি অন্যায় ও একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কতোখানি গ্লানিজনক তা বোঝা যাবে। গ্রীষ্মের ছুটির দুমাসের বেতন অধ্যাপকদের ফাঁকি দেওয়ার জন্য বাংলার বহু বেসরকারী কলেজই একটা অতি অসাধু কাজ করে থাকেন। বছরের পর বছর তারা একাধিক অধ্যাপককে এক সেসনের নামে— আসলে শুধু দশমাসের জন্য—(জুলাই থেকে এপ্রিল) নিয়োগপত্র দেন। এইভাবে একই অধ্যাপককে দুই তিন বছর বার বার অস্থায়ী ভাবে নেওয়া হয় এবং প্রতিবছরই তাঁদের ন্যায্য প্রাপ্য দুমাসের বেতন থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা হয়। ঐ একই উদ্দেশ্যে অন্য রকমও কোথাও কোথাও করা হয়। কোন একটা পদে বছরের পর বছর প্রতিবার নূতন অধ্যাপকদের নেওয়া হয় শুধু এক সেসনের জন্য (অর্থাৎ উক্ত অর্থে)। তা ছাড়া, খাতায় সওয়াশ' লিখে আসলে দিতে হয় একশ' টাকা এরকম বেসরকারী কলেজ এখনও বাংলায় আছে।

অধিকাংশ বেসরকারী কলেজের গভর্ণিং বডিগুলো এক অপূর্ব পদার্থ। গভর্ণিং বডির সভ্যদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি থাকেন, এমন সব ভদ্রলোক যাঁরা হয় শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বোঝেন না, নয়ত শিক্ষা সম্বন্ধে মাথা ঘামানোকে সম্ভবতঃ হাসির ব্যাপার মনে করেন। কলেজ সংক্রান্ত সভায় উপস্থিত থাকার চাইতে কোন অফিসের মিটিঙে, দাবা পাশার আড্ডায়, ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশসুপারের বাংলোতে যখন তখন হাজির থাকা বা চর্বি মেশানো ঘিয়ের ব্যবসা, চাল কাপড়ের সাদা বাজারকে রাতারাতি মিশ-কালো-

বাজারে পরিণত করা, ইত্যাদি বিষয়েই তাঁদের উৎসাহ ও দক্ষতা অবিসম্বাদিত ভাবে অনেক বেশী। এঁরা নিঃসন্দেহে ধনবান্ ব্যক্তি। কলেজীয় শিক্ষায় দীক্ষা লাভ না করেই এরা টাকা করেছেন অনেক। টাকা দিয়ে এরা অনেক বিদ্বান্ লোককে কিনে থাকেন; তারা তখন এদের সেরেস্তায় বেশীকম বেতনে কেরাণীরূপে শোভা পান। কিন্তু 'আদর্শবাদে'র মরীচিকাঙ্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বলতম রত্ন একশ্রেণীর ছেলে আছে, কম টাকা সত্ত্বেও অধ্যাপনার পথে তারা আসে। কলেজ-গভার্ণিং বডির সভ্য হতে পারলে এদের কবলস্থ করা যায়, এদের চাকুরীরূপ দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে শিক্ষাসমস্যার প্রতি প্রতিহিংসা বা ঐ জাতীয় একটা মনস্তত্ত্বঘটিত সুখ অনুভব করা যায়। তাই কলেজের এই সব কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যদের মধ্যে আজকাল দালাল, কনট্রাক্টার, অল্প-শিক্ষিত কুখ্যাত ব্যবসায়ী, স্থূলরুচি দাম্ভিক জমিদার, কলেজে অনেক-টাকাদানকারী নিরক্ষর জোতদার প্রভৃতির প্রচুর সংখ্যাধিক্য। কলেজের অধ্যাপকদের বিদ্যা ও শিক্ষাদানের গুণাগুণ বিচার করে এরাই তাদের কাউকে বহাল রাখেন, কাউকে বিদায় দেন। মফঃস্বল কলেজের গভার্ণিং বডি সম্বন্ধেই অবশ্য এ কথাগুলো বিশেষ করে প্রযোজ্য।

উপরিউক্ত ব্যক্তিবৃন্দ ছাড়া দু' একজন সরকারী কর্মচারীও গভার্ণিংবডিতে কোথাও কোথাও থাকেন। বাকি অংশটা ভরাট হয় স্থানীয় বেসরকারী শিক্ষিত ভদ্রলোকদের দ্বারা। অধিকাংশ স্থানেই এদের অধিকাংশ হচ্ছেন উকিল, মোক্তার, ডাক্তার প্রভৃতি। এখানে সভ্য হওয়ার উদ্দেশ্য প্রায়ই এঁদের বিবিধ। মিউনিসি-প্যালিটি জিলাবোর্ড প্রভৃতি ব্যাপারে স্থানীয় রাজনীতিতে প্রভাব ও সাফল্যলাভের উপায়ের অন্যতম ঘাঁটি হিসাবেই এটার ব্যবহার এদের কাছে প্রধানতঃ গুরুত্বপূর্ণ। কলেজ বাজেটের মধ্যে নানা ফাঁক রেখে, ফাঁক সৃষ্টি ক'রে বা ফাঁক দেখিয়ে বেতন-বর্ধনেচ্ছু অধ্যাপক তথা অন্যান্য কলেজ কর্মচারীদের সুচতুর কৌশলে দমিয়ে রাখা এবং প্রধানতঃ খিড়কির দরজা দিয়ে বিবিধ টাকার অঙ্ক নিজেদের নামে খরচ লিখিয়ে নেওয়ারূপ চমৎকার লাভের খেলা কয়েকজন দলবদ্ধ হয়ে খেলবার সুযোগের জন্যও এদের কেউ কেউ এখানে ঢোকেন। মফঃস্বলের একটা প্রথম শ্রেণীর কলেজের অন্যতম কর্তার কথা আমি জানি। বাংলার পাব্‌লিকের হিতকর কর্মে তাঁকে একাধিকবার জড়িত হতে দেখা গেছে। তবে পাবলিক অর্থের ব্যয় সম্বন্ধে গভীর দুর্নামও তাঁর নামের সঙ্গে একাধিকবার জড়িত হয়েছে। এখানে সেখানে সখ বা ব্যক্তিগত কাজে ভ্রমণের টাকা অন্ততঃ কখন কখন কলেজ তহবিল দোহন করে সংগ্রহের অভ্যাস তাঁর বহুদিনকার পুরানো। কলেজ পে-বুকে অবশ্য লেখা হয় "on duty",—অর্থাৎ কলেজের কাজে তাঁর এই ভ্রমণ এবং খরচ! কলেজের আয় এবং রিজার্ভ ফাণ্ডে জমার অঙ্ক যথেষ্ট বাড়া সত্ত্বেও নির্জলা অসত্য সব বলে কলেজের অধ্যাপকদের বেতনবৃদ্ধি, গ্রেড সৃষ্টি বা প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড প্রভৃতির অত্যন্ত ন্যায্য দাবীকে বছরের পর বছর দাবিয়ে রাখার চেষ্টাতে গভার্ণিংবডিতে তিনি নেতৃত্ব করেন। এদিকে আবার তিনি সম্প্রতি নিম্নবেতনের স্কুল-শিক্ষকদের করুণ অবস্থার উন্নতির আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত ক'রে সভাসমিতি ও সংবাদপত্রের বিবৃতির মারফৎ এদের জন্য নিজের বিগলিতচিত্ততার পরিচয় দিয়ে জনসাধারণের সামনে ন্যায়ের জন্য একজন উৎসাহী সংগ্রাম-কারীরূপে প্রতিভাত হতে চাচ্ছেন। অবশ্য সমগ্র গভার্ণিং বডিতে মুষ্টিমেয় হ'লেও অল্প কয়েকজন সভ্যকায় বিদ্যোৎসাহী, সমাজব্রতী, কালচারের সেবক থাকেন, যাঁরা এই স্বার্থ ও সংকীর্ণতার বিষাক্ত বেষ্টনীকে লজ্জাকর বলেই অনুভব করেন এবং একে সৎসিদ্ধান্তে প্রভাবিত করবার চেষ্টাও করেন। কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় থাকেন অনেক কম,—এবং অনেক সময়েই টাকা আর চলিত অর্থে সামাজিক প্রতিপত্তিও থাকে তাদের কম। ঘোঁট পাকানোর জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় চারিত্রিক গুণগুলিও (!) এদের চাইতে গভার্ণিংবডির উক্তরূপ অন্যান্য সব সদস্যের মধ্যে

স্বাভাবিক ভাবেই অনেক বেশী থাকে। তাই গভর্নিং-বডির কাজকর্ম এবং কলেজের আবহাওয়াকে নির্মলতর করার চেষ্টা এদের কাছেই সফল হয়।

বলা বাহুল্য, কলেজের কর্তৃপক্ষের এই দৃষ্টিভঙ্গী এবং কার্যকলাপের ছাপ কলেজের সাধারণ আবহাওয়ার উপর পড়তে বাধ্য। বর্তমান উচ্চশিক্ষার মূল উদ্দেশ্যকেও তা মলিন না করে পারেনা। পদোচিত বেতনের অনেক কমই দেওয়া হয় অধ্যাপকদের — ফান্ডের আয় যথেষ্ট হওয়াতে যেখানে তা দেওয়া সম্ভবপর, সেখানেও। তারপর আছে কর্তৃপক্ষের খামখেয়াল। বেতন বৃদ্ধি যখনও যা যা হয়, অনেক ক্ষেত্রেই হয় 'খামখেয়ালী' ভাবে, পক্ষপাতিত্বের ভিত্তিতে, গোষ্ঠীগত পদ্ধতির খোশামোদ ও মন রক্ষা করতে পারার ক্ষমতার মাপে। অর্থাৎ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম যা হওয়া উচিত সে ভাবে নয়, পরন্তু "স্বজনবাদ" সমন্বিত নানা সাধারণ অফিস ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের চলতি ধারাতে। এ সব ব্যাপারের টুকরো টুকরো অংশ স্বভাবতঃই স্থানীয় লোকদের কানে যায় এবং কলেজের তরুণ-বয়স্ক ছাত্রছাত্রিদের কৌতুহলী মনও তা জেনে ফেলে। ছাত্র ও সাধারণের মনের উপর এর প্রতিক্রিয়া এবং কলেজ ও অধ্যাপকদের সম্মান সম্পর্কে তাদের ধারণা সহজেই অনুমেয়।

উপরে যে সব গলদের কথা বলা হ'ল তাছাড়া আরও অনেক আছে। প্রবন্ধান্তরে অন্যত্র তা আলোচনার ইচ্ছা রইল। উপরিউক্ত মন্তব্যগুলি কমবেশী পরিমাণে বাংলার মফঃস্বলের প্রায় সবগুলো বেসরকারী কলেজ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য এবং কলকাতার কতগুলো কলেজের অভ্যন্তরে ঐ একই কাহিনী। অবশ্য কলকাতা এবং মফঃস্বলে দু'চারটাতেই ব্যতিক্রম আছে। কিন্তু সে ব্যতিক্রম তো নিয়মকেই শুধু প্রমাণ করে। বর্তমান গভর্নমেন্ট বেসরকারী কলেজগুলোর প্রতি তার যত্নশীল হচ্ছেন না এবং কোন কর্তব্য পালন করছেন না তা'ও বোঝা যায়। জাতীয় গভর্নমেন্ট না হওয়া পর্যন্ত এ দিক দিয়ে অপেক্ষা করতেই হবে। কিন্তু বেসরকারী কলেজগুলোর ভেতরকার ব্যাপার ও আবহাওয়া সম্বন্ধে উপরে যে দু'চার কথা বলা হ'ল,—এই শোচনীয় অবস্থার জন্য প্রত্যক্ষভাবেই আমরা নিজেরাই কি দায়ী? বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের উচিৎ নিখিলবঙ্গ কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি শিক্ষক-সঙ্ঘের সহিত একযোগে সব বিষয় বিস্তৃত অনুসন্ধান ক'রে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য উপযুক্ত তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা। তারপর সে রিপোর্টে উদ্ঘাটিত তথ্যাবলীর উপর ভিত্তি করে বেসরকারী কলেজগুলোর কর্তৃপক্ষের অনতিবিলম্বে সংস্কার বদলানো ও পরোক্ষ সংশোধন বাধ্য করার জন্য ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা উচিৎ। অধ্যাপক-সঙ্ঘের কর্তব্য শুধু বার্ষিক অধিবেশনে প্রস্তাব পাশ, সমস্যার নিছক মামুলী আলোচনা বাস্তবকার্যক্রম উদ্ভাবন ও অনুসরণের চেষ্টাহীন গতানুগতিক বক্তৃতা, সম্মেলনে গৃহীত দু'একটা প্রস্তাব সম্পর্কে নিয়মিতভাবে এবং আধবার ভাইসচ্যান্সেলারের কাছে ডেপুটেশনে যাওয়া,—এই সম্মানহীন, অলস মন্থর-অবাস্তব ধারার মধ্য দিয়েই শুধু উক্ত নিখিলবঙ্গ অধ্যাপক সঙ্ঘ এতদিন তাদের অস্তিত্বের পরিচয় দিয়ে এসেছেন। সুপরিকল্পিত সুদৃঢ় চেষ্টার মধ্য দিয়ে উপরিউক্ত দায়িত্ব পালন করা, সরকারী ও বেসরকারী কর্তৃপক্ষকে সর্বত্র কলেজগুলি ও অধ্যাপকদের প্রতি তাদের সুস্পষ্ট নৈতিক ও আর্থিক দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা, এরই মধ্য দিয়ে শুধু অধ্যাপকদের এই সংগঠন তার বর্তমানের পোষাকীরূপ থেকে মুক্তি পেয়ে তার অস্তিত্বের সার্থকতা প্রমাণ করতে পারে। এই পথে অবিলম্বে অগ্রসর হওয়ার জন্য আমার অধ্যাপক ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট আবেদন জানাই।

ওঁর চাকরিতে সুদ্ধ টান পড়ে যাবে। না খেয়ে মরবার দাখিল হতে হবে আমাদের। সেইজন্য উনি রাগ করেন।

নিমাই বলল, তাই তোমাদের থেকে আলাদা হয়ে থাকব দিদি। আমি দেশের কাজ করব।

সরযূ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, এ সব কু-মতলব কে মাথায় ঢোকাচ্ছে শুনি? অঙ্ক না শিখিয়ে মাষ্টার আজকাল এই সমস্ত শেখায় বুঝি?

নিমাই জবাব দিল না, চুপচাপ পড়ে আছে। ঘুমিয়ে পড়েছে বোধ হয়—সমস্তটা দিন যা ছুটোছুটি করেছে!

কিন্তু সরযূর ঘুম আসে না, বড় ভয় করছে। যে কথা বলল, ঐ সব কি ঘুরছে এখন এদের মাথায়? বাজার-খোলার পথের ধুলো রক্তে ভেসে গেল—তবু কাণ্ডজ্ঞান হল না এদের, এই দুধের ছেলেটা অবধি ভয় পায় নি। কি অভাবিত ব্যাপার ঘটল আজকে—এই বয়সেরই এমনি কত ছেলে নির্ভয়ে এগিয়ে দাঁড়াল রক্তমুখ হ্যামিল্টনের মুখোমুখি, কালেক্টর মার্টিনের আদেশ অবহেলা করে। মার খেয়ে ভয় পায় না, অপমান-বোধ তাতে প্রখর হয়ে ওঠে। অন্নবস্ত্র প্রভাব-প্রতিপত্তি এই সকলের ভাবনা এতকাল প্রকট ছিল, এ কি নূতন ভাবনা, অমোঘ কঠিন সংকল্প দেখা দিচ্ছে দেশের ছেলেদের মধ্যে!

সকালবেলা সরযূ দেখে, নিমাই তার আগে উঠে বেরিয়ে চলে গেছে। দৈবচরণ জিজ্ঞাসা করেন, এসেছিল?

সরযূ ঘাড় নাড়ে। উদ্বেগের স্পষ্ট ছায়া সে দেখতে পেল বাপের মুখে। কিন্তু মুখের দম্ভ ছাড়েন নি তিনি। বললেন, আচ্ছা, যায় কোথায় দেখি। অনিলকে লাগিয়ে দিচ্ছি—

অনিল চক্রবর্তী লেখাপড়া-জানা ভাল ছেলে—হাঙ্গামার আঁচ পেয়ে এই থানায় তাকে স্পেশ্যাল অফিসার হিসাবে পাঠিয়েছে সদর থেকে। অল্পদিনের চাকরি, কাজকর্ম ভাল বোঝে না। এ লাইনের ঝানু লোক দৈবচরণকে প্রথম দিন থেকেই খুব খাতির করে, তাঁর কাছ থেকে সমস্ত রকম কৌশল শিখে নিতে চায়। একলা একটিমাত্র প্রাণী, খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধা হচ্ছিল—দৈবচরণ নিজে থেকে তার কাছে প্রস্তাব করলেন, তাঁর বাড়ি থেকে দু-বেলা দুটি দুটি খেয়ে যেতে। কথাবার্তায় খবরাখবর নিয়েছেন, পালটি ঘর এরা, আর দেশে ঘরবাড়ির অবস্থাও মন্দ নয়। দৈবচরণের মনে মনে গভীরতর মতলব আছে, কিন্তু ঘুণাক্ষরে কারো কাছে তা প্রকাশ করেন নি।

অনিলকে খবর দিয়েছিলেন, সে এসে হাজির হল। দৈবচরণ বললেন, সন্ধান নাও বাবা, এই তো এইটুকু জায়গা—যাবে কোথায়? আমি হলাম চুনোপুঁটি মানুষ—চোর ঠেঙিয়ে আর হ্যামিল্টনকে দিনের মধ্যে বিশ বার সেলাম ঠুকে দিন গুজরান করি, আমার ছেলে গ্যারিবল্ডী হবেন, এঁটোপাতের খোয়া স্বর্গে যাবে। ধরতে পারলে কান ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসো হারামজাদাকে।

অনিল তাঁরই কথার প্রতিধ্বনি করল। যাবে আর কোথায়? কালকে বলেন নি যে! রাতে একদল ইস্কুল ঘরে পড়ে ছিল, ঠিক ঐ দলে গিয়ে জুটেছে—হানা দিলে ধরে ফেলতে পারতাম—

দৈবচরণ বললেন, পালের গোদা হৃষিকেশ—ওকে ধরে নাড়া দাও, সমস্ত খবর বেরিয়ে আসবে।

সমস্ত দিন নিমাইর দেখা নেই, রাত্রেও বাড়ি এল না। সরযূ ঘুমের মধ্যে উঠে বসে পিছনের জানলা দিয়ে বারম্বার সুপারি বনের দিকে তাকায়। কারও ছায়া দেখতে পাওয়া যায় না। যা বলেছে সত্যি সত্যি তাই করল নাকি, সকল সম্পর্ক চুকিয়ে দিল?

পরদিন দুপুরে অনিল খেতে বসেছে। সরযূ তার সঙ্গে স্পষ্টাস্পষ্টি কথা বলে না। সঙ্কোচ কাটিয়ে আজ সামনে এসে জিজ্ঞাসা করল, খোঁজ পেলেন?

অনিল ঘাড় নাড়ল।

কি বললেন মাষ্টার মশাই?

কোথায় আছে কি বৃত্তান্ত কিছু বলল না। কথা আদায় করা বড় শক্ত ওরকম লোকের কাছ থেকে।

কেউ যদি আগুনে হাত দেয় হাত পুড়বে না? দাবী করতে হলে বড়রা জমিদারেরা। যা শত্রুর পরে পরে। নিভে দিবি, [illegible] থাকে জেলেগুলোকে এগিয়ে দেব। এই বুদ্ধিদের মধ্যে নিজে একটু চোখে দেখতে এলাম? বোঝো একবার আক্কেলটা

মহামায়া বললেন, তোমার কথায় [illegible] এই [illegible] হল দাদা [illegible] সেরে উঠব, আমাদের [illegible] থাকব না।

[illegible] হৃষিকেশের সময় [illegible] আপনার [illegible] দিকে চেয়ে [illegible] বললেন [illegible] পারেন যদি আপনার [illegible]

[illegible] মুখ [illegible] তিনি [illegible]

[illegible] তিনি বললেন, [illegible] হয়েছে [illegible] বলছে ইদানী—[illegible] এমন [illegible] আমাদের [illegible] হচ্ছে মাথা খারাপ হয়ে গেল বুঝি [illegible] বলছে অবিশ্যি, সমস্ত ঠিক হয়ে যাবে।

হৃষিকেশ বললেন নবে নাটের স্বরু। আরও কত হবে।

শিউরে উঠে কালীনাথ বললেন, বাপ্‌ কি ব্যাপার? এমনি মারামারি চলবে নাকি এখন থেকে?

সহজ উচ্ছ্বাসহীন কণ্ঠে হৃষিকেশ বললেন, কত মানুষ মরবে। বণিক রাজার প্রত্যাপালক উদ্দেশ্য তো নয়, শাসনের একটা কাঠামো সামনে খাড়া রেখে নানা প্রক্রিয়ায় আমাদের হাড় মাংস অবধি শুষে নিচ্ছে নাগপাশের বাঁধন ছেড়ে মুক্ত আমরা হবোই—সংঘর্ষ অনিবার্য।

অকম্পিত কণ্ঠস্বর চোখের সামনে যেন তিনি রক্তাক্ত ভাবীকালের ছবি দেখতে পাচ্ছেন। লাঞ্ছনার পথ পরিক্রমণ করতে হবে। তাঁরা প্রস্তুত।

কালীনাথ সবিস্ময়ে হৃষিকেশের দিকে তাকালেন। এ সমস্ত কি কথা তাঁর মুখে? সেদিনের পর থেকে নগণ্য ইস্কুলমাষ্টার একেবারে যেন ভিন্ন মানুষ হয়ে গেছে। অচেনা দূরের মানুষ। কালীনাথের মতো সরকারী লোকের পক্ষে এর সামনে বসে থাকাও বিপজ্জনক। উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

নীলরতন চোখ বুজে ছিল, [illegible] উঠেছে। স্থির দৃষ্টিতে হৃষিকেশের মুখের দিকে চেয়ে ছিল। হৃষিকেশ প্রশ্ন করলেন, চিনতে পারো?

ঘাড় নাড়ল নীলরতন। [illegible] স্বরে বলল, মাষ্টার মশায়।

হৃষিকেশ দু-হাতে তার একখানা হাত টেনে কোলের মধ্যে নিলেন। গভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, কষ্ট পাচ্ছ—না?

না—বলে নীলরতন ম্লান হাসি হাসল। তারপর একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলল। কতক্ষণ এসেছেন মাষ্টারমশায়? আর সবাই ভাল আছে?

হৃষিকেশ বললেন, না, ভাল নেই। ভাল থাকবার কথা তো নয় ভাই। তেরো মেয়ে [illegible] আমাদের মধ্যে আগুন নিভিয়ে দেবে কে বলছে [illegible] কেনাবে।

মাঝখানে নীলরতন অন্য কথা তুলল। এই প্রথম দেখতে এলেন বুঝি মাষ্টারদা? মামা বলাবলি করছিলেন। সমস্ত আমার কানে আসে, জবাব দিতে ইচ্ছা করে না।

হৃষিকেশ বললেন, সময় পাইনি। কত কাজ। তাড়াতাড়ি তুমি ভাল হয়ে ওঠ ভাই। পথের মুখ খুলে গেছে—বড় দুঃখের দুর্গম পথ—

হঠাৎ তিনি স্তব্ধ হলেন। বোধ হয় মনে পড়ল, রোগীর শয্যার সরে বসে এমন করে বলা ঠিক হচ্ছে না। মুগ্ধ চোখে তিনি নীলরতনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। প্রত্যাশার অতীত নূতন আলো দেখা যাচ্ছে। অত্যাচার এদের মাথা ফাটিয়েছে, শিরদাঁড়া ভাঙতে পারেনি। দূর থেকেই পশুবলের আতঙ্ক—আঘাত এসে পড়লে হাস্যনাট্য-

হৃষিকেশ হেসে বললেন, স্বদেশি কাপড়—নতুন তৈরি হয়েছে। পা দিতে নেই, মাথাতে তুলে রাখলে সবাই সরযূ—

সরযূ অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, রাগের বশে এক বছর আগে একদিন কি বলেছিলাম, আপনারা তাই মনে করে রেখেছেন? শাড়ি দিয়ে অপমান করতে এসেছেন এতদিন পরে। আপনার মতো মানুষও এসেছেন মাথার মণি।

হৃষিকেশ বললেন, পড়া হয় নি ছ, সামনে রাখিবন্ধনের পর্ব। দেশের সঙ্গে দেশের মানুষের বেঁধে একখানা কাপড় নিমাইয়ের বোনের জন্য নিয়ে এসেছি। এতে অপমান হলে বিবেচনা করো। উচিত হলে দাম দিতে পার, যত খুশি দাও—আর দেবার।

বিস্ময়ে কেমন যেন সরযূর সমস্ত ক্ষোভ গেল। সে প্রশ্ন করল, নিমাই কোথায় আছে বলতে পারেন?

সে পাগলা খুড়োর সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভালো আছে এই শুধু বলতে পারি।

পরশুর দিন ভাঙনের খবর চঞ্চল করে তুলল শহরটাকে। ছোটখাট নয়, গোরাদের স্পেশ্যাল ট্রেন বোমা মেরে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছে, সাহেব আহত আছেন, জখম হয়েছে শুধু ড্রাইভারটা। মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডকে মারতে গিয়ে মেরে ফেলেছে ব্যারিস্টার কেনেডি ও তাঁর স্ত্রী কন্যাকে। পুলিশের হাতে ধরা না দিয়ে প্রফুল্ল চাকি আত্মহত্যা করল, ফাঁসি হল ক্ষুদিরামের। দেশের লোক বাঙালি ছেলের প্রথম এই বিপ্লবী রূপ দেখে অবাক কাল ভেবে মাছ ভাতের তালের মতো সর্বদা থরথর চঞ্চল হয়ে সংকেতের যেন ঝাঁপ দিয়েছে এখানে ওখানে সকলে সজাগ দৃষ্টি।

কোথায় আছে এখন নিমাই, আজকাল অনেক সময় ভাবে সরযূ। সহজ সাধারণ মানুষগুলো আজ যেন রহস্যাবৃত হয়ে গেছে। হৃষিকেশ মামাকেও যেন আর চেনা যায় না, না রতনকে, না দরবেশ দাকে। সমস্ত দেশে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই, স্বদেশি ছেলেদের সম্বন্ধে নানা আজগুবি কাহিনী প্রচারিত হচ্ছে লোকের মুখে মুখে। দিনদিন খাওয়া পরা চাকরি-বাকরির ও নাগরিকত্ব পরিবেষ্টনীতে যেসব মানুষগুলোকে বাঁকা মেরে সংকীর্ণ করে দিয়েছে; সেই বাঁধন যে সব আদর্শ ভাবনা—মানুষ যার আবেশে পতঙ্গের মতো অগ্নিদাহন বুক পেতে নেয়—সেদিকে চিত্ত বিস্ফারিত হয়েছে ছেলেদের। ম্যাটসিনি গ্যারিবল্ডির জীবনী, নন্দকুমারের ফাঁসি, ঝাঁসির রানীর কাহিনী, দেশভক্তের দেশের কথা, গীতা আর বিবেকানন্দের বই পড়ছে, কুস্তি ও লাঠি খেলা করছে, নানারকম সমিতি গড়ছে, বিপদের উপকার করে বেড়াচ্ছে। যেন প্রাণের জোয়ার এসে গেছে দূর গ্রামেও অবাধ।

প্যালেষ্টাইন

শ্রীকাশীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃটেনের ম্যাণ্ডেট শাসনে সাতাশ বছর কাটিয়েও প্যালেষ্টাইনের সমস্যা জটিলতর হয়ে উঠেছে। বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ বেভিন প্যালেষ্টাইন সমস্যা সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানে উত্থাপন ক'রে নিজেদের অক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছেন। সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠান এক কমিশন নিযুক্ত করেছে। এই কমিশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হ'য়েছেন সুইডেনের প্রধান বিচারপতি মঃ এমিল স্যাণ্ডষ্ট্রোয়েম্। সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এই কমিশন প্যালেষ্টাইনে গিয়ে সরেজমিনে সেখানকার সমস্যার তদন্ত করবেন।

প্যালেষ্টাইনে ইহুদী আরবদের মধ্যে সংঘর্ষ বেড়ে উঠেছে এবং দুপক্ষ থেকেই বৃটিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জমা হয়েছে। ইহুদীদের সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ এবং তা দমনে বৃটিশ শক্তির সদম্ভ প্রচেষ্টার রহস্যময় ব্যর্থতা পৃথিবীতে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে। বেআইনীভাবে ইহুদীদের প্যালেষ্টাইনে প্রবেশ, সেখানে ইহুদী রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার জন্য তাদের দৃঢ় পণ, আরবদের সঙ্গে সংঘর্ষ আর বৃটিশ শক্তির প্রতি তাদের বেপরোয়া হিংসামূলক কাজ দেখে মনে হয় শুধু নিছক ইহুদী বা আরবদের সমস্যাই প্যালেষ্টাইনে ঘনীভূত হ'য়ে ওঠেনি, এই ব্যাপারের অন্তরালে দুনিয়ার প্রভুত্বকামী রাষ্ট্রশক্তির লোভও লুকানো আছে।

সত্যই প্যালেষ্টাইনে নরক সৃষ্টি হ'য়েছে। কাঁটাতারের বেড়া, সামরিক আইন, প্রকাশ্য বেত্রদণ্ড, গোলাগুলি, বোমা-কামানে ভয় দিয়েও বৃটিশসিংহ সেখানে কম্পমান। এমনও ঘটনা ঘটেছে, ইহুদী সান্ত্রাসবাদীকে তেল্ আবিব্-এর বাজারে প্রকাশ্যে বেত্রদণ্ড করার প্রতিশোধ বৃটিশ-সিংহের সিংহত্বের প্রতীক এক সামরিক অধিনায়ককে জোর ক'রে আটকে তাকেও বেত্রদণ্ড দেবার পর ইহুদীরা সেই বৃটিশ অধিনায়ককে আবার ফিরিয়ে দিয়েছে। এই রকম বহু ঘটনাই ঘটেছে। যারা অর্ধ পৃথিবী জুড়ে হাহাকার সৃষ্টি করেছে এবং নিজেদের রাজ্যে কখনও সূর্য অস্ত যায় না ব'লে যাদের গর্বের সীমা নেই সেই বৃটিশ ভাগ্যাকাশে যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, তা এই রকম ঘটনা থেকে বেশ আন্দাজ করা যায়। গত মহাযুদ্ধে জয়লাভ করেও বৃটিশ শক্তির খর্বতা স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে! কিন্তু প্যালেষ্টাইনে এই ইহুদীদের টেনে আনলো কে? ইহুদীদের সমস্ত সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি বৃটিশই দিয়েছিল, আরবদেরও কায়দা ক'রে বিপরীত প্রতিশ্রুতি দিতেও তারা কসুর করেনি। এরকম ভেদ সৃষ্টি করার মূলে কোন্ অভিপ্রায় লুকানো ছিল? আজ বৃটিশ হাইকমিশনারের অধীন প্যালেষ্টাইনের সমস্যা সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানে উত্থাপনের মধ্যেই বৃটিশের বহু প্রচলিত "সদিচ্ছা" (?)ই কি কাজ করছে না?

দুর্বল বৃটেনের হাতে আর চাবিকাঠি নেই। সবল প্রতিদ্বন্দ্বী আমেরিকার সঙ্গে মতে না মিললেও, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে প্যালেষ্টাইন সমস্যা জাতি প্রতিষ্ঠানে তুলতে হ'য়েছে।

প্যালেষ্টাইনে বিরোধ আর সংঘর্ষ কেমন ক'রে সমস্যার আকারে দেখা দিল তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। বর্তমান সমস্যা বিশদভাবে আলোচনা করার পূর্বে এখানে ইহুদী সমস্যা আনুপূর্বিক আলোচনা করা দরকার।

৩

ইসরাইল জাতি প্যালেষ্টাইনে ভূমিদেবতা বল-এর পূজা প্রতিষ্ঠিত দেখেছিল। তাদের নিজেদের দেবতা 'ইয়াহুই'—যা থেকে পরে ইহুদী নাম এসেছে, তিনি এই ভূমিদেবতাই ছিলেন। মানুষের ভাগ্য ও জগতের ব্যাখ্যা সর্বাঙ্গপূর্ণ করবার জন্য এই দেবতাকে ক্রমশঃ সম্মিলন ঘটিয়ে ক্রমে ভগবানের রূপ দেওয়া হয়। হ'য়ে ওঠে ইহুদীদের ধর্ম। যীশুখৃষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত এই ধর্মের প্রধান পাণ্ডা পুরোহিতরা বিচারকর্তা রূপে দেখেছিল তাকেই। এর পবিত্র বাণী অন্যান্য ধর্মের মধ্যে ছড়িয়ে থাকে। খৃষ্ট এলেন, এই ধর্মের সংস্কারক রূপে। নিজেদের পুরোহিতদের অপমান সহ্য করতে না পেরে ইহুদী সমাজ যীশুখৃষ্টকে প্রাণদণ্ড দিলে, যত দিক ভগবানের সন্তানের মৃত্যুকালীন আবেদন সত্ত্বেও তারা ভগবানের ক্ষমা পেল না। যীশুর পর খৃষ্টান ধর্মের ব্যাপক প্রচারের সময় ইহুদী-বিদ্বেষীরা নিজেদের প্রতিশোধ খুঁজে নেয়—রোমান জাতি, তার পরে ইউরোপের সমস্ত শক্তিশালী জাতি, সমস্ত তাদের রাষ্ট্রশক্তি বাড়াবার জন্য প্রচার করে যীশুখৃষ্টের নিগ্রহকারী ইহুদীদের প্রতি ঘৃণা ও অবহেলা আর অত্যাচার করতে সুরু করলে। প্যালেষ্টাইন আর ইহুদী ভগবানের পবিত্রভূমি রইল না, তা খৃষ্টান-ভগবানের আবাসস্থলে পরিণত হল। প্যালেষ্টাইনে হানা দিল রোমানেরা, পরে তুর্কী জাতি। এই প্যালেষ্টাইনকে উপলক্ষ ক'রেই ইসলাম শক্তির বিরুদ্ধে খৃষ্টান শক্তিসমূহের মিলিত প্রতিরোধ ক্রুজেড বা ধর্মযুদ্ধ নামে পৃথিবীর ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে, মানুষকে ধর্মের নামে উত্তেজিত ক'রে জেরুজালেম বিধর্মীদের হাত থেকে উদ্ধার করাই কিন্তু কোন ইউরোপীয় রাষ্ট্রশক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। ইউরোপের প্রভুত্বকামী বিভিন্ন রাষ্ট্র-শক্তি নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য প্যালেষ্টাইনের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। উদ্দেশ্যে তারা একমত হ'য়েছিল কিন্তু কাজে তাদের দারুণ বিরোধ র'য়েই গিয়েছিল। তাই মধ্যযুগে সেলজুক তুর্কীদের অধিনায়ক সালাদিনের কাছে ইউরোপের মিলিত রাষ্ট্রশক্তির বাহিনীসমূহকে পরাজয় স্বীকার ক'রে শেষ পর্যন্ত তীর্থযাত্রার অধিকারটুকু মাত্র নিয়ে সন্তুষ্ট হ'তে হ'য়েছিল। এই সময় জগৎ সংসারের মধ্যে ইহুদীরা খৃষ্টান ও মুসলমান দুই ধর্মের লোকদের কাছে নির্যাতন সয়েছে আর আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সমস্ত পৃথিবীতে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেছে। কিন্তু অপূর্ব এই ইহুদী জাতির স্বাধীনতা-বোধ। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যেখানেই তারা গিয়েছে কোথাও তারা তাদের স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ করেনি। বরং তার কারণ সৃষ্টি হয়েছে এবং সব দেশেই নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতি বিশিষ্টভাবে রক্ষা করেছে। তুর্কীদের অধীনে প্যালেষ্টাইন ছিল, কিন্তু সেখানেও ইহুদী বৈশিষ্ট্য লোপ করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, যেমন ব্যর্থ হ'য়েছে বর্তমান যুগের নাৎসী হিটলারের সর্বাত্মক ইহুদী-ধ্বংসের প্রচেষ্টা। বেলসেন আর অশ্‌উইৎসের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা সকলের মনে প'ড়বে। কিন্তু সেখানকার বিভীষিকা। অত্যাচার ইহুদী সংস্কৃতিকে পৃথিবী থেকে মুছে দিতে পারেনি।

ডগলাস রিড নামে ইউরোপে বিলাতের 'টাইমস' পত্রিকার সংবাদদাতা ছিলেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত পুস্তক Disgrace Abounding এর মধ্যে হিটলারের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করেছিলেন এবং বলেন যে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সাহায্য দিতে পারছে না তার জন্য অভিযোগ করেছিলেন। কিন্তু হিটলারের ইহুদীবিরোধী কার্যকলাপে তিনি প্রচ্ছন্ন সমর্থন জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির ভাগ্যবিপর্যয়ের মূলে ইহুদীরা ছিল বলেই হিটলার তাদের বিতাড়নের চেষ্টা করেছিলেন একথা ভুল। বরঞ্চ নিজেদের জাতীয় সত্তার ভাবনায় সচেতন হওয়ার ফলে ইহুদীরা কোন দেশের বা জাতির স্বার্থকে নিজেদের ব'লে মেনে নেয়নি। তাই তারা বিচ্ছিন্ন

হয়ে অন্য জাতির সঙ্গে বা অন্য দেশে স্বস ক'রলেও নিজেদের স্বার্থ বিকিয়ে দেয় নি। আজ তারা জাতি বা দেশের স্বার্থের পাশে একদিন লক্ষ্য রাখেনি, বরঞ্চ বিপন্ন করেছে।

স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ক্রমশ প্যালেস্টাইনে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ইহুদী ও আরবের মধ্যে ছোটখাটো বিবাদ হ'লেও তারা বহুদিন মিলেমিশে ছিল। কিন্তু বৃটিশ প্রথম মহাযুদ্ধের পর ম্যাণ্ডেট পেয়ে যেই এদেশে শাসন করতে শুরু করল অমনি ইহুদী আরব অসন্তোষ দেখা দিতে লাগল। বৃটেনের সাধু সঙ্কল্প থাকে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা। স্বাধীনতাকামী জাতির স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে বৃটেন প্রশংসা কুড়াবার জন্য যত চেষ্টা করুক না কেন—রহস্য খোলা থাকে। বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে যেখানে ঘা লাগছে সেখানেই এই অন্তর্বিরোধ ক্রমশ ঘনীভূত হ'য়ে এক জটিল সমস্যায় পরিণত হয়েছে। ভারতবাসী আমরা এখন হাড়ে হাড়ে বুঝি প্যালেস্টাইনেও যে ইহুদী বা আরব কোন জাতির মঙ্গলসূচনা বৃটেনের পক্ষে সম্ভব নয়। সেখানকার অধিবাসী নয় তারা, বৃটিশের পক্ষ থেকে এরকম প্রচার শুনে আমাদের হাসি পায়। আমরা অসহায় যেমন তার সঙ্গে দাঙ্গাবিধ্বস্ত ভারতবর্ষের শক্তির অপচয়ের দিকে তাকিয়ে ভাবি মুসলমান বিরোধের জন্য যে স্বাধীনতা পাচ্ছি না তা না হ'লে বৃটেন সেই স্বাধীনতা উপড়ে ফেলে দিত—এই সব প্রচারকার্যের মূল সূত্র ধরতে পারি।

যাহোক প্যালেস্টাইন প্রসঙ্গের সূত্র অবলম্বন করাই ভাল।

৪

প্যালেস্টাইন সমস্যা সেই সঙ্গে ইহুদী ধর্ম ও জাতির সম্পর্কিত জটিলতা বর্তমান জগতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সুইজারল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত প্রথম জায়োনিষ্ট কংগ্রেসের অধিবেশনের (১৮৯৭) পর। এই কংগ্রেসের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন Theodor Herzl. কুড়ি বছর পর এই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সফলতার দিকে অগ্রসর হয়। রাশিয়ার অধিবাসী ডক্টর চায়েম ওয়াইজম্যান শক্তিশালী ইহুদী নেতা। ইনি পরে বৃটিশ প্রজা ব'লে স্বীকৃত হন। এঁরই চেষ্টায় বৃটিশ রাষ্ট্রপুরন্ধরেরা ইহুদীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হ'য়ে ওঠেন। মিঃ ব্যালফুর ১৯১৭ সালের ঘোষণায় বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রথম ঘোষণা করেন :—

প্যালেস্টাইনে ইহুদীজনগণের জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা বৃটিশ সরকার সমর্থন করেন এবং এই উদ্দেশ্য লাভের জন্য বৃটিশ সরকার সর্বতোভাবে চেষ্টা করবেন। তবে একথাও মনে রাখতে হবে যে, প্যালেস্টাইনে ইহুদী ব্যতীত অন্য যে সম্প্রদায়ের নাগরিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় অধিকার আছে তা ক্ষুণ্ণ হবে না। অন্য কোন দেশে ইহুদীরা যে রাষ্ট্রীয় অধিকার ভোগ করেন তাতেও কোন হস্তক্ষেপ করা হবে না।

প্রথম দিকে বৃটিশ মন্ত্রিসভার অনেকে ভয় করেছিলেন যে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী মানা হ'লে ইহুদী বিরোধী কার্যকলাপ বেড়ে যাবে। কিন্তু লর্ড ব্যালফুর আর মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসনের সমর্থনে ... মন্ত্রিসভার আশঙ্কা দূর হ'য়েছিল। বৃটিশ কূটনীতির কোন সূত্র অবলম্বন করে এই আশঙ্কা দূর হ'য়েছিল তার সঠিক খবর লর্ড ... প্রমান প্রভৃতি ইহুদী নেতাদেরই জানা আছে। বিজ্ঞানী ডাঃ ওয়াইজম্যান বিস্ফোরক সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধে বৃটেনের পক্ষে কাজে লাগিয়েছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে সিন্থেটিক রবার প্রস্তুত করে আমেরিকাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

ব্যালফুর ঘোষণার পরেই সমস্ত ইহুদীদের মধ্যে উল্লাসের সাড়া প'ড়ে যায়। কিন্তু এ উল্লাসের মধ্যে তারা এর স্থায়ী কল্যাণ প্রতিষ্ঠার অন্তরায়ের কথা তারা ভেবে দেখেনি। বৃটিশের প্রতিশ্রুতির মূলে যে মধ্যপ্রাচ্যে ও সুদূরপ্রাচ্যে নিজেদের সুবিধা বিস্তারের ও প্রয়োজনীয় তৈলসম্পদ সংগ্রহের কেন্দ্র হিসাবে প্যালেস্টাইনকে ব্যবহার করার প্রচ্ছন্ন

অভিলাষের চরিতার্থতা [illegible] দেখবার সময় হয়নি।

[illegible] পর বালফোর ঘোষণা অন্তর্ভুক্ত ক'রে প্যালেষ্টাইনকে বৃটিশ ম্যাণ্ডেটের অধীন করা হয়। আরবরা ইহুদী রাষ্ট্র [illegible] প্রতিবাদ করে। প্যালেষ্টাইনের ১৪ লক্ষ ৮৫ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ১০ লক্ষ অধিবাসীই আরব, আর মাত্র [illegible] হাজার ইহুদী। অথচ [illegible] [illegible] সাম্রাজ্যবাদী আরব [illegible] [illegible] বৃটিশ সরকার [illegible] আরব [illegible] [illegible] ফিরিয়ে দেবে [illegible] আরবরা খালিফকে [illegible] সালে [illegible] নেতাদের [illegible] প্যালেষ্টাইন [illegible] বৃটেনকে ম্যাণ্ডেট দিয়ে [illegible] স্বাধীনতার আকাঙ্খা একেবারে বিসর্জন করেননি।

ইহুদীরা দলে দলে প্যালেষ্টাইনে যেতে শুরু করে। আরবেরা [illegible] সালে আর ১৯২৯ সালে বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহ দমন ক'রতে বৃটিশ শক্তিকে বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় বিদ্রোহের পর ইহুদী প্রবেশ নিষেধ করা ও প্যালেষ্টাইনের রাষ্ট্রীয় পরিষদে আরব সংখ্যাধিক্য রাখার সুপারিশ করা হয়। ইহুদীদের প্রতিবাদে এই পরিকল্পনা পরে বাতিল করা হয়। জার্মাণীর অত্যাচারে ইহুদীরা আইনভঙ্গ করেও প্যালেষ্টাইনে যেতে থাকে। তখন আবার আরবেরা গোলমাল শুরু করে। ১৯৩৭ সালে পিল কমিশন প্যালেষ্টাইন বিভাগের সুপারিশ করেন। উভয় জাতিই এই বিভাগে সম্মত না হওয়ায় এই পরিকল্পনাও পরিত্যক্ত হয়। ১৯৩৯ সালে বৃটিশ সরকার ঘোষণা করেন, যে প্যালেষ্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা তাদের নীতি নয় [illegible] দশ বৎসর সময়ের মধ্যে [illegible] স্বাধীন প্যালেষ্টাইন-রাষ্ট্র-গঠনই বৃটিশের লক্ষ্য বলে জানানো হয়। বৃটিশ পররাষ্ট্র নীতির [illegible] বালফোর ঘোষণার [illegible] আরবরা [illegible] আন্দোলনে এই ঘোষণা [illegible] লীগ অব নেশনের ম্যাণ্ডেট কমিশন বৃটিশ ঘোষণা সমর্থন করেনি। কিন্তু [illegible] সর্বনাশা যুদ্ধ বেধে গেছে। [illegible] আরবেরা [illegible] আর [illegible] ইহুদী [illegible] বৃটিশের দিকে [illegible] তাদের দাবী পূরণ হবে [illegible] ইহুদীরা [illegible] প্যালেষ্টাইনের [illegible] যে কোন উপায়ে [illegible] মার্কিন সাহায্য তাদের বহুগুণে উৎসাহিত করেছে। আর আরবেরা তাদের শত্রুর [illegible] প্রতিশোধ তোলবার চেষ্টা করেছে। [illegible] বৃটিশ সাম্রাজ্য-শক্তির [illegible] নিজের বুকেই [illegible] আজ ইহুদী ও আরব উভয়ের বিক্ষোভই বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে [illegible] কিন্তু আজও এক বেশী যে তারা নিজেদের পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে দিন আগত ঐ। বর্তমানে সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানের নিযুক্ত প্যালেষ্টাইন কমিশন [illegible] আলোচনা [illegible] বেশ বোঝা যাবে।

প্যালেষ্টাইনে বৃটিশের স্বার্থ [illegible] একটিই পূর্ব ভূমধ্যসাগরে যাবার ঘাটিপথ, আবার এ প্যালেষ্টাইনের বুকের উপর থেকে সুয়েজ খালের উপর [illegible] করার সুবিধা আছে। সুদূর প্রাচ্যে [illegible] নিজেদের স্বার্থরক্ষার [illegible] পথ বৃটিশের পক্ষে হারানো ক্ষতিকর। এখানকার হাইফা বন্দরে ইরাকের

স্বপ্ন

চুন-চান-ইয়ে

অনুবাদক ঃ—শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্তী

[চুন-চান-ইয়ে একজন তরুণ চৈনিক লেখক, যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে টোকিওতে ছিলেন এবং জাপানীগণ কর্তৃক সৈন্যদলে যোগদান করিতে বাধ্য হন। পরে চীনে ফিরিয়া আসিয়া কিছুদিনের জন্য চীনা জাতীয় বাহিনীতে কার্য করেন এবং অতঃপর তিনি পরিব্রাজকরূপে অধিকৃত চীন হইতে স্বাধীন চীন পর্যন্ত বিদ্যালয়গুলিতে বক্তৃতা ও শিক্ষকতা করিয়া বেড়ান। ১৯৪৪-৪৫ সালে শীতকালে তিনি তথ্যবিভাগ (Ministry of information) কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত হইয়া দেশভ্রমণের জন্য এবং চীন সম্বন্ধে বক্তৃতাদানের জন্য ইংলণ্ডে আসেন। বর্তমানে ইনি কেম্ব্রিজের 'কিংস্ কলেজে' ইংরাজী সাহিত্য বিষয়ে গবেষণাকার্যে নিযুক্ত আছেন। ইংরাজী ভাষায় প্রথম গল্প ১৯৩৮ সালে নিউ রাইটিং পত্রিকায় বাহির হয়। তাঁহার 'স্বপ্ন' গল্পটীও মূল ইংরাজী হইতে অনুদিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় মনুষ্যজীবনের সমস্যাসঙ্কুল কাহিনী অবলম্বনে এই গল্প রচিত এবং ইহাতে লেখকের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা ও কবিদৃষ্টির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। —অনুবাদক]

পাহাড়ে তখন ভীষণ গরম। এত গরম যে শ্বাসরুদ্ধ হবার উপক্রম হয়। আমি সারাদিনই হাঁটছিলাম। ঘামে সমস্ত শরীর ভিজে গেছে এবং পা দুটোতেও ফোস্কা পড়েছে। কিন্তু অবশেষে এক অপ্রশস্ত ঢালু জায়গায় এসে পৌঁছলাম এবং তার নীচুদিকে চলতে গিয়ে 'টুংটিং' হ্রদ দেখতে পেলাম। সূর্য তখন অস্তাচলে চলে পড়েছে এবং মন্দমন্দ বাতাস বইছে—নির্মল ঠাণ্ডা বাতাস। এখানে কোন আশ্রয়প্রার্থী নেই, রাস্তায়ও লোকের ভিড় দেখা যাচ্ছে না এবং মাথার ওপরও জাপানী বিমান উড়ছে না। যুদ্ধটা অন্ততঃ পিছনে পড়ে আছে। আমি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লাম—সত্যিকারের স্বস্তির নিঃশ্বাস। পরে জলের ওধার থেকে কুকুরের একটা ডাক শুনতে পেলাম। তার-পরই সব শান্ত হয়ে গিয়ে হ্রদের চারদিকে একটা পূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে থাকল।

আমি পিঠ থেকে ময়লা কাপড়ের পুঁটুলিটা নীচে নামালাম এবং সেটাকে বালিশের মত পিছনে রেখে ঘাসের ওপর নিজেকে এলিয়ে দিলাম। আকাশটা এতক্ষণ নীচেকার জলের মত নীল ও শান্ত দেখাচ্ছিল, এবার তা যেন লজ্জার রক্তিম আভায় ভরে উঠল। ঘরমুখো একঝাঁক হাঁস শোকার্ত ক্রন্দনে ডানা ঝাপটিয়ে পূবদিকে পার হয়ে গেল। সূর্য তখন অস্ত গেছে।

কিছুক্ষণের জন্য কোন শব্দই শোনা গেল না, এমনকি সেই গঙ্গাফড়িংয়ের শব্দ যা এখানকার পথে অনেকবার শুনেছি। কিন্তু ক্রমশঃ দূর সমুদ্রের ঢেউয়ের মত একটা ক্ষীণ শব্দ ভেসে এল প্রথমে যা মোটেই বোঝা গেল না কিন্তু পরে স্পষ্টই ঘণ্টার শব্দ বলে মনে হল। একটা দমকা হাওয়ায় সেটা বেড়ে চলল। অবশেষে সেটা যে কি তা খুঁজে পেলাম। সেটা একটা গান, খুবই পরিচিত গান যা আমি গোপালক থাকার সময় মধ্যচীনের বিশাল গোচারণ ভূমিতে মেয়েদের গাইতে শুনেছি এবং যে গানটা আমাকে উন্মনা করে দিত। গানটা এই রকম ঃ

দাওগো আমায় তোমার সাথে আকাশ পারে যেতে
দাওগো আমায় তোমার সাথে সাগর পারে যেতে।
সাগর যাক শুকিয়ে,
পাহাড় যাক ফুরিয়ে ;
তবু মন আমার কভু টলবে নাকো,
ওগো মন আমার কভু টলবে নাকো।

এই নির্জন স্থানে এ গান শুনে আমি বিস্মিত হলাম। আরও বেশী বিস্মিত হলাম এই ভেবে যে কাছাকাছি এমন কোন মানুষ আছে যে এত সুন্দর গান গাইতে পারে। মানুষ! একথা ভাবতেই আমার খাবারের কথা মনে পড়ল। যতই ভাবলাম ততই খিদে বাড়তে লাগল

আমার শিল্পী। প্রথম শ্রেণীর নর্তকী ওরা। বুঝলে, এরেবারে প্রথম শ্রেণীর।'

কথা বলতে বলতে আমরা পাহাড়ের ঢালের একটা বড় কাঠের পরিত্যক্ত [illegible] বাড়ির বারে এসে পৌঁছোলাম।

'এখানেই [illegible] হবে বন্ধু।' সে বললে। আমরা [illegible]। সবই এখানে শান্ত ও জনশূন্য। আমি [illegible] দশটা [illegible] কাঠের [illegible] ছেলের একটা আলো জ্বাললাম যখন এরটা ইঁদুরকে পর্যন্ত বেরিয়ে যেতে দেখলাম না। আমি একটু হতভম্ব হলাম মুখের [illegible] পর আবার আলোতে দাঁড়িয়ে রইলাম, কি করতে [illegible] [illegible] পেট-পায়ের [illegible] চুলিগা [illegible] বাঁধনের [illegible] পা [illegible] লাগল।

[illegible] আমার সামনে দণ্ডায়মান [illegible] মেয়েটিকে দেখিয়ে বললে, 'এ আমার বড় মেয়ে ভায়োলেট। আর ঐ আমার ছোট [illegible]।' তারপর সে শুকনো ঘাসের গাদা খপ করে বসে [illegible] তাকে [illegible] দিল এবং একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললে।

[illegible] দিনটা শেষ হল।'

[illegible] পরিচিত হয়ে আমি হাসছিলাম। [illegible] এমনভাবে [illegible] [illegible]। যখন তারা আমার দিকে [illegible] আমি দেখলাম [illegible] চোখগুলো আমার প্রতি [illegible] অভিনন্দন [illegible] দীপ্ত হয়ে উঠেছে। [illegible] আমার মনে একটা চিন্তার উদয় হল, আমি বুড়োকে বললাম 'বুড়োমশাই, আমি কি আপনার দলে যোগ দিতে পারি?'

'সেকি তোমাকে ত ছাত্র বলে মনে হচ্ছে—লেখাপড়া-জানা লোক তুমি।' বুড়ো আমার দিকে বিস্মিত ভাবে চেয়ে বললে।

'[illegible] কর বললে কি আমাদের কাজটা ভারী [illegible]।'

আমি জোর দিয়ে বললাম, 'তাতে কিছু এসে যাবে না। আমিও [illegible] বাজনা বাজাতে পারি। আর আপনি নিজে যখন একজন [illegible] তখন আমার মত [illegible] নিশ্চয়ই [illegible] না কোন কাজে লাগাতে পারবেন।'

আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে আমার কথা বলার [illegible] একটু বেমানান [illegible] কিন্তু অন্য উপায়ই বা কি? [illegible] আমার মুখ থেকে আপনা আপনিই বেরিয়ে পড়েছিল। যা হোক, [illegible] আমার [illegible] খুশী হয়েছে। সে বললে 'বেশ ত, তুমি যখন আমাদের দলে [illegible] —[illegible] সব [illegible]।'

আমি খুশী হলাম [illegible] আমার [illegible] সমস্ত [illegible]। সঙ্গে সঙ্গেই [illegible] গেল। আমি তাদের [illegible] জ্বালতে এবং [illegible] আহার তৈরী করতে সাহায্য করলাম। আমাদের অনেক কথাবার্তা হল, প্রথমে [illegible] কথা। আমি জানতে পারলাম যে তারা [illegible] অধিবাসী, কিন্তু তাদের পূর্বপুরুষরা মধ্যযুগে [illegible] সেখানে [illegible] বসবাস করছিল। সেই জন্যই তাদের মুখে গান শুনে আমার পরিচিত মনে হয়েছিল। আমি আরও দেখলাম যে ভায়োলেটের কান্না ও নারীসুলভ [illegible] আমাকে মুগ্ধ করেছে। [illegible] টানা [illegible] চঞ্চল ও নিস্তব্ধ [illegible] কালো চোখদুটিও আমার ভাল লাগল।

[illegible] পর বুড়ো লোকটা ঘাসের গাদার ওপর নিজেকে ফেললো এবং শুভরাত্রি না জানিয়েই পরক্ষণে ঘুমিয়ে পড়লো। কিন্তু তার জিভ তখনও নড়ছে এবং ঠোঁটের ওপর লেগে থাকা চর্বি ও মাংসের ঝোল চাটছে। আমি খুব আনন্দিত হয়ে তাকে লক্ষ্য করলাম। ঘুমন্ত অবস্থায় কোন লোককে এরকম করতে আমি কখন দেখিনি।

'ওর দিকে এমন করে তাকাতে হবে না।' ভায়োলেট তার সেই নারীসুলভ [illegible] বলল, যা আমার খুব ভাল লাগত।

নর্তকী ছিল এবং বাবার চেয়েও বেশী রোজগার করত।' সে হঠাৎ থামল এবং স্বপ্ন ও বাস্তবের মাঝে হারিয়ে যাওয়া তার সেই বিস্ফারিত চোখ নিয়ে চেয়ে রইল। ভায়লেটও উৎফুল্ল হল কিন্তু পরক্ষণেই একটু বিষণ্ণ হয়ে গোপনে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে যা আমার দৃষ্টি এড়াল না। সে বল্লে, 'আমারও ছাত্রী হবার ভারী ইচ্ছা হয়।'

'সত্যিই একজন ছাত্রী।' শিং তার অবসাদ কাটিয়ে বল্লে, 'এই যে জমিদার—কি নাম তার···যে তোমাকে সেদিন গ্রামের ভেতর নাচতে দেখে তোমাকে প্রশংসা করল এবং বাবার কাছে বলল যে তোমাকে দত্তক নিয়ে মেয়ের মত পালন করবে, স্কুলে পাঠাবে, কেন না তার স্ত্রী মারা গিয়েছে আর তার অন্য কোন ছেলেমেয়েও নেই। কিন্তু তুমি এমন দুষ্টু যে বললে তুমি যেতে চাও না, বরং বাবার সঙ্গে কষ্টকর জীবনের ভাগী হয়ে থাকতে চাও।'

ভায়লেট পরাজিত হয়ে অপ্রস্তুতে পড়ল এবং কি উত্তর দেবে কিছুই ভেবে পেল না। সে কেবল আমতা আমতা করে বল্লে, 'সেই বদমাইশ বুড়োটা মুখে যা বলেছিল কাজে সেটা করতে চায় নি। তার মতলব ছিল "অন্য রকম····'

'রক্ষা কর, রক্ষা কর। আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে দাও।' আমাদের কথাবার্তা ভেঙ্গে দিয়ে বজ্রের মত একটা চীৎকার কানে এল। এটা সেই বুড়োর কাছ থেকে এল যে ঘাসের গাদায় নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। আমার মনে হল হয়ত কোনও সাপ তার ঘাড়ে কামড় দিয়েছে, কেন না এরকম নির্জন জায়গায় ত প্রায়ই সাপ বেরিয়ে থাকে। তাই একটা লাঠির খোঁজে ছুটতে যাব মনে করলাম, কিন্তু ভায়লেট থামিয়ে দিল।

'কিছু ভাবতে হবে না।' সে বল্লে, 'ও দুঃস্বপ্ন দেখছে। যেদিন জাপানীরা গ্রামে এসে আমার মাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় তার পর থেকে ও প্রায়ই এ রকম স্বপ্ন দেখে থাকে। আমরা আর তার সম্বন্ধে কিছু শুনি নি, মনে হয় সে মারা গেছে।'

আমি বুঝলাম। কাহিনীটা নিশ্চয়ই দুঃখের। তাই আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হল না যাতে তারা বেশী রকম আঘাত পেত এবং আমারও কষ্ট হত। যুদ্ধের সময় মানুষ আশ্চর্যরকম কোমলমনা হয়ে যায়। তাই আমি শুধু বল্লাম, 'এখন আমাদের শুতে যাওয়া উচিত। আমার মত বাড়তি লোকের খোরাক জোগাতে কাল নিশ্চয়ই তোমাদের একটু বেশী খাটতে হবে।' তারপর শুভরাত্রি না জানিয়ে তাদের তরুণ হৃদয়ে একটু আশা জাগিয়ে তোলবার জন্য বল্লাম, 'যখন আমাদের দেশ শত্রুর কবলমুক্ত হয়ে আবার স্বাধীনতা ফিরে পাবে তখন আমাদের সবার জন্যই অবৈতনিক স্কুল খোলা হবে এবং সকলেই গান শিখতে পড়তে পারবে।' এরপর আমি শয়ন করলাম। পরদিন ভোরে আমরা কাছাকাছি একটা গ্রামে পৌঁছলাম। আমি একটা দু-তারের যন্ত্র বাজালাম এবং বুড়ো তার ছোট ঢাকটা পিটল। আমার মনে হল আমি ভালই বাজালাম, যদিও অনেকদিন এর কোন কসরৎ হয় নি। এর একটি অব্যর্থ প্রতিক্রিয়া ভায়লেটের মধ্যে দেখা গেল, সে যখন গ্রামের মাঝে শিংয়ের গানের সঙ্গে তাল রেখে নাচল। আগে বলেছি যে সে (ভায়লেট) চেহারায় একটু মোটা, কিন্তু আমার বাজনার সুরের তালে তালে তার নাচ এত সহজ ও সুন্দর লাগল, মনে হল যে একজন জলপরী জলের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে। যখন সে নেচে নেচে গান গাইল তার সেই হাল্কা নারীসুলভ কণ্ঠস্বর তরুণ গ্রামবাসীদের হৃদয়েও নাড়া দিল। আর তার পপি গাছের মত লাল ঠোঁট দুটির অস্ফুট সাময়িক হাসি, কখনও কৃত্রিম কিন্তু স্বভাবতঃই ম্লান, নিঃসন্দেহে তাদের আকর্ষণ করল। তবে দর্শক বেশী হয় নি।

পাকা বাজিয়ের মত বাজনা বাজাতে বাজাতে এবং বেচারা ভায়লেটকে নির্জন মাঠের মাঝে একাকী নাচতে দেখে আমি একটু অস্বস্তি বোধ করলাম। সমস্ত ব্যাপারটা আমার মনকে দুঃখভারে পীড়িত করল।

আমাদের বুড়োটা শেষ কয়েক মিনিট ভীষণ জোরের সঙ্গে ঢাকটা পিটে হঠাৎ কাঠি দুটো ছুঁড়ে ফেলে দিল এবং

'বস বাছা!' তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে ভায়লেটের দিকে তাকাল এবং তাকে বলে:

'ভায়লেট! আমি তোমার জন্য একটা ব্যবস্থা করেছি। খারাপ কিছু নয়, কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি হল বলে দুঃখ হচ্ছে।

'কি বলছ তুমি, বাবা?' ভায়লেটের চোখে চঞ্চল দৃষ্টি।

'যে জমিদার আমাকে চাল দিল সে বলেছে—তুমি বুঝতে পারছ আমি কার কথা বলছি—তোমাকে তার খুব ভাল লাগে। কিন্তু সে বলে যে এখন তোমাকে দত্তক নেবে না, কেন না তোমাকে পাঠাবার মত কোন স্কুল এখন নেই। সে তোমাকে বিয়ে করবে এবং তোমার জীবন যাতে সুখের হয় তার সমস্ত চেষ্টা করবে।'

'তুমি কি তাকে কথা দিয়ে ফেলেছ?' ভায়লেট জিজ্ঞাসা করল—তার কণ্ঠস্বর তার চোখের মতই গম্ভীর।

'নিশ্চয়ই।'

'বাবা! আমি তোমার কাছেই থাকতে চাই।'

'দুর বোকা!' বাবা অপেক্ষাকৃত রুক্ষ স্বরে বললে। কিন্তু ক্রমশঃ শান্ত হয়ে আবার ধীরভাবে আরম্ভ করল, 'জানি সে তোমার চেয়ে বয়সে কিছু বড় কিন্তু বাছা আমার সঙ্গে এই ভাবে বেঁচে থাকার কথা একবার ভেবে দেখ। তুমি তোমার যৌবনকে হারিয়ে ফেলছ। আমিও তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। এজীবনে আর অবস্থার উন্নতি করতে পারব না। হাজার হোক সে বড় লোক। তার কাছে তোমার কোন কষ্টই হবে না। তোমার ছেলে মেয়েরা স্কুলে যাবে এবং লেখাপড়া শিখবে। আর দেখ আমি তোমার জন্য কিই বা করতে পেরেছি একটা ভবঘুরের মেয়ের মত পালন করা ছাড়া।' এবার তার বৃদ্ধ বয়সের স্বর ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে মিলিয়ে গেল। ভায়লেট তার মাথা নামিয়ে মমীর মত স্থির হয়ে বসে রইল। বাইরে একটা ছোট ঝড় বয়ে গেল, তার একটা শব্দও হল। বুড়ো বাপ তার মাথা তুলে ক্ষীণকণ্ঠে বলে, 'জমিদার তোমার জন্য লোক পাঠাচ্ছে। শত্রুও কাছাকাছি এসে গেল বাছা। নষ্ট করবার সময় নেই। জমিদার শীঘ্রই একটা শান্তিপূর্ণ এলাকায় সরে যাচ্ছে। বোকামি ক'রো না। যাবার জন্য তৈরী হয়ে নাও।'

দরজার কাছে একটা ডুলি এল—বেশ কাজ-করা ঝালর দেওয়া লাল ডুলি। কিন্তু সেটা বিয়ের ডুলি নয়। দ্বিতীয় পত্নীর জন্য লোকেরা ডুলি পাঠায় না। একটা দুষ্টু গোছের যুবক দুজন বাহক নিয়ে ভেতরে ঢুকল। এই লোকটা জমিদারের নায়েব। ডুলি বাহকেরা শক্তিমান পুরুষ, তাদের কোমর পর্যন্ত দেহ অনাবৃত এবং হাতের পেশীগুলো ঠেলে বেরিয়ে পড়ছে। মনে হল তারা যেন কাউকে চুরি করে নিয়ে যেতে এসেছে।

বুড়ো নড়ল ও না কিম্বা বদমাইশ নায়েবকে অভিবাদনও জানাল না। সে মূঢ়ের মত নীরব হয়ে বসে রইল। তারপর হঠাৎ চমকে উঠে বলে, 'ভায়লেট, যদি সত্যিই তুমি আমার স্নেহের সন্তান হও, তবে শোন। এই ডুলিতে গিয়ে ওঠ। আমি তোমার বাপ, তোমাকে এই জগতে আসতে দেখেছি এবং বড় হতেও দেখেছি। আমার জীবনের একমাত্র কর্তব্য তোমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা। আশীর্বাদ করি তুমি জমিদারের জন্য একটা ভাল ছেলে ধারণ কর।'

ভায়লেট কোনও কথা কইল না। সম্মোহিতের মত উঠে গিয়ে ডুলিতে বসল। বদমাইশ নায়েব ডুলির দরজাটা বন্ধ করে দিল এবং শক্তিমান বাহক দুজন সেটাকে একটা সাধারণ বোঝার মত কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে চলে গেল।

অন্ধকার হয়ে এল। পশ্চিম দিগন্তে একটা অসম্পূর্ণ রামধনু দেখা গেল। নিশ্চয়ই কোথাও ঝড় হয়ে গেছে। কেন না বাতাসটা ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে। মেপ্‌ল গাছের পাতাগুলো আধা গান ও আধা নালিশের সুরে কাঁদতে লাগল। হঠাৎ একটি ভীষণ কান্নার রব উঠল। এ যেন এতো রাত্তায় মা-হারা শিশুর কান্না, বাতাস বিদীর্ণ ক'রে দেয়। এর আর

তার চোখের পাতা ভয়ে কাঁপছে, যেন সে গোপনে কাঁদছে। সুতরাং আমি কথা বলতে সাহস করলাম না। স্ফিংক্স পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে রয়েছে, তাই আমি বিদায় না জানিয়ে চলে যেতে মনস্থ করলাম। কিন্তু যখন আমি ফিরতে যাচ্ছি তখন হঠাৎ মেয়েটা চোখ মেলল—একজোড়া বিষণ্ণ চোখ, অশ্রুভরা এবং যা দিনের আলোককে প্রতিফলিত করছে।

'তা হলে তুমি চললে?' সে জিজ্ঞাসা করল। 'শোন! অবশেষে কাল রাত্রিতে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি।'

'ভাল স্বপ্ন ত?' আমি তার মনে জিজ্ঞাসা করলাম।

'হ্যাঁ, ভাল।' তার বিষণ্ণ মুখে জোর করে হাসি টেনে সে বলে 'আমি স্বপ্ন দেখলাম যে ভায়লেটের সঙ্গে একটা সুন্দর যুবক ছাত্রের বিয়ে হয়েছে এবং সে এখন গান লিখতে পড়তে পারে.....।'

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, আশা করি তাই সত্য হোক, কিন্তু একটা অনাদি শক্তি আমার জিবটা টেনে ধরল। আমি মূঢ়ের মত মেয়েটার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম কথা না বলে।

'তা হলে বিদায়!' অবশেষে সে আমাকে বলে। কিন্তু তার চাহনি ভীষণ থেকে ভীষণতর হয়ে এমন কিছু বলতে চাইল যা আমি বুঝতে পারলাম না। আমি তাকে তার বাবার কাছে ফেলে রেখে ফিরলাম।

অনেকক্ষণ ধরে তার দৃষ্টির অর্থ অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। এখন কেবল মনে হচ্ছে আমি তা বুঝতে পেরেছি।

অখণ্ডের মোহ

রেণু মিত্র

ভারতবর্ষ একের উপাসক, অখণ্ডের উপাসক। অদ্বৈতবাদ আমাদের রক্তের মধ্যে, আমাদের সর্বত্র—আমাদের ব্রহ্ম বা ভগবানের ধারনায় আমরা অদ্বৈতবাদী বা অখণ্ডের উপাসক, আমাদের পরিবারে আমরা একান্নবর্তী। আমাদের এই মনোবৃত্তিই আমাদিগকে রাষ্ট্রক্ষেত্রেও অখণ্ড যুক্তরাষ্ট্রের প্রেরণা দেয়। ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল হইতেই অখণ্ড সাম্রাজ্য ছিল। সুবিস্তীর্ণ ভূমিতের বিভিন্ন অংশ নিজেদের সকল শক্তি অর্পণ করিয়া রাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। সকল ক্ষেত্রেই সকল অংশভাগকে একের মধ্যে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া ঐ একেরই গৌরব বাড়নোতে আমরা চিরদিন অভ্যস্ত। তাই আমাদের ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশে বহু জাতি, বহু ভাষা ও বৈচিত্র্যের বিভিন্নতা থাকিলেও আমাদের মধ্যেকার একটি ঐক্যের সুর, অখণ্ডের সুর আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই বাজে, সেইখানে আমরা মিলি। আর সেই ঐক্যের মধ্যেই, সেই অখণ্ডের টানে পড়িয়াই ভারতবর্ষের দুয়ারে আগত বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন কৃষ্টি হজম হইয়া যায়। তাই তো কবি বলিতে পারেন :

হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন।
শক হুন দল, পাঠান-মোগল এক দেহে হ'ল লীন।

এই একান্নবর্তী, অখণ্ড থাকিবার আগ্রহের ফলেই মুসলমানকে আমরা রাষ্ট্রক্ষেত্রে এক করিয়া দেখিতে চাহিয়াছি, উহাদের উৎপীড়ন নিপীড়ন সত্ত্বেও পৃথক হইবার কথা ভাবিতে পারি নাই। তাই আমরা প্রাণপণে পাকিস্থানী দাবিকে ঠেকাইয়া আসিয়াছি। আজও মহাত্মা গান্ধী কোনরকম বিভাগের বিশেষ ভাবেই বিপক্ষে।

তথাপি গণচেতনার বক্ষ ভেদ করিয়া আজ বঙ্গবিভাগ ও পাঞ্জাববিভাগের এ নিবিড় ক্রন্দন কেন উঠিয়াছে? কেন এত অল্প সময়ের মধ্যে এ প্রস্তাব এত শক্তিশালী হইয়া পড়িতে পারিয়াছে? ইহার লৌকিক কারণ স্পষ্ট। একত্র থাকিতে, অখণ্ড থাকিতে প্রাণ চায়। কিন্তু একত্র থাকিতে যাইয়া যেখানে প্রাণেই মরিতে হয়, অস্তিত্ব রক্ষা, সৃষ্টি রক্ষা অসম্ভব হইয়া পড়ে, সেখানে নিজের প্রাণ, নিজের সংস্কৃতি, সব কিছু বিসর্জন দিয়া শুধু অখণ্ডই থাকিতে হইবে, একত্রই থাকিতে হইবে এই একত্বের মোহ কেন? আমি চাই সকলের সঙ্গে যুক্ত থাকিতে, অথচ আমার ভাই তাহা চায় না, সে গায়ের জোরে বলিবে সে আমার সঙ্গেও থাকিবে না, অপর সকলের সঙ্গেও যুক্ত হইবে না। স্পষ্ট বুঝিতেছি, ইহাতে তাহার ও আমার উভয়েরই বিশেষ ক্ষতি। তখনও ভাইকে পরিত্যাগ করিতে নাই, ঐক্যই সত্য, বিভক্ততাই মৃত্যু—এই অজুহাতে কি আমি সকলকে পরিত্যাগ করিয়া বৃহত্তর মঙ্গলকে বিসর্জন দিব? আমরা পরিষ্কার বুঝিতেছি ভারতীয় অখণ্ড যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত থাকা আমাদের পক্ষে সকল দিক দিয়াই মঙ্গল। আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের সংস্কৃতি রক্ষা ও তাহাদের প্রগতিশালী করিয়া তোলার পক্ষে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিয়ন আজ আমাদের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু মুসলীম লীগ ও নির্বিকার মৌন থাকিয়া সমগ্র মুসলমান সমাজই যদি তাহাতে বাধা দেয়, সে যদি কোনমতেই সেই যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে না চায়, তবে তাহাকে পরিত্যাগ করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। তখনও যদি ঐক্যের দোহাই অখণ্ডতার দোহাই আমাদিগকে সম্মুখে চলিতে বাধা দেয়,

ক্ষেত্রে বেনিয়ামন টিক [illegible] কিন্তু আমরা সে ভুল করিব না। আমরা [illegible] স্বীকার করিয়া সকলের সঙ্গে [illegible] ভারতীয় [illegible] ইউনিয়নের অন্তর্গত স্বতন্ত্ররাষ্ট্রসমূহের অখণ্ড [illegible] গড়িয়া তুলিব। [illegible] আমরা নিজেদের [illegible] কর্তব্য [illegible] আমাদিগকে [illegible] [illegible] কেন [illegible] অখণ্ড [illegible] সচেতন হইয়া [illegible] নিজেদের [illegible] ভুলিব।

[illegible] এই [illegible] হইতে [illegible] বৈজ্ঞানিকভাবে [illegible] [illegible] প্রতি [illegible] [illegible] বৈজ্ঞানিক বা [illegible] স্বীকৃত হয় নাই। [illegible] [illegible] প্রদেশের [illegible] [illegible] প্রতি [illegible] [illegible] প্রভৃতি [illegible] হইয়াছে। অথচ ভারতবর্ষের তুলনায় এগুলি ক্ষুদ্রতম অংশ [illegible] বাস করিয়া আমি বলিতে পারি যে, আমি ভারতবাসী, গঙ্গার এক ক্ষুদ্রতম অংশে [illegible] আমরা [illegible] গঙ্গাস্নান [illegible] ভারতবর্ষের [illegible] অংশ বা [illegible] একটি পূর্ণ ভারতবর্ষ রহিয়াছে, গঙ্গার প্রতি [illegible] একটি পূর্ণ গঙ্গাই রহিয়া গিয়াছে, এইজন্যই আমার [illegible] বলা কিংবা গঙ্গাস্নান করিলাম বলা সম্ভব ও সত্য হইয়াছে।

আত্মরক্ষার [illegible] স্বধর্ম। [illegible] মুসলীম লীগ [illegible] সম্বন্ধে [illegible] হইয়া তাহার স্বতন্ত্র [illegible] দাবী [illegible] অবাস্তব নয়, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমরা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রক্ষার [illegible] [illegible] জন্য [illegible] [illegible] আমরা [illegible] আমরা [illegible] সম্বন্ধে সচেতন হইতে আরম্ভ [illegible]।

অখণ্ডের মোহ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাই [illegible] [illegible] [illegible] তাহাদের [illegible] [illegible] পাঠান [illegible] আমরা ডুবিব, আর [illegible] [illegible] আগামী [illegible] আমরাই [illegible] এই অখণ্ডতার

গ্রামের নিজস্ব পোষ্ট আফিস আছে। একটা পাকা দালান ও বড়ো কম্পাউণ্ডে অবস্থিত দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। গত যুদ্ধের সময় এখানে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃপক্ষ 'এমারজেন্সি বেড্'ও খুলেছিলেন। গ্রামের নিজস্ব বাজার তো আছেই, তাছাড়া গ্রামের সীমান্তে প্রায় গ্রামসংলগ্ন ঘোড়দৌড়ের বড়ো বাজার রয়েছে, এবং তা থেকে আর আধ মাইলটাক এগিয়ে গেলে পাওয়া যায় ব্যবসাবাণিজ্যের বিরাট কেন্দ্র বিখ্যাত দীঘলির গঞ্জ। ঘোড়দৌড় এবং দীঘলির সুবিধে কনকসারের লোকেরা স্বভাবতঃই পেয়ে থাকে। তারপাশা ষ্টেশনও দীঘলির কাছাকাছিই। সুতরাং কনকসারের অধিবাসীদের বিদেশ যাতায়াতের পক্ষে বেশ সুবিধেই রয়েছে বলতে হবে। যেমন সারা বিক্রমপুরের তেমনি এই গ্রামের সাধারণ স্বাস্থ্য ভালোই, পদ্মার প্রাণপ্রদ হাওয়ার এলাকার মধ্যেই সারাটা পরগণা কিনা। এ গ্রাম থেকে একাধিক জজ, অধ্যাপক, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, সংবাদপত্র সম্পাদক, বড় উকিল, ডাক্তার ও বড় ব্যবসায়ী হয়েছেন। জীবিতদের মধ্যেও ওরূপ অনেক আছেন, তবে তাঁরা সাধারণতঃ বিদেশে থাকেন।

একটা গ্রামের পক্ষে বর্দ্ধিষ্ণু ও সুখী হতে হলে যা যা সাধারণতঃ থাকা দরকার, ওপরকার বর্ণনা থেকে মনে হবে, কনকসার গ্রামের তার অনেকগুলিই আছে। কিন্তু এই মোটের ওপর সুন্দর খোলসটার অন্তরালে আসলে বর্তমানে কি ঘটছে, তাও খুঁজে দেখা দরকার, বুঝে দেখা দরকার। বর্তমান লীগ গবর্ণমেণ্টের সৃষ্ট বহুবিধ দুর্নীতি, দুর্ভোগ ও বিপর্যয়ের দায়ে বাংলার গ্রামাঞ্চলকেই ভুগতে হয়েছে অনেক বেশি। তারপর এল পঞ্চাশের মন্বন্তর, একটা সর্বধ্বংসী ঝড়ো হাওয়া বিশেষ করে বাংলার গ্রামাঞ্চলকে ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেল, পোকা-মাকড়ের মত মানুষ মরল লাখে লাখে। যারা বেঁচে রইল, গবর্ণমেণ্টের 'ক্রনিক' অব্যবস্থা, পারহীন দুর্নীতি ও অকর্মণ্যতা এবং তারই সুযোগে দেশী চোরাবাজারী বড়োলোকদের সীমাহীন মুনাফা-মৃগয়ার ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তারাও দ্রুত মৃত্যুপথের দিকেই এগোতে লাগল। কনকসার গ্রামের ক্ষেত্রেও স্বভাবতঃই অনুরূপ ঘটেছে। দুর্ভিক্ষের ক'মাস কনকসারের খাল দিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রোজ অগুণতি মানুষের মৃতদেহ ভেসে গেছে, জল তীব্র-পূতিগন্ধ হয়ে গেছল। সেই মন্বন্তরের ধাক্কায় কনকসার ও তার আশেপাশের গ্রামগুলোর হিন্দুমুসলমান কিষাণ, জোলা তাঁতী কামার কুমোর জেলে কুলার প্রভৃতি বিভিন্ন সাধারণ বৃত্তিজীবি সম্প্রদায় ও নিম্ন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা কতো যে মরল, সহায়-সম্বলহীন হবে মেয়েদের ও শিশুদের বিশেষ করে যে কী অবর্ণনীয় রকমের দুর্দশা হ'ল, তার কাহিনী প্রতিবেশীদের কাছ থেকে শুনে শিউরে উঠতে হয়। কিন্তু সেবারে যারা বেঁচে গেল, তাদেরই বা বর্তমান অবস্থা কি? দুর্ভিক্ষের জের এবং যুদ্ধোত্তর ও বাংলার লীগ সরকারেরই বহুবিধ দুর্গতির জন্য গত ক'বছর ধরে সাধারণ লোকের আয়ের পথ ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হচ্ছে, অথচ জিনিষপত্রের দাম ক্রমেই চড়ছে। সারাটা দেশের সঙ্গে কনকসারের জনসাধারণও তাই কষ্ট পাচ্ছে খুবই। যেমন বিক্রমপুরের অন্যান্য গ্রামে, তেমনি এ গ্রামে উচ্চশিক্ষিত ও অবস্থাপন্নদের অনেকেই থাকেন বিদেশে চাকুরীব্যপদেশে। পূজোয় বা গরমের ছুটীতে এক আধবার মাত্র তাঁরা বাড়ী আসেন,—তাও সবাই সব বছর নয়। সাধারণ সময়েও তাঁরা গাঁয়ের লোকের সুখ দুঃখের খোঁজখবর খুব কমই নিয়ে থাকেন। বর্তমানের অস্বাভাবিক অবস্থায় তো আরো নেন না, যদিও গরীব গ্রামবাসিদের পরামর্শ দিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে অর্থ দিয়ে সাহায্য করার প্রয়োজন আজই সব চেয়ে জরুরী ছিল।

গড়পড়তা বেশির ভাগ লোকেরই আয় অত্যন্ত কমে যাওয়াতে (অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির তুলনায়) কনকসারের সবকটা স্কুলেই ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমছে। শুধু মাষ্টারীর আয়ে সংসার চলে না দেখে মাষ্টারমশায়দের প্রায় প্রত্যেকেই আরো হরেকরকমের কাজ করেন নানাবিধ খুচরো আয়ের ব্যবস্থা করার জন্য। তাঁদের দোষ দেওয়া চলে না, কিন্তু ঐ কারণেই আবার স্কুলে পড়ানো ব্যাপারটা অনেক ক্ষেত্রেই

[illegible] ছাত্রীদের [illegible] আঁকি [illegible] অবস্থা [illegible], এর [illegible] অবস্থা [illegible] আসছেন [illegible] এখন সেই সম্বন্ধে [illegible] প্রশ্ন [illegible] একটি [illegible]

[illegible] পরিচালক [illegible] প্রশ্ন [illegible] সাহায্য পাওয়া যায়, [illegible] পরিচালনার [illegible] শান্তির প্রশ্ন [illegible] অবস্থা [illegible] এদের [illegible] একটা [illegible] লোকে বলে [illegible] এরকম কিছু ব্যাপার [illegible]

[illegible] আসছে, বছরের [illegible] অনেক [illegible] পরিচয় [illegible]

[illegible] কমিটি [illegible] অভাবের বাংলার অর্থাৎ [illegible] যথাকালে, তাও [illegible] লোকদের মধ্যে এগুলোর [illegible] সুবিধে [illegible] সমস্ত সমস্যাদের মধ্যে [illegible] আছেন। [illegible] এসব কমিটির সভাদের [illegible] ও বিরোধের অন্ত নাই [illegible] আছে তা [illegible] ঠিক। এবং

[illegible] বিধবা [illegible] ছেলে মেয়ে। [illegible] নিজেদের [illegible] হলে, — [illegible]

[illegible] বিদেশ [illegible] বছর [illegible] মেলামেশা এবং বছরে একবার [illegible] এর সভ্যদের দ্বারা [illegible] গ্রামবাসীদের মনকে [illegible] করে রাখা — এসব [illegible] রকমের [illegible] — আরো [illegible] ভিত্তিতে — [illegible] দরকার [illegible] অনেক কিছু উন্নতি গবর্নমেন্টের সাহায্য [illegible] হওয়ার নয় এ কথা ঠিক। [illegible] নিজেদের হাতে যতটা করবার আছে তা তো আগে করতে হবে — এর সঙ্গে সঙ্গে দিকে হবে গবর্নমেন্টের উপর চাপ [illegible] বিবেচনা [illegible] দেখবেন এই [illegible] একটি আদর্শ [illegible] করে তুলবার জন্য সত্যকার চেষ্টা করবেন, এই আশা প্রকাশ করে, এই ছোট চিঠিটি এখানেই শেষ করলাম।

বীণা গঙ্গোপাধ্যায়।

২

'বর্তমান'-সম্পাদক সমীপেষু,

মহাশয়,

প্রতিভা মিত্র মহোদয়া আপনাদের বৈশাখ সংখ্যার 'বর্তমানে' মেয়েদের চাকুরী করা ভাল কি না এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন। এখন কয়েকজন মেয়ে চাকুরী করে বটে কিন্তু এ প্রশ্ন সমস্যার মত জটিলতা পাকাইবার অবস্থায় আসিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। চাকুরী করা মেয়েদের পক্ষে ভালো স্বীকার করিতে পত্র-লেখিকারও আপত্তি নাই, কিন্তু মেয়েদের নিজের ব্যক্তিত্ব গঠনে চাকুরী করা বাধাস্বরূপ হইয়াছে বলিয়াই তাঁহার আপত্তি। কিন্তু মেয়েদের চাকুরী করার মত অনুকূল অবস্থা যে নাই, এবং তার জন্য মেয়েরা যে মোটেই দায়ী নহেন, এ প্রসঙ্গটি তিনি একেবারে এড়াইয়া গিয়াছেন।

আমি নিজে চাকুরী করি। গৃহ-সংসার আমার অন্য কোন মেয়ে অপেক্ষা ত' কম নহেই, বরঞ্চ বেশী। আমাদের সংসারে সুখ ও সংহতি বৃদ্ধির কোন বাধাই তাতে হয় নাই। বরঞ্চ বাঁচিয়া থাকিবার সামান্য প্রয়োজন সংগ্রহে স্বামী ও দেবর ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, আমি এখন তাঁহাদের কিছুটা উপশম করিতে পারিয়াছি। দন্তের কথা আমি ভাবিতেই সময় পাই না। সংসারে খুঁটিনাটি কাজ আজও আমি করি। আগেও সকলের কাছে যেমন পাইতাম, এখনও তেমনি সাহায্য পাই, বরঞ্চ আগে দয়ার পাত্রী হিসাবে সাহায্য পাইতাম, এখন পাই সহযোগিতার সূত্রে। নিয়মধ্যবিত্ত হিন্দুর সংসারে দুবেলা খাওয়া জুটাইতে যখন বর্তমানে পুরুষরা অক্ষম হইয়া পড়িতেছেন, তখন মেয়েদের চাকুরী করার মধ্যে সাংসারিক শান্তি সুখ নষ্ট হইতে পারে, একথা কেমন করিয়া মিত্র মহোদয়ার মনে আসিল তাহাই ভাবিতেছি। আমাদের মত সংসারে আদর্শ সুখ শান্তি ও নারী-জীবন আগে হইতেই প্রতিষ্ঠিত আছে এই কথা তিনি ধরিয়া লইয়াছেন এবং যে কয়জন মেয়েরা চাকুরী করিতে সুরু করিয়াছে তাহারাই ইহা ভাঙিতে চলিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছে। যাঁহারা অভাবের তাড়নায় চাকুরী করেন না, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা চাকুরী না করিয়াও দাম্ভিকা, ও নারীত্বের মর্যাদা অক্ষয় রাখিতে তাঁহারা সব সময় যে যত্নশীলা তাহাও মনে হয় না। অভাব দূর করিতে যাঁহারা চাকুরী করিতে যান তাঁহারাও যে স্বচ্ছন্দ কাজকর্মে বাধা পান, তাহার প্রতীকারের পন্থা নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করিলেই আমি সুখী হইতাম।

একে তো বাহিরের জীবন বাঙালী মেয়েদের অনভ্যস্ত। সে ত্রুটি কিছু দিনে কাটিবে। কিন্তু পুরুষ সমাজের বিরাট অংশের মধ্যেই নিপীড়নের ফলস্বরূপ যে ক্লিন্ন দীন মনোভাব গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে মেয়েরা ট্রামে, বাসে বা পথে বাহির হইতেই সঙ্কোচ বোধ করেন এবং অনেক ব্যাপার সহ্য করেন যা কোন সভ্য-সমাজ বরদাস্ত করে না। এই অবস্থায় মেয়েদের চাকুরী করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে নারী পুরুষ সকলের সহযোগিতাই প্রয়োজন। নচেৎ যে আর্থিক দুর্গতি বাঙালী সমাজের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে তাহা হইতে উদ্ধারের আশা নাই।

কলিকাতা
১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪

ইতি—
কনক বসু

শিক্ষক হওয়া কি অপরাধ?

(১)

'বর্তমান-সম্পাদক সমীপেষু,

মহাশয়,

শিক্ষকদের দুরবস্থার কথা শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আপনাদের 'পত্রলেখা'য় বেশ ভালভাবেই বলেছেন। সত্যি, প্রাথমিক শিক্ষক অনেক-ক্ষেত্রে বেয়ারা পিয়নের চেয়ে কম বেতন পান। তাঁদের অনেক দুর্ভোগ যে আছে, তা সাম্প্রতিক ধর্মঘটের প্রচেষ্টায় বোঝা গেছে। তবে শিক্ষকদের দাবিটা শুধু তুলনা ক'রে মাইনে বাড়ানোর মধ্যেই নিবদ্ধ রাখলে চলবে না। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, কি সাবডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এসব প্রসঙ্গ না

সাহিত্য-সেবা ও অর্থার্জন

'বর্তমান' সম্পাদক সমীপেষু,

মহাশয়, আজকে মানুষের ভাবধারা ও চিন্তাধারার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিরাচরিত অত্যাচারের হাত থেকে কেমন করে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, বলতে পারেন? আমি একজন সাহিত্য-সেবী। সাহিত্যের আরাধনা করতে গিয়ে কিন্তু বাস্তবতার সঙ্গে সংগ্রাম ক'রতে প্রস্তুত হতে হচ্ছে। যে কাজেই আজ নামি মনে হয় সব কাজই ব্যর্থ, যেখানে অর্থ নেই। কেন এই নীচতা হীনতা বলতে পারি না। সত্য-সত্যই আমার সাহিত্য সাধনা হয়ত সফল হবে না। অর্থের দিকে দেখতে গেলে পতন অবশ্যম্ভাবী। আবার অপর দিকে অর্থ না হলেও কোন উপায় নেই।

এই পরিস্থিতি থেকে কেমন করে উদ্ধার পেয়ে স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করতে পারি বলতে পারেন? নমস্কার,

ইতি—

ললিত মিত্র লেন, শঙ্করকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্যামবাজার
৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪

বিভূতিভূষণের "দেবযান"—সম্পর্কে প্রশ্ন

'বর্তমান'-সম্পাদক সমীপেষু—

মহাশয়, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "দেবযান" গ্রন্থটির একটি জায়গায় আমার খটকা লেগেছে:

"পুষ্প আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে গেল। আত্মা তাকে সৃষ্টির প্রান্তসীমার দিকে দাঁড় করিয়ে হাত দিয়ে ওকে স্পর্শ ক'রে বল্লেন—দেখচ?"

"পুষ্পের সারাদেহ শিউরে উঠলো। সামনে এ এক অদ্ভুত পৃথিবী, বিশাল জলভূমিতে বড় বড় অতিকায় জীবজন্তু কর্দমে ওলোট পালট খাচ্চে—গাছপালার একটিও পরিচিত নয়। বাতাসে অস্বাচ্ছন্দ্যকর গরম জলীয় বাষ্প সূর্যের তেজ অতিশয় প্রখর ··তারপর ছবির পর ছবি····কত দেশ কত যুদ্ধ, কত সৈন্যদল····কত প্রাচীন দেশের বেশভূষা পরা লোকজন····প্রশস্ত রাজপথ, প্রাচীন দিনের শহর····পচা ডোবা খানা শহরের রাজপথের পাশেই,····ঘোর মহামারীতে দলে দলে লোক মরচে, কি বীভৎস দৃশ্য!

আত্মা বল্লেন—বহুদূর অতীতে ফিরে চাইছিলাম। কত কল্প আগেকার আমারই বহু পূর্ব্বজন্ম। কত লোককে হারিয়েচি, কত মধুর হৃদয়, আর কখনো খুঁজে পাইনি। বিশ্বের দূর প্রান্তের মোহানায় বসে তাদের মনে পড়েছিল। যা দেখলে, সব আমার জীবনের বিভিন্ন অঙ্কের রঙ্গভূমি। লক্ষ্মী মেয়েটি, এখন তোমার সঙ্গী ছেলেটিকে নিয়ে নেমে যাও।"—(পৃঃ ২৬)

মৃত্যুর পর আত্মা যখন পৃথিবী ছেড়ে পরলোকে গমন করে তখন কি সে বুঝতে পারে মৃত্যুর পূর্বে সে কি অবস্থায় কোন্ স্থানে এবং কোন্ আবেষ্টনীর মধ্যে বেঁচে ছিল?—মানুষের পুনর্জন্ম স্বীকার করি; কিন্তু পুনর্জন্মের পর তো আমরা বুঝতে পারিনা—জন্মের পূর্বে আমরা কোথায় কি অবস্থায় ছিলাম—ছিলাম কোন্ আবেষ্টনীতে? তবে, মৃত্যুর পরে কি ক'রে উল্লিখিত আত্মা তার জীবিত কালের ছবি দেখতে পেল?—'দেবযান' গ্রন্থটির আগাগোড়াই 'থিওরী'র উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু মৃত্যুর পর জীবিতকালের কথা স্মরণ ক'রতে পারে—এটাও কি কোন সিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত?—জানাবেন তো। নমস্কার, ইতি—

পঞ্চাননতলা রোড,বালিগঞ্জ, শ্রীমতী কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
৭ই আষাঢ় ১৩৫৪

৩৩/এ মদন মিত্র লেন, কলিকাতা, অন্নপূর্ণা প্রেস থেকে শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।